এ কে খন্দকার

১৯৭১ ভেতরে বাইরে

এ বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অজানা, কম জানা কিংবা স্বল্প প্রচারিত বেশ কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন সশস্ত্র যুদ্ধের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। ওই পর্যায়ের আর কোনো সামরিক কর্মকর্তা এ বিষয়ে কোনো বই রচনা করেননি। সেদিক থেকেও বইটির একটি আলাদা গুরুত্ব আছে।

ISBN 978 984 90747 4 8
9789849074748
Taka 450.00
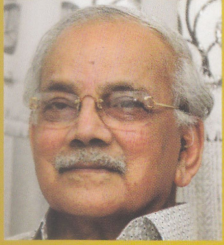
আলোকচিত্র : খালেদ সরকার

এ কে খন্দকার

জন্ম ১৯৩০ সালে, বাবার কর্মস্থল রংপুরে। আদি নিবাস পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার পুরান ভারেঙ্গা গ্রামে। ম্যাট্রিকুলেশন ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৪৯-এ ইন্টারমিডিয়েট। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিমানবাহিনীর প্রধান ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হলে এর প্রতিবাদে তিনি বিমানবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া এবং ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ভারতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৯৮ ও ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ এবং ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রাখার জন্য এ কে খন্দকার ১৯৭৩ সালে বীর উত্তম খেতাব এবং ২০১১ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

গ্রুপ ক্যাপ্টেন (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল) এ কে খন্দকার বীর উত্তম মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এবং প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানীর সার্বক্ষণিক সহকারী ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া চাকরিরত বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন জ্যেষ্ঠ। যুদ্ধের প্রায় সব নীতিনির্ধারণী কর্মকাণ্ডে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। খুব কাছে থেকে যুদ্ধের সফলতা ও ব্যর্থতাগুলো অবলোকন করেন তিনি। যুদ্ধ পরিচালনায় মাঠপর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত কী কী সীমাবদ্ধতা ছিল, তা-ও তিনি জানতেন। তিনি যে অবস্থানে থেকে যুদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তা অন্য অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। সে অভিজ্ঞতার আলোকেই লিখেছেন *১৯৭১ : ভেতরে বাইরে*।
বইটি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাক্রমের বর্ণনা নয়, এতে পাওয়া যাবে যুদ্ধের নীতিনির্ধারণী বিষয় এবং তার সফলতা, ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা-সম্পর্কিত বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য। প্রচলিত মত ও আবেগের উর্ধ্বে থেকে বাস্তবতা আর নথিপত্রের ভিত্তিতে বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন লেখক। এমন কিছু বিষয়েরও উল্লেখ আছে বইটিতে, যা নিয়ে এর আগে বিশেষ কেউ আলোচনা করেননি। লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের সমর্থন বইটির নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়েছে।

এ কে খন্দকার

উ ৎ স র্গ

মনি

তামলু

মিতুল

খোকনকে

সূচিপত্র

ভূমিকা

১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে স্পষ্ট হতে থাকে যে আমরা স্বাধীন হতে যাচ্ছি। আমরা পাকিস্তানি শাসনের নাগপাশে থাকতে আর রাজি নই। আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছি, স্বাধীনতার কমে আমরা আর সন্তুষ্ট নই। পাকিস্তানিরা অত্যাচার ও পীড়নের মাধ্যমে যতই আমাদের দমনের চেষ্টা করতে থাকে, আমরা ততই আন্দোলনমুখী হতে থাকি। আমি উপলব্ধি করি, সহসাই ইতিহাস সৃষ্টি হতে যাচ্ছে আর আমিও এই ইতিহাসের অংশ হতে যাচ্ছি।

আমি রাজনীতিবিদ ছিলাম না, বরং কুড়ি বছর পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে নিষ্ঠার সঙ্গে চাকরি করেছি। তার পরও দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে আমি সিদ্ধান্ত নিতে একটুও ভুল করিনি। যথাসময়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিই এবং যুদ্ধ শেষে বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরে আসি। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া কর্মরত সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বজ্যেষ্ঠ। তাই মুক্তিযুদ্ধে আমাকে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়েছে, পাশাপাশি অনেক নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তও আমাকে নিতে হয়েছে। আমি মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেছি। এসব কারণে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাসই আমার জানা আছে, যা অনেকেই জানেন না বা তাঁদের জানার সুযোগ ছিল না।

মুক্তযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর থেকেই আমি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নোট রাখতে শুরু করি, যাতে পরবর্তী সময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিকথা লিখতে পারি। লেখার উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এই নোটগুলো আমি সযত্নে আগলে রাখি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের পর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আমাকে দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকতে হয়। দেশ ত্যাগের আগে সকল মূল্যবান কাগজপত্রের সঙ্গে আমার মুক্তিযুদ্ধকালে লেখা আমার নোটগুলো এক

আত্মীয়ের বাসায় রেখে যাই। প্রায় ১২ বছর পর দেশে ফিরে আমি সেই নোটগুলো আর ফেরত পাইনি। সঠিক সংরক্ষণের অভাব ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমার মূল্যবান কাগজপত্রের সঙ্গে সঙ্গে নোটগুলোও নষ্ট হয়ে যায়।

মাঝেমধ্যে স্মৃতির ওপর নির্ভর করে আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়ের স্মৃতিকথা লেখার চিন্তা করলেও তা আর হয়ে ওঠেনি। সম্প্রতি আমি বুঝতে পারছিলাম যে, স্মৃতিকথা লেখার জন্য আমার হাতে আর খুব বেশি সময় নেই। এ ছাড়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই আমি অনেক কিছু বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছি। এ উপলব্ধি থেকে গত বছর আমি আমার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা লেখার উদ্যোগ নিই। আমার বয়স, একাগ্রতা, ধৈর্য ইত্যাদি সবই মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিকথা লেখার অনুকূলে নয়, তাই আমি মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমার স্মৃতি থেকে লিখে ফেলতে সক্ষম হই। এ জন্য আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই তরুণ গবেষক গাজী মিজানুর রহমানকে। তাঁর সাহায্য না পেলে এ বয়সে এসে এই বই শেষ করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ত।

আমি স্মৃতিকথার জন্য যে বিষয়গুলো বেছে নিয়েছি, তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ অথচ তথ্যের অভাবে কম প্রচারিত বা আলোচিত, অথবা ভুলভাবে প্রচারিত। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে এ ধরনের বেশ কিছু বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, যা প্রকৃত ঘটনার সঠিক চিত্র নয়। এ ধরনের বিশ্বাস সাধারণত জন্ম নেয় তথ্যের অপর্যাপ্ততা বা অভাব থেকে, আবার অনেক সময় কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টি ইচ্ছা করেই তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ ধরনের ভুল তথ্য প্রচার করে থাকেন।

আমি মূলত আমার স্মৃতিকথা ১৯৭১ সালের মধ্যে সীমিত রেখেছি। শুধু বীরত্বসূচক খেতাবের বিষয়টি ১৯৭১-এ শুরু হলেও শেষ হয়েছিল ১৯৭৩ সালে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রায় ৪২ বছর পর আমি বইটি লিখছি। তাই বইটিতে তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। আমার তথ্যগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আমাকে বেশ কিছু বই পড়তে হয়েছে, এর মধ্যে নিচের বইগুলো উল্লেখযোগ্য: ১. বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত *স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র*, ২. বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস*, ৩. জে এফ আর জেকবের *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা: বার্থ অব এ নেশন*, ৪. মঈদুল হাসানের *মূলধারা ৭১*, ৫. মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা ও আমার কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর: কথোপকথন* ও ৬. আহমেদ রেজার

লেখা *একাত্তরের স্মৃতিচারণ*, ৭. এ কাইউম খানের *বিটার সুইট ভিক্টরি*, ৮. পিভিএস জাগান মোহন ও সমির চোপরার *ইগল ওভার বাংলাদেশ*, ৯. এস এস উবানের *ফ্যান্টমস অব চিটাগাং*, কমান্ডো মো. খলিলুর রহমানের *মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমান্ডো অভিযান* ইত্যাদি। আমার বক্তব্যের পক্ষে আমি বিভিন্ন বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও আমার বইয়ে উল্লেখিত তথ্য ও মতামতকে বোঝার সুবিধার্থে বেশ কিছু দলিলও যুক্ত করেছি। বইটি তথ্যনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ করতে অনেকেই আমাকে বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও দলিল এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন; বিশেষ করে মঈদুল হাসান, মুহাম্মদ লুৎফুল হক, রাশেদুর রহমান, হাফিজুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার স্মৃতিকথা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ায় আমি প্রথমা প্রকাশনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সত্য কথা লিখতে হলে নির্মোহ হতে হয় এবং আবেগের ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। আবেগতাড়িত হলে বা কারও প্রতি আনুকূল্য দেখাতে গেলে অতি অবশ্যই আমাকে হয় সত্য এড়িয়ে যেতে হবে, নতুবা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। আমি এর কোনোটাতেই বিশ্বাসী নই। তাই কখনো কখনো রূঢ় সত্য প্রকাশে ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বাইরে আমি কিছু মন্তব্য করেছি বা প্রমাণ তুলে ধরেছি। আমি মনে করি, সত্যের স্বার্থে এটির প্রয়োজন ছিল। তবে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করতে চাই, আমি যা কিছুই এই বইয়ে উপস্থিত করেছি, তা কাউকে খাটো করা বা কারও ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া বা কারও ছিদ্র অনুসন্ধান করার জন্য নয়, নেহাতই সত্য প্রকাশের জন্য এটি করেছি।

আমি এই বই লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছি মূলত তরুণ প্রজন্মের ইতিহাস জানার আগ্রহ থেকে। তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে চায়, অথচ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছে। সত্য ও মিথ্যাকে তারা আলাদা করতে পারছে না। আমার এই বই তাদের জন্য। তারা সত্যটি জেনে উপকৃত হলে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হব। এ ছাড়া আমার বিশ্বাস, আমার বইয়ে দেওয়া তথ্য হয়তো আগামী দিনের ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের সামান্য হলেও সাহায্য করবে। তবে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, আমার কথাগুলোই শেষ কথা নয়। আগামী দিনের ইতিহাসবিদ ও গবেষকেরা আরও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গতা দেবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমার লেখা *১৯৭১: ভেতরে বাইরে* বইটি প্রকাশের চার দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে। বইটির প্রতি এই আগ্রহের জন্য পাঠকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এখন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে।

বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তবকে আমি লিখেছিলাম, "এই ভাষণের শেষ শব্দ ছিল 'জয় পাকিস্তান'।" আসলে তা হবে, "এই ভাষণের শেষ শব্দগুলো ছিল 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান'।"

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান একটি ত্রুটির ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অসাবধানতাবশত আমি 'এমএলএ' লিখেছি। আসলে তা হবে 'এমপিএ' (মেম্বার অব প্রভিনশিয়াল অ্যাসেমব্লি)। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় সংস্করণের সুযোগে এই সংশোধন করা সম্ভব হলো। সহৃদয় পাঠক এই বইয়ে অন্য কোনো ধরনের ত্রুটি আমার নজরে আনলে বাধিত হব।

এ কে খন্দকার
ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রাক-কথন

মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা লেখার আগে আমার নিজের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক বৈরী সম্পর্কের ভেতর আমি বেড়ে উঠেছি। মূল কথার আগে সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির বিষয়ে একটু আলোচনা করব, যাতে পাঠক সামগ্রিক বিষয়ে একটি ধারণা লাভ করতে পারেন।

১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি রংপুরে আমার জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনা জেলার পুরানভারেঙ্গা ইউনিয়নে। আমাদের বাড়িটি ছিল নগরবাড়ি ঘাটের কাছে। একসময় এ ঘাটে মাঝারি গোছের নৌযান নোঙর করত। আমার বাবা খন্দকার আবদুল লতিফ ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে সরকারের প্রশাসনিক বিভাগে কর্মকর্তা হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। আমার মা আরেফা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। সরকারি চাকরিজীবী বাবা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি হতেন। ফলে আমি বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছি ও বেড়ে উঠেছি এবং আমার বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি বগুড়া, নওগাঁ, রাজশাহী ও মালদহ শহরে পড়াশোনা করেছি। ছোটবেলায় যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছি, সেসব স্থানের পরিবেশ ছিল চমৎকার, আমার খুব ভালো লাগত।

নওগাঁ মিউনিসিপ্যাল স্কুলে আমার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। ১৯৪২ সালে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই। বাবা মালদহে বদলি হওয়ায় আমি মালদহ স্কুল থেকে ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করি। মালদহে আমার সবচেয়ে সুন্দর সময় কেটেছে। এখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ভাগের সময় আমার বাবা পরিবারসহ মালদহ থেকে মেদিনীপুরের কাঁথিতে চলে যান। ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ করে আমিও কাঁথিতে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হই। কাঁথি খুবই সুন্দর একটি শহর ছিল। দেশভাগের পর বাবা পাকিস্তান সরকারের কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ঠাকুরগাঁওয়ে বদলি হয়ে আসেন। বাবা চলে আসার পরও মাস খানেক আমরা কাঁথিতে ছিলাম। তারপর পৈতৃক নিবাস পাবনায় চলে আসি। কিছুদিন পর এখান থেকে বাবার চাকরিস্থল ঠাকুরগাঁওয়ে যাই।

বাল্যকালে আমি জীবনকে গভীরভাবে জানতে ও উপলব্ধি করতে পছন্দ করতাম। ছোটবেলা থেকেই আমি মৃদুভাষী। আমি কোনো কাজে আগ্রহী হলে, কোনো কাজ করব বলে ঠিক করলে, আগে ওই কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করতাম। অর্থাৎ, কোনো কিছু শুরুর আগেই আমি কী করতে যাচ্ছি, তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতাম।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গ রদের (১৯১১) পর বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থের টানাপোড়েন তৈরি হয়। রোপিত হয় সন্দেহের বীজ। এই ঘটনাগুলোর কারণে পিছিয়ে থাকা বাংলার মুসলমানরা ভাবত, হিন্দু নেতারা তাঁদের স্বার্থের প্রতি যত্নশীল নন। একইভাবে বেশির ভাগ হিন্দু তাদের গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মুসলিম সম্প্রদায়কে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলমানদের নিজেদের কাতারে আনতেও তারা সক্ষম হয়নি। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের শুরুতে মুসলমানরা উপলব্ধি করে যে, তারা হিন্দুদের কাছ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ক্রমেই তাদের এই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে।

মালদহে নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি সমগ্র বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব লক্ষ করতাম। মুসলমানরা তখন ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র চাইতে শুরু করে। এই অনুভূতি শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নয়, সমাজের ভেতরেও একইভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু ধর্ম যে একটা রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না, সেটা বুঝতে আমাদের কিছুটা সময় লেগে গিয়েছিল। আমার ধারণা, এই ভুল-বোঝাবুঝির জন্য হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ দায়ী ছিল।

মনে পড়ে, আমি যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি, তখন খাজা নাজিমউদ্দিন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি পুরস্কার প্রদানের জন্য মালদহে আমাদের স্কুলে আসেন। স্কুলের কয়েকজন হিন্দু ছাত্র পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। একজন মুসলিম মন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার নেবে না

আমি যখন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট

বলে পুরস্কার বিতরণের দিন তারা স্কুলেই আসেনি। দেশভাগের সময় মালদহ বা কাঁথিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখিনি। এসব এলাকার মানুষ বেশ আন্তরিক ছিল। হিন্দুরাও খুব বন্ধুসুলভ ছিল। মালদহে আমাদের পাশের বাড়িতে কয়েকটি হিন্দু পরিবার ছিল, তারা খুবই অমায়িক ছিল। আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাদের একটা সুসম্পর্ক ছিল। আমার বাবাকে সবাই খুব শ্রদ্ধা করত।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি রাজশাহী সরকারি কলেজে এইচএসসিতে ভর্তি হই। ১৯৪৯ সালে এইচএসসি পাস করে ওই বছরই ঢাকা আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট) ভর্তি হই এবং আবাসিক ছাত্র হিসেবে কলেজের হোস্টেলে থাকতে শুরু করি। এ সময় পাকিস্তান বিমানবাহিনীর কয়েকজন অফিসারের একটি দল ওই বাহিনীর জন্য বৈমানিক নির্বাচন করার লক্ষ্যে ঢাকায় আসে। ছোটবেলা থেকেই আমি ফ্লাইংয়ের প্রতি আগ্রহী ছিলাম। তাদের আগমনের খবর পেয়ে আমি নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত

নিই। বিমানবাহিনীর এই নির্বাচনীমূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিএ-এমএ উত্তীর্ণ ছাত্রও ছিলেন। একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম, যখন দেখলাম ৪৩ জনের একটি ব্যাচের মধ্যে শুধু আমিই নির্বাচিত হয়েছি। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে নির্বাচনের পরপর আমি প্রশিক্ষণে যোগ দিতে পারিনি। প্রশিক্ষণে যোগ দিতে আমাকে পরবর্তী ব্যাচের রিক্রুটমেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে আমি ক্যাডেট পাইলট হিসেবে বিমানবাহিনীতে যোগদান করি এবং ওই মাসেই প্রশিক্ষণের জন্য পেশোয়ারের রিসালপুরে চলে যাই। রিসালপুরে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর একাডেমিতে (পিএএফ একাডেমি) পাইলটদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। আমি সেখানে ক্যাডেট হিসেবে এক বছর নয় মাসের প্রশিক্ষণ নিই এবং ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিশনপ্রাপ্ত হই। আমার সঙ্গে আরও দুজন বাঙালি ক্যাডেট ছিলেন, তবে একমাত্র আমিই বৈমানিক হিসেবে কমিশন পেয়েছিলাম। এর পর চাকরির বদৌলতে ১৯৫২ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলাম।

কমিশন পাওয়ার পরপরই আমি ফাইটার বিমানের বৈমানিকের প্রশিক্ষণ নিতে করাচির মৌরিপুরে যাই। সেখানে সফলতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ শেষ করে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে পেশোয়ারের পঞ্চম ফাইটার স্কোয়াড্রনে যোগ দিই। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আমি ওই স্কোয়াড্রনে চাকরি করে রাওয়ালপিন্ডির কাছে পাকিস্তান এয়ারফোর্সের চাকলালা স্টেশনে ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এই প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষক হিসেবে পুনরায় রিসালপুরে পিএএফ একাডেমিতে যোগ দিই। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি রিসালপুর থেকে চাকলালা ফ্লাইং স্কুলে প্রশিক্ষক হয়ে আসি। ফ্লাইট কমান্ডার হিসেবে জেট ফাইটার কনভার্সন স্কোয়াড্রনে বদলি হয়ে আসি ১৯৫৯ সালে। এ স্কোয়াড্রনটি করাচির মৌরিপুরে অবস্থান করছিল। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমি প্রশিক্ষক হিসেবে এখানে জেট ফ্লাইং ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ দিই।

এখানে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। তখন আমি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। আমার মৌরিপুরে অবস্থানকালে, সম্ভবত ১৯৫৯ সালে, পাকিস্তান বিমানবাহিনীর প্রধান ছিলেন এয়ার মার্শাল আসগর খান। সিদ্ধান্ত হয়, আমি তাঁকে খারাপ আবহাওয়ায় বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ দেব। আসগর খান পেশোয়ারে বিমানবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে থাকতেন। আমি মৌরিপুর থেকে পেশোয়ারে এসে আসগর খানকে খারাপ আবহাওয়ায় বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ দিই। প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে প্রায় চার-পাঁচটি মিশনে তিনি আমার সঙ্গে

ফ্লাই করেন। আমি ভেবেছিলাম, পেশোয়ারে এই ফ্লাইংয়ের রেকর্ড রাখা হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি, ফ্লাইংয়ের রেকর্ড রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। মৌরিপুর থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পেশোয়ারে আসা এবং ফ্লাইং শেষে মৌরিপুরে ফিরে যাওয়া, মাঝে বিমানবাহিনীর প্রধানকে নিয়ে ফ্লাই করা—সব মিলিয়ে তখন আমাকে ব্যাপক কাজের চাপ সহ্য করতে হয়। আমি কত তারিখ, কখন থেকে কখন পর্যন্ত বিমানবাহিনীর প্রধানকে নিয়ে ফ্লাই করতাম, তা লিখে রাখতাম। এই দিনলিপিগুলো (ডায়েরি) আমি মৌরিপুরে নিয়ে যেতাম। দুঃখের বিষয়, এই দলিলগুলো আমি হারিয়ে ফেলি। স্বাধীনতার পর আসগর সাহেব যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখন তাঁকে বলেছিলাম, 'স্যার, আপনি হয়তো ভুলে গেছেন যে আমি আপনাকে খারাপ আবহাওয়ায় বিমান উড্ডয়নের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। আমার মনে আছে। কারণ, আমি বিমানের একজন সাধারণ বৈমানিক হিসেবে বিমানবাহিনীর প্রধানকে জেট এয়ারক্রাফট খারাপ আবহাওয়ায় চলানোর প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম, যেটা আমার জন্য খুবই সম্মানের ছিল। তবে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল যে প্রতিটি ফ্লাইংয়ের পর আপনি আমাকে বলতেন, "খন্দকার, এটি তোমার একান্ত আন্তরিকতা। আর তুমি আমার জন্য অনেক পরিশ্রম করছ।"' আমি আরও বললাম, 'স্যার, খারাপ আবহাওয়ায় আপনি যে ফ্লাইং প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, তার দলিলপত্রগুলো কি আপনার কাছে আছে?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'না, নেই।'

১৯৬০ সালে আমি স্কোয়াড্রন লিডার পদে পদোন্নতি লাভ করি। ১৯৬১ সালে পুনরায় পিএএফ একাডেমিতে যোগ দিই। সেখানে আমি ক্যাডেট পাইলটদের প্রশিক্ষণ দিতাম। ওই বছরই পিএএফ একাডেমি থেকে আমি করাচির মৌরিপুরে জেট ফাইটার কনভার্সন স্কোয়াড্রনের স্কোয়াড্রন কমান্ডার পদে বদলি হই। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আমি এই দায়িত্ব পালন করি। এরপর পাকিস্তান বিমানবাহিনীর স্টাফ কলেজ থেকে আমি পিএসএ ডিগ্রি লাভ করি। পিএসএ ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৬৬ সালে পিএএফ একাডেমিতে প্রশিক্ষণ শাখার কমান্ডিং কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিই। সে বছরই উইং কমান্ডার পদে পদোন্নতি লাভ করি। পিএএফ একাডেমিতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পিএএফ ফ্লাইং বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করি। এই পদে আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যত রকম নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হবে, তা পরীক্ষা করে দেখা, অর্থাৎ নতুন স্টেশন নির্মাণের স্থান, উচ্চমাত্রার রাডার ও নতুন অস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা ইত্যাদি।

একজন অভিজ্ঞ বৈমানিক হিসেবে আমার ওপর পাকিস্তান বিমানবাহিনীর আস্থা ছিল। খারাপ আবহাওয়া বা ঝড় ও বৃষ্টির সময় সবাইকে বিমান উড্ডয়নের অনুমতি দেওয়া হতো না। যাঁরা কিছুটা দক্ষ বৈমানিক, খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেও তাঁদের একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় বিমান উড্ডয়নের অনুমতি দেওয়া হতো। অর্থাৎ, মেঘ যদি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় থাকে, বাতাসের গতি যদি সেই অনুপাতে থাকে, বৃষ্টি বা কুয়াশার মধ্যে যদি একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত দেখা যায়, তাহলে একজন বৈমানিক ফ্লাই করার অনুমতি পেতেন। উচ্চপর্যায়ের একটি পরীক্ষক দল এসব দিক পরীক্ষা করত। ওই পরীক্ষক দলকে বলা হতো ইন্সট্রুমেন্ট ফ্লাইং এক্সামিনারস। অর্থাৎ, কোনো কিছু না দেখে ইন্সট্রুমেন্টের ওপর নির্ভর করে আকাশে উড়তে হতো। ইন্সট্রুমেন্ট ফ্লাইং এক্সামিনাররা কতটুকু দক্ষ, তা নির্ণয়ের জন্য সমগ্র পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে চিফ ফ্লাইং ইন্সট্রুমেন্ট এক্সামিনারের একটি মাত্র পদ ছিল, যাকে বলা হতো 'সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইন্সস্ট্রুমেন্ট ফ্লাইং ইনস্ট্রাক্টর'। আমি সেই পদটি অর্জনের মর্যাদা লাভ করি। কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোলের (সিএনসি) সাহায্যে খারাপ আবহাওয়ায় বিমান চালাতে হতো এবং খারাপ আবহাওয়ায় বিমান চালানোর জন্য ফ্লাইং রেটিং থাকত। একটু খারাপ আবহাওয়ার জন্য এক

যখন স্কোয়াড্রন লিডার

রকম রেটিংয়ের বৈমানিক থাকতেন, আবার খুব খারাপ আবহাওয়ার জন্য প্রয়োজন হতো উচ্চতর রেটিংয়ের বৈমানিক। বৈমানিকেরা ফ্লাইংয়ে দক্ষ কি না, তা আমি কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোলের (সিএনসি) সাহায্যে পরীক্ষা করে অনুমোদন করতাম। এটা ছিল মূল দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্ব। এই পদে আমি কাজ করি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় আমি পাকিস্তানের ড্রিগ রোডের বিমানঘাঁটিতে ছিলাম। এই যুদ্ধে আমি ছিলাম স্যাবর জেট জঙ্গি বিমানের বৈমানিক। পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ চলেছে ১৭ দিনের মতো। এ যুদ্ধে ভারত পূর্ব পাকিস্তান, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে আক্রমণ করেনি। আমার মনে হয়, দুটি কারণে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি। একটি সামরিক এবং অন্যটি রাজনৈতিক। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো সামরিক স্থাপনা ছিল না। সম্ভবত এ কারণে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আক্রমণ চালায়নি। এ ছাড়া তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতা দেখে আমার ধারণা হয়, ভবিষ্যৎ রাজনীতির পরিকল্পনা হিসেবে '৬৫ সালের যুদ্ধে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ না চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ না করে বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব দেখিয়েছে এবং আমি নিশ্চিত, আমার ধারণাটি ভুল নয়। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে বিমানবাহিনীর অস্ত্র ও সরঞ্জাম এত অল্প ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে ভারতের উদ্বেগের কোনো কারণ ছিল না। তাই যুদ্ধটা ছিল সাধারণভাবে একপক্ষীয়। আমি যত দূর জানি, ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানে বোমা, রকেট কিছুই ছোড়েনি। তারা অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অস্থিতিশীল অবস্থার কথা অনুমান করতে পেরেছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী যেকোনো সময় পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করতে পারত। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কিছু নেই। উপরন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতকে আক্রমণ করা হয়নি বরং ভারতকে আক্রমণ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। ভারতের এই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।

আমার বাবা-মা বাংলাদেশে থাকলেও বেশির ভাগ সময় পাকিস্তানে থাকার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে আমার যাওয়া-আসা একটু কমই হতো। তাই পারিবারিক জীবন শুরু করতেও আমার একটু দেরি হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে আমি উইং কমান্ডার সাইফুর রহমান মীর্জার ছোট বোন ফরিদা মীর্জার

(জেসমিন) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই এবং পারিবারিক জীবন শুরু করি। উইং কমান্ডার মীর্জা ১৯৫০ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে বৈমানিক হিসেবে কমিশন পান এবং ১৯৬৯-এ চাকরি থেকে অবসর নেন। তিনি বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার অধিবাসী ছিলেন। সাইফুর রহমান মীর্জা মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত যুব শিবিরের প্রধান ছিলেন। স্বাধীনতার পর কিছুদিন সিভিল অ্যাভিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পারন করেন। আমার দুই ছেলে এবং এক মেয়ে। বর্তমানে সবাই অস্ট্রেলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। অস্ট্রেলিয়ায় তাদের স্থায়ীভাবে থাকার প্রধান কারণ, ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় বছর আমি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলাম। এ পর্যন্ত আমিই একমাত্র বাংলাদেশি যে 'ডিন অব দ্য ডিপ্লোম্যাটিক কোর' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

১৯৫১ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৮ বছর পাকিস্তানে অবস্থানকালে আমি পাকিস্তানি কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পেয়েছি। পশ্চিম পাকিস্তানে আমার অনেক ভালো বন্ধুও ছিলেন। তাঁরা সব সময় আমার ও আমার পরিবারের প্রতি খুব যত্নবান ছিলেন। যেমন, রাতে বাসায় বিশ্রাম নিচ্ছি, হঠাৎ খবর এল ফ্লাইংয়ে যেতে হবে। ব্যস, অফিসের কাজে বের হয়ে যেতাম। এ সময় আমার স্ত্রী একদম একা থাকত। কিন্তু আশপাশের পরিবারগুলো ছিল অত্যন্ত বন্ধুসুলভ। তারা আমার স্ত্রীর দেখাশোনা করত; সব সময় খেয়াল রাখত, যেন আমার অনুপস্থিতিতে ওর কোনো অসুবিধা না হয়, যেন ভয় না পায়।

১৯৬৯ সালের 8 মার্চ আমি পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ঢাকা ঘাঁটিতে উইং কমান্ডার হিসেবে বদলি হয়ে আসি। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে যেসব ঘটনা ঘটছিল, বিশেষত উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার ফলে আমি তা জানতে পারিনি। কারণ, প্রথমত, পাকিস্তানি পত্রপত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তানের খবরাখবর বিস্তারিতভাবে আসত না। তা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে সংবাদপত্রগুলো ছিল মূলত মুসলিম লীগের মুখপত্র। সেসব গণমাধ্যমে পাকিস্তানপন্থী সংবাদ প্রকাশিত হতো। সত্য খবরগুলো জানা যেত না। ফলে ওই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদ তেমন কিছু জানতে পারতাম না। দ্বিতীয়ত, ১৯৬৯ সালের শুরু থেকে আমি বদলি হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তাই যথাযথভাবে সবকিছুর খবর নিতে পারতাম না। তবে পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের মনে যে প্রচণ্ড রকমের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, তা বুঝতে

পারছিলাম। মার্চ মাসের শুরুতে এখানে এসে দেখি, ঢাকা তথা সমগ্র বাংলাদেশে একটি অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে।

১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। নতুন সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খান মনে করলেন, আইয়ুব খানের সামরিক জান্তা হিসেবে দুর্নাম রয়েছে। সুতরাং, তিনি অন্তত এমনভাবে দেশ চালাবেন, যাতে লোকে বুঝতে পারে, তিনি আইয়ুব খানের মতো স্বৈরশাসক নন। তিনি দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। সেই লক্ষ্যে তিনি গোয়েন্দা বিভাগের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। সামরিক বাহিনীতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কারণে গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পর্কে আমি জানি। গোয়েন্দাদের স্বাভাবিক চরিত্র গড়ে উঠে এমনভাবে যে তাঁরা সেই কথাটিই বলবেন, যা শুনলে শাসকগোষ্ঠী খুশি হবে। গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ইয়াহিয়া খানকে আশ্বস্ত করা হলো যে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ জয়ী হতে পারবে না এবং সরকার গঠনও করতে পারবে না। নির্বাচন ও তার ফলাফলে কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগ ইয়াহিয়া খানকে সম্পূর্ণ ভুল চিত্র দিয়েছিল। গোয়েন্দা বিভাগ ইয়াহিয়া খানকে জানায়, পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোনো দল নেই, যারা মুসলিম লীগকে পরাজিত করে দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে। নির্বাচনে কিছু আসন আওয়ামী লীগ পেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করবে।

নির্বাচন হলো। ফলাফল দেখা গেল গোয়েন্দা বিভাগের দেওয়া চিত্রটির উল্টো। শুধু ইয়াহিয়া খানকে খুশি করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগ ভুল তথ্য দিয়েছিল। ওই সময় পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দলের বিজয়ী হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। প্রথমত, আইয়ুব খানের সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৭০ সালে নির্বাচনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানে বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় হয়, এ দুর্যোগে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ নিহত হয়। এ সময় ইয়াহিয়া খান চীন সফর করছিলেন। সফর শেষে তিনি ঘূর্ণিঝড়-আক্রান্ত পূর্ব পাকিস্তানে না এসে সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। এতে পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন তিনি খুবই সংক্ষিপ্ত সফরে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং বিমানে করে কিছু উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন। অথচ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি একটি দিনের জন্যও বিমান থেকে নেমে দেখলেন না যে ঘূর্ণিঝড়ে দেশটার কী অবস্থা হয়েছে। এটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে

মারাত্মক ভুল। কারণ, বাঙালিরা তখন উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালিদের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন। সত্তর সালের জাতীয় নির্বাচন ছিল বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের একটি ক্রান্তিলগ্ন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি) নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানের ৩০০টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের ১৬৭টিতে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ পরাজিত হওয়ার প্রধান কারণ, মুসলিম লীগের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের জনগণ চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিল। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দিই।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি গ্রুপ ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হই।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছিল। পাকিস্তান সরকারের উচিত ছিল অল্প সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা তার ধারেকাছে না গিয়ে টালবাহানা শুরু করেন। পাকিস্তান সরকার যখন ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে বিজয়ী আওয়ামী লীগের নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করল না, তখন সংবাদপত্রগুলোতে নানা রকম লেখালেখি শুরু হয় এবং একধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি হয় জনসাধারণের মধ্যেও। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আন্দোলন করছিল ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হয়, সরকার ভেতরে ভেতরে কী মতলব করছিল, তা আওয়ামী লীগের নেতা বা সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি।

পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারাও নির্বাচনে বিজয়ী পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসক হিসেবে গ্রহণ করতে চাননি। পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো চেয়েছিলেন যেকোনোভাবেই হোক বাঙালি বা আওয়ামী লীগের হাতে যেন ক্ষমতা না যায়। তিনি পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে বাঙালিবিরোধী পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভুট্টো সাহেব একটি আঁতাত করেন। ভুট্টো সাহেব সেনা কর্মকর্তাদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা বাঙালিদের ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান শাসন করার সুযোগ দিয়ো না।'

১৯৭১ : জানুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ

১৯৬৯ সালের মার্চে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ঢাকা বেসে অ্যাডমিন উইং বা প্রশাসনিক ইউনিটের অধিনায়ক হিসেবে বদলি হয়ে আসার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার উদ্দেশ্যে ভারতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছে, যা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে খুব কম উঠে এসেছে। যেটুকু এসেছে, তাতেও সামগ্রিক চিত্রটি ফুটে ওঠেনি।

আমি ছিলাম ঢাকায় পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে সর্বজ্যেষ্ঠ বাঙালি কর্মকর্তা। এ সুবাদে সরকারের ভেতরের অনেক কর্মকাণ্ড আমার নজরে আসত। আবার সরকারের প্রতিপক্ষ ও সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের নেতাদের পদক্ষেপগুলোও আমি নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করতাম।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে টালবাহানা করতে থাকেন। ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে ১৪ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খান বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। যখন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, আমি আর থাকব না। শিগগির শেখ মুজিবের সরকার হবে।' জেনারেল ইয়াহিয়া রাওয়ালপিন্ডিতে যাওয়ার পর পাখি শিকারের আড়ালে ১৭ জানুয়ারি লারকানায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর গোপন আলোচনা হয়। ধারণা করা যায়, এ আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা থেকে কীভাবে বাঙালিদের দূরে রাখা যায় এবং তাদের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বাঙালি

বা আওয়ামী লীগের হাতে কোনোমতেই ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। এ জন্য তাঁরা সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। লারকানার এই ষড়যন্ত্রমূলক আলোচনায় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার টু প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস জি এম পীরজাদা, চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান, গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল ওমর প্রমুখ। ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ করলেও তখন পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেননি। ২৭ জানুয়ারি মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একটি আপস-মীমাংসার লক্ষ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোও ঢাকায় এলেন। এই বৈঠকে নতুন সরকারে ভুট্টো ও তাঁর দলের ভূমিকা কী হবে, এই বিষয়টি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা হয়নি।

জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের নতুন কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরই গঠন করার কথা। এ সময় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটি সংবাদ প্রচার করা হয় যে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের জাতীয় দিবস, অর্থাৎ ২৩ মার্চ উপলক্ষে প্যারেডটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এবং এটি হবে পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্যারেড। ঢাকায় আমি বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হওয়ায় আমাকে ওই প্যারেডের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। আমি সফলভাবে প্যারেড অনুষ্ঠানের জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি ও সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের প্যারেডে যাওয়া-আসার পথ তৈরিসহ আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রায় প্রতিদিন কুর্মিটোলায় পূর্বাঞ্চলীয় সেনা সদর দপ্তরে যেতাম।

আগেই উল্লেখ করেছি, ১৭ জানুয়ারি ভুট্টো গং লারকানাতে বসে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এই বৈঠকের কিছুদিন পর আমার কাছে এক ব্রিগেডিয়ার সংবাদ দিলেন যে এবারের প্যারেড অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়েছে। এই সংবাদে আমি বেশ আশ্চর্য হলাম। হঠাৎ কেন অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হলো, তা জানতে আমি সেনা সদর দপ্তরে যাই। অফিসে ঢুকতেই দেখি, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদমর্যাদার বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা সেখানে আলোচনা করছেন। তাঁরা হঠাৎ আমাকে সেখানে দেখে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যান। তাঁদের অবস্থা দেখে মনে হলো, এই সভায় আমার উপস্থিতি কাম্য নয়। তাঁরা আমাকে দেখে বললেন, 'খন্দকার

সাহেব, ভেতরে এসে বসুন।' আমি বললাম, 'ধন্যবাদ। আমার কিছু কাজ আছে।' এরপর আমি সেখান থেকে চলে আসি।

এতগুলো পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসারের উপস্থিতি এবং সভার মেজাজ দেখে আমার মধ্যে অনেক ধরনের প্রশ্নের উদয় হয়। সন্দেহ জাগে যে কোথাও কিছু একটা হতে যাচ্ছে, যা খুবই গোপনীয় ও সন্দেহজনক। কোনো ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও কোনো পূর্বাভাস ছাড়া এত বড় একটি প্যারেড বাতিল করে দেওয়ার বিষয়টি আমার কাছে খুব অস্বাভাবিক ও উদ্বেগজনক মনে হয়। আমি বিষয়টি উইং কমান্ডার এস আর মীর্জার সঙ্গে আলোচনা করি; তিনিও আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। আমি এবং উইং কমান্ডার মীর্জা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আহমেদ রেজাকে বলি, 'তুমি দয়া করে আওয়ামী লীগের উচ্চপদস্থ নেতাদের জানাও যে দেশের পরিস্থিতি ভালো নয়। আগামীতে সাংঘাতিক কোনো কিছু হতে যাচ্ছে।' ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজা আমার কিছু পরে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যোগ দেওয়া একজন বৈমানিক। তিনি আগেভাগে বিমানবাহিনী থেকে অবসর নেন। ১৯৭১ সালে তিনি ইস্ট পাকিস্তান জুট করপোরেশনের কর্মকর্তা ছিলেন। বেসামরিক প্রশাসনে সংযুক্ত থাকায় তাঁর সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাদের যোগাযোগ ছিল। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত যুব শিবিরের উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নৌ-কমান্ডো দলের প্রশিক্ষণ শুরু হলে তিনি কিছুদিন প্রশিক্ষণ শিবিরের তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

তখন দেশে রাজনীতির ময়দানে অনেক আলোচনা-সমালোচনা চলছে, আন্দোলন হচ্ছে—তার গুরুত্ব একরকম; আবার রাজনীতির বাইরে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের ভেতরে যা হচ্ছে তার গুরুত্ব আরেক রকম। আমি মোটামুটিভাবে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে নজর রাখছিলাম। তবে আমি বেশি নজর রাখছিলাম পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মধ্যে কী হচ্ছে, সেদিকে। মনে রাখতে হবে, আমি সামরিক প্রশাসনের ভেতরে থাকায় বা প্রশাসনের অংশ হওয়ার কারণে দেশের পরিস্থিতি ও পাকিস্তানিদের গতিবিধি রাজনীতিবিদ বা অন্যদের চেয়ে বেশি উপলব্ধি করতে পারতাম। আর এ কারণেই আমি সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরের খবর প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের নেতাদের কাছে পাঠাতে পারতাম।

ফেব্রুয়ারি মাসের বিভিন্ন ঘটনা দেখে আমার মনে হয়েছিল, পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।

ইতিমধ্যেই তারা গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য নিয়ে আসা শুরু করে। পাকিস্তানিদের এ ধরনের খারাপ মতলব বা কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষ বা রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। এমনকি বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের কাছেও বিষয়টা খুব গোপন রাখা হতো। সম্ভবত বাঙালি হিসেবে আমিই প্রথম পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে আসার বিষয়টি বুঝতে পেরেছি। এ সময় ঢাকায় শুধু তেজগাঁও বিমানবন্দরে বোয়িং বিমান ওঠানামা করত। তেজগাঁও বিমানবন্দরের উল্টো পাশে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উত্তরে সরকারি বাসায় আমি পরিবার নিয়ে বসবাস করতাম। বিমানবন্দরে কোনো বিমান ওঠানামা করলে আমি বাসা থেকেই তা দেখতে পেতাম।

সম্ভবত ১৮ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বিমানবন্দরে একটি বোয়িং এয়ারক্রাফট অবতরণ করে। আমি সে সময় বিমানবন্দরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি ঢাকা বেসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হওয়ায় সব বিমানের আসা-যাওয়ার খবর জানতে পারতাম। অথচ এই সময় যে পশ্চিম পাকিস্তান বা অন্য জায়গা থেকে কোনো বিমান আসবে, তা আমার জানা ছিল না। বিমানটি নামার পর দেখলাম, সিভিলিয়ান পোশাকে সেনাবাহিনীর জোয়ানরা নামছে। ঘটনার পরপরই আমি তখনকার ডিজিএফআইয়ের ঢাকা শাখার প্রধান উইং কমান্ডার আমিনুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করেছি, কেন সৈন্য নিয়ে আসা হচ্ছে? তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন, 'এখানে ওদের একটা এক্সারসাইজ হবে, তাই কিছু সেনা আসছে, কিছু সেনা যাচ্ছে। এই, আর কিছু নয়।' কিন্তু আমি স্পষ্টতই বুঝতে পারছিলাম যে তিনি সঠিক কথাটি বলছেন না। আমার মনে হয়েছে যে তিনি প্রকৃত তথ্যটি আমার কাছে গোপন করছেন। তবে এটাও হতে পারে, পাকিস্তানিরা তাঁকেও অন্ধকারে রেখেছিল। উইং কমান্ডার ইসলাম বিমানবাহিনীর একজন বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি আগস্ট মাসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেও পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধে তাঁকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, বরং তাঁকে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। আমিনুল ইসলাম পরবর্তী সময়ে এয়ারভাইস মার্শাল পদে উন্নীত হয়ে ডিজিএফআইয়ের প্রধান হয়েছিলেন। পরে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আসার সংবাদ আমি নিজের ভেতরে রাখিনি, বরং চেষ্টা করেছি সবাইকে জানাতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছি।

আমি প্রায় ২০ বছর পর পূর্ব পাকিস্তানে এসেছি। তাই অল্প সময়ে আমার পক্ষে আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও পূর্ব পাকিস্তানে আবস্থিত সব

বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা সম্পর্কে জানা বা পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তার পরও আমি ওই সময়ে আমার স্ত্রীর বড় বোন ফৌজিয়া মীর্জা, উইং কমান্ডার এস আর মীর্জা ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের ভেতরকার সংবাদ, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর সংবাদ আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকদের কাছে পাঠাতাম। তাঁদের জানাই যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় প্রতিদিন বিমানভর্তি অস্ত্র ও সেনা ঢাকায় আসছে। গোপনীয়তার স্বার্থে এদের বেসামরিক পোশাকে ঢাকায় জমায়েত করা হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা অস্ত্রগুলো দ্রুত অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যাতে কেউ দেখতে না পায়। এভাবে অস্ত্র ও সেনা আনা ক্রমে বাড়তেই থাকে। এ ধরনের খবর যে শুধু আমি একা আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে পাঠাতাম, তা নয়। আমার পরামর্শে আমার স্ত্রীও বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন খাদিজা হোসাইনের স্বামী সৈয়দ হোসেনের কাছে এসব খবর নিজ উদ্যোগে পৌঁছে দিতেন।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ১ ডিভিশন (১৪তম ডিভিশন) সৈন্য ছিল। এই ডিভিশনের জনবল ছিল প্রায় ১৪ হাজার। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ডিভিশন হিসেবে পরিচিত ৯ ডিভিশন ও কোয়েটা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৬ ডিভিশনকে এভাবে গোপনে বেসামরিক পোশাকে বিমানে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে ২ মার্চ 'এমভি সোয়াত' নামের একটি পাকিস্তানি জাহাজ প্রায় সাত হাজার টন অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে। এতে বোঝা যায়, পাকিস্তানিরা কীভাবে দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছিল।

এ সংবাদ আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে অনেকে জানতেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের (পাকিস্তানিদের) শক্তি বৃদ্ধির দিকে ছিল না। তাঁদের একটি ধারণা ছিল, তাঁরা সমস্যাটি রাজনৈতিকভাবে সমাধান করে ফেলবেন। আমি মনে করি, জাতির এ ধরনের ক্রান্তিকালে রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়াও একাধিক বিকল্প পরিকল্পনা থাকা উচিত ছিল, যাতে একটি ব্যর্থ হলে অন্যটি প্রয়োগ করা যায়। আমি এমন কোনো তথ্য পাইনি, যাতে মনে করতে পারি যে রাজনৈতিক পন্থা ব্যর্থ হলে আওয়ামী লীগের নেতারা বিকল্প পন্থা হিসেবে অন্য কোনো উপায় ভেবে রেখেছিলেন।

সম্ভবত মার্চ মাসের শুরুতে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও সেনা আনার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন বাঙালি বৈমানিক ক্যাপ্টেন নিজাম চৌধুরী।

ক্যাপ্টেন নিজাম পিআইএর কো-পাইলট ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি পিআইএর বিমানে সৈনিক পরিবহনে অস্বীকৃতি জানান এবং বিমান থেকে নেমে চলে যান। যদিও আমি ঘটনাটি পরে শুনেছি। নিজাম খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন। দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিয়ে তিনি বেশ অখুশি ছিলেন। তিনি অন্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতেন, 'আমরা পাকিস্তানিদের এই অন্যায় মেনে নিতে পারি না।' সামরিক কর্তৃপক্ষ এটাকে সহজভাবে নেয়নি। তারা ক্যাপ্টেন নিজামকে বরখাস্ত এবং অন্তরীণ করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। দেশদ্রোহের অভিযোগে ক্যাপ্টেন নিজাম চৌধুরীর কপালে দীর্ঘ কারাবাস অথবা আরও খারাপ কিছু হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে সৌভাগ্যবশত তাঁর স্ত্রী একজন বিদেশি (জার্মান) হওয়ায় সে যাত্রায় তিনি বেঁচে যান। তাঁর স্ত্রীর প্রচেষ্টায় এবং জার্মান দূতাবাসের হস্তক্ষেপের কারণে তিনি তখন কঠিন শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেলেও একাত্তরের পুরো সময়টাই তাঁকে অন্তরীণ অথবা নজরবন্দী থাকতে হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি করাচি থেকে পালিয়ে আসেন।

একাত্তরের ১ মার্চ শাহীন স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছিল। ওই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঢাকা এয়ার বেসের কমান্ডার এয়ার কমোডর জাফর মাসুদের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। এয়ার কমোডর মাসুদ হঠাৎ ওই দিন সকাল প্রায় আটটার দিকে আমাকে বলেন, 'খন্দকার, তুমি আজকের অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থেকো এবং সভাপতিত্ব করো।' তিনি আরও বললেন, 'আমার একটু কাজ আছে। তাই অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করতে পারব না।' এখানে কমোডর মাসুদ সম্পর্কে একটি তথ্য দেওয়া প্রাসঙ্গিক মনে করছি। কমোডর মাসুদ ব্রিটিশ আমলে ভারতের রাজকীয় বিমানবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি অবাঙালি হলেও অহেতুক জীবনহানির বিরোধী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ঢাকার বাইরে যেসব এলাকায় পাকিস্তানি সেনারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, সে জায়গাগুলোতে বিমান হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন পাকিস্তানি জেনারেলরা। কিন্তু কমোডর মাসুদের বিরোধিতার কারণে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। ২৫ মার্চের আক্রমণের পরপরই ঢাকায় নতুন বেস কমান্ডার যোগ দেন। ৩১ মার্চ কমোডর মাসুদকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাঁকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে কোর্ট মার্শাল করে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

যাহোক, ১ মার্চ বেলা একটার দিকে ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করেন। অধিবেশন বাতিলের ঘোষণাটি যখন এল, আমি তখন শাহীন স্কুলের ভেতরে। তখন কোথায় অনুষ্ঠান, কোথায় পুরস্কার! সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। দ্রুত ঢাকার চেহারা পাল্টে যেতে লাগল। ইয়াহিয়ার ঘোষণার পরপরই জনতা রাজপথে নেমে আসে। ঢাকায় বিক্ষোভ শুরু হলে কলেজের অনুষ্ঠানটি ভেস্তে যায়। সবাই নিরাপদ স্থানের জন্য ছোটাছুটি করতে শুরু করে। এই মুহূর্ত থেকেই বাঙালিরা ধারণা করতে থাকে যে এবার বোধ হয় রক্তক্ষয়ী কিছু একটা হবে। অনেককে বলতে শুনেছি, এবার বাঙালি সহজে ছাড়বে না। আর পাকিস্তানিরা তো ক্ষমতা হস্তান্তর করবেই না।

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করলে জবাবে আওয়ামী লীগ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির তৎপরতা—এ দুটি বিষয় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে কর্মরত এবং পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি সদস্যরা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। আন্দোলন জোরদার হওয়ার পটভূমিতে এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ব্যাপক যুদ্ধ-তৎপরতার মুখে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তাঁরা দেশের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বুঝতে পারেন। তাঁরা অনুভব করতে থাকেন যে এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তাঁদের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। আওয়ামী লীগের তরফ থেকে তাঁদের প্রতি কোনো নির্দেশনা বা কোনো সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে শেখ মুজিব বেসামরিক প্রশাসন, শিল্পকারখানা, সাধারণ জনগণকে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ দেন, যা সবাই মেনে চলছিল।

আমি নিজেও গভীরভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর কর্মতৎপরতা লক্ষ করতাম। সরকারের ভেতরের খবরগুলো উইং কমান্ডার এস আর মীর্জা, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজা এবং অন্যদের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে পৌঁছে দিতাম 'আমাদের কী করতে হবে?'—এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায়। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পাইনি। এ বিষয়ে রাজনৈতিক নেতারা আমাদের কিছু জানাননি। যদি কেউ বলেন যে তখন আওয়ামী লীগের নেতারা যুদ্ধের নির্দেশনা দিয়েছিলেন,

তবে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে হয় যে তা সঠিক নয়। অন্তত আমি কোনো নির্দেশনা পাইনি।

শোনা যায়, মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্ররা নিজ উদ্যোগে পুরোনো ৩০৩ রাইফেল দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ের মতো তখন তথ্যপ্রযুক্তি এত উন্নত ছিল না। তাই এ ধরনের কোনো তৎপরতার খবর তাৎক্ষণিকভাবে আমি বা অন্য সামরিক কর্মকর্তারা জানতে পারিনি। এর ফলে কর্মরত বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের ধারণা হয় যে রাজনৈতিক নেতাদের কোনো ধরনের যুদ্ধ প্রস্তুতি নেই। ফলে ২৫ মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশে যখন পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করল, তখন এটিকে প্রতিহত করার জন্য বাঙালি সেনাসদস্যদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। এটা ছিল বাস্তব সত্য। তবু পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নিজ উদ্যোগে বাঙালি সেনাসদস্যরা যে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, সেটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। বিনা প্রস্তুতিতে সীমিত অস্ত্র নিয়ে তাঁরা যে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করেন, তা মুক্তিযুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়া শত্রুকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল। এই ব্যাপক ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হতো, যদি বাঙালি সেনাসদস্যদের রাজনৈতিক উচ্চমহল থেকে চলমান পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত করা হতো এবং তা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হতো।

এদিকে মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ঢাকাসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। এ সময় যে লুটপাট শুরু হয়েছিল, তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এসব লুটপাটের সঙ্গে বাঙালিরাও জড়িত ছিল। প্রতিটি সমাজেই এই ধরনের দুষ্কৃতকারীর অভাব হয় না। আমরা সবাই যে ফেরেশতা, তা তো নয়। অবাঙালিরা নিরাপত্তাহীনতার জন্য ঢাকা ছেড়ে যখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকা বা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছিল, তখন রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের সোনার গয়না, টাকাপয়সা ও মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লুট করে নিয়ে গিয়েছিল বাঙালিরা। এটা যে খুব ব্যাপকভাবে হয়েছিল, তা নয়। তবে যেটুকু হয়েছিল, তার জন্য আমি খুব কষ্ট পেতাম। সেই সময় স্থানীয় প্রশাসন খুব একটা কার্যকর ছিল বলে আমার মনে হয় না। আমার বাসা যেহেতু প্রধান সড়কের সঙ্গে লাগোয়া ছিল, তাই এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা আমার সামনেই ঘটেছে। এদের আমি
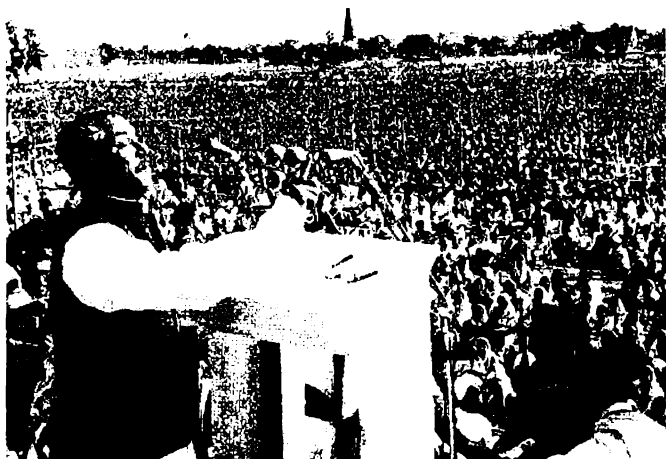
সাতই মার্চ রেসকোর্সে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

চিনতে পারিনি বা বাধাও দিতে পারিনি, তবে এরা সবাই বহিরাগত ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ ধরনের লুটপাটের চরম বিরোধী ছিলাম। পাকিস্তানিদের কুকীর্তির উত্তর এটা হতে পারে না, বরং এ কাজটি একই রকম অন্যায় বা অপরাধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালেও এ ধরনের কিছু অপরাধমূলক কাজে বাঙালি দুষ্কৃতকারীদের সংবাদ আমরা পেতাম, যা আমরা কখনো সমর্থন করতাম না, বরং কঠোর হস্তে তা দমনের উদ্যোগ নিতাম। এ ধরনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে প্রতিরোধযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এগুলো ছিল নেহাতই কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

দেশের এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ ভাষণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু কী বলেন তা শোনার জন্য দেশের মানুষ অপেক্ষা করছিল। ইয়াহিয়া খান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে সাতই মার্চ যদি বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তাহলে এই আন্দোলনকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না। তাই তিনি বঙ্গবন্ধুকে বলেন, 'তুমি এমন কিছু করো না, যা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়। আমি আলোচনা করার জন্য ঢাকায় আসছি।' সাতই মার্চের ভাষণের দিন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের পরিস্থিতি বেশ স্বাভাবিক ছিল, সবাই ব্যস্ত ছিল নিজ নিজ কাজে। এদিন বঙ্গবন্ধু যে ভাষণটি দিলেন, তা খুবই তির্যক ছিল। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে

বাঙালিরা ভাবতে আরম্ভ করল, সত্যিই কি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, আমরা কি যুদ্ধে নামব, নাকি গ্রামে চলে যাব।

সাতই মার্চের ভাষণটি আমি শুনেছি। এর মধ্যে যে কথাগুলো আমার ভালো লেগেছিল, তা হলো : 'দুর্গ গড়ে তোলো', 'তোমাদের যার যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাকো', 'শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে', 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ সময় সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ তাঁর কাছ থেকে এ ধরনের কথা আশা করছিল। ওই কথাগুলো শক্তিশালী ছিল বটে, তবে তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা আওয়ামী লীগের নেতাদের ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, কীভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, তা তিনি পরিষ্কার করেননি। তা ছাড়া জনগণকে যুদ্ধ করার জন্য যেভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন, তা করা হয়নি। ভাষণে চূড়ান্ত কোনো দিকনির্দেশনা পাওয়া গেল না। ভাষণটির পর মানুষজন ভাবতে শুরু করল—এরপর কী হবে? আওয়ামী লীগের পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় যুদ্ধ শুরু করার কথা বলাও একেবারে বোকামি হতো। সম্ভবত এ কারণেই বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকেন। তা ছাড়া ইয়াহিয়া খান নিজেও ওই ধরনের ঘোষণা না দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু হয়তো ঢাকায় ইয়াহিয়ার উপস্থিতিতে একটি রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণেই যে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তা আমি মনে করি না। এই ভাষণের শেষ শব্দগুলো ছিল 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান'। তিনি যুদ্ধের ডাক দিয়ে বললেন, 'জয় পাকিস্তান'! এটি যে যুদ্ধের ডাক বা স্বাধীনতার আহ্বান, তা প্রচণ্ডভাবে প্রশ্নবিদ্ধ এবং তর্কাতীতও নয়। যদি আওয়ামী লীগের নেতাদের কোনো যুদ্ধ-পরিকল্পনা থাকত, তাহলে মার্চের শুরু থেকে জনগণ এবং সরকারি, বেসরকারি ও সামরিক কর্মকর্তাদের স্বল্প সময়ে সঠিকভাবে সংগঠিত করা যেত। সেটা করা হলে আমার মনে হয় যুদ্ধটি হয়তো-বা খুব অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যেত এবং আমাদের বিজয় নিশ্চিত হতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সেটা করা হয়নি।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই সামরিক বাহিনীতে পাকিস্তানিরা কৌশলে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডে বাঙালিদের এড়িয়ে যেতে শুরু করে। ফলে বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ক্রমেই বাড়তে থাকে। সরকারি এবং বেসরকারি অফিসেও বাঙালি ও পাকিস্তানি

কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব দেখা দেয়। অন্যান্য সৈনিকের মতো বাঙালি সৈনিকেরাও সাধারণত রাইফেল নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কুচকাওয়াজ করতেন। কিন্তু এ সময় বাঙালিদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে সরিয়ে রাখা হয়। তাঁদের অস্ত্র দেওয়া হতো না। যাঁদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়নি, মিথ্যা অজুহাতে তাঁদের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা একসঙ্গে বড় শক্তি না হয়ে দাঁড়ায়। অফিস-আদালতে সব কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ আলমারির ভেতরে রেখে চাবি দেওয়া হতো পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের হাতে; তাঁরাই অফিসের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো পালন করতেন। এভাবে বাঙালি ও পাকিস্তানিদের মধ্যে সন্দেহের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ঢাকায় বাঙালিদের সব রকমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে কৌশলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। বাঙালি কর্মকর্তারা ভাবতে লাগলেন, সহজে এই সমস্যার সমাধান হবে না; পাকিস্তানিরা সহজে ক্ষমতা ছাড়বে না।

বিরাজমান অস্থির ও গুমোট পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পিআইএ বা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের বাঙালি প্রকৌশলী বা কলাকৌশলীরা মাঝেমধ্যে আমার কাছে আসতেন পরামর্শ ও উপদেশ নিতে। আমি সবাইকে সবকিছু ধীরস্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলতাম এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁদের কাজ বা অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে বলতাম। আমি তাঁদের পাকিস্তানিদের অসহযোগিতা করা বা বিদ্রোহ করা ইত্যাদি কোনো পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিতে পারতাম না। কারণ, এখানে দুই ধরনের জটিলতা ছিল। প্রথমত, আমি বাঙালি সব টেকনিশিয়ানকে চিনতাম না বা তাঁদের উদ্দেশ্য কী, তা জানতাম না। তাই সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে সবাইকে আমি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলতে পারতাম না। এ কাজটি আমার জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারত। দ্বিতীয়ত, আমি তাঁদের কোন সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলব? সেই আন্দোলন তো তখনো শুরুই হয়নি। সর্বোপরি, সব বাঙালি টেকনিশিয়ান যে আমার কথা শুনবেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করবেন, তারও তো কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

অন্যদিকে বিমানবাহিনীর সদস্যরা খুব ঘনিষ্ঠ না হলে একে অন্যের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলাটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করতেন। তবে যাঁরা খুব পরিচিত এবং যাঁদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ জানাশোনা ছিল, আমি তাঁদের সঙ্গে খোলামনে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। যেমন উইং কমান্ডার এস আর মীর্জা, উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার (বীর উত্তম, পরে এয়ারভাইস মার্শাল ও বিমানবাহিনীর প্রধান), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট

রেজা প্রমুখ আমার ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। আমি বিশ্বাস করতাম যে তাঁরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, জীবন দেবেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। বিমানবাহিনীর ভেতরে পরিচিত বাঙালি টেকনিশিয়ানদের মধ্যে যাঁরা পরামর্শের জন্য আমার কাছে আসতেন, তাঁদের আমি পরিষ্কারভাবে বলতাম, সবকিছু খুব অনিশ্চিত এবং জটিল, যেকোনো সময় যেকোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। তাই তাঁদের সাবধানে থাকতে বলতাম। তাঁদের আরও বলতাম, ভবিষ্যতে তাঁদের এমন কাজ করতে হতে পারে, যা তাঁরা সে মুহূর্তে চিন্তাও করতে পারছেন না।

মার্চ মাসে প্রায় প্রতিটি শহরে অসহযোগ আন্দোলন যথেষ্ট গতি পেলেও এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর প্রস্তুতিতে বিশেষ কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। কিছুটা গোপনে আর কিছুটা প্রকাশ্যে তারা সব প্রস্তুতি যথাযথভাবে চালিয়ে যেতে থাকে। কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের এই প্রস্তুতি দুর্বল করা যায়, সেই পরামর্শ আমি বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে পৌঁছে দিতাম।

আমার স্ত্রীর বোন ফৌজিয়া মীর্জা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পড়াশোনা করতেন। তাঁদের বাড়িতে আমি প্রায়ই যাওয়া-আসা করতাম। আমি একদিন ফৌজিয়া মীর্জাকে বলেছিলাম, 'এ আন্দোলনে অনেক কিছু করা সম্ভব। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতারা সেগুলো করছেন না।' ফৌজিয়া মীর্জা জানতে চান, 'কী করা যেতে পারে?' আমি তখন বললাম, 'নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে জ্বালানি তেলের আধার রয়েছে। এখানে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেলের মজুত রাখা হয়। সেখান থেকে সড়কপথে পাকিস্তানি বাহিনীর গাড়ি জ্বালানি তেল সংগ্রহ করে ঢাকায় নিয়ে আসে। যদি ঢাকায় আসা-যাওয়ার রাস্তাটিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায়, তাহলে এদের জ্বালানি তেল সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে তাদের চলাচলও সীমিত হয়ে যাবে। যদি চলাচল কমানো যায়, তাহলে কিছুটা হলেও তাদের প্রস্তুতিতে বাধার সৃষ্টি হবে। এ জন্য গোদনাইলের রাস্তাটি কেটে বা গাছের গুঁড়ি দিয়ে এমনভাবে রাখতে হবে, যেন তারা যাওয়া-আসা করতে না পারে এবং জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে না পারে। ফৌজিয়া মীর্জা আমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং তাঁর সহপাঠী চিশতির সঙ্গে আলোচনা করেন। চিশতি ও তাঁর বন্ধুরা মিলে একদিন গোদনাইল যাওয়ার রাস্তাটি কেটে দেন এবং বেশ কিছু গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে রাখেন। এ কাজে নারায়ণগঞ্জের সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করে। ওই সময় রাজনৈতিক নেতারা এসব কাজে সাহায্য করতে

আসেননি। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা রাস্তাটি পুনরায় চলাচলের উপযোক্ত করে নেয়। তবু এ কাজের ফলে ছাত্র-জনতা তাদের সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। চিশতির সম্পূর্ণ নাম ও পরিচয় এখন আমার আর মনে পড়ছে না। তবে পরে জেনেছিলাম, ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানিদের আক্রমণে তিনি নিহত হন।

আমি পাকিস্তানিদের তটস্থ রাখা ও তাদের প্রস্তুতি ব্যাহত করার পরিকল্পনাগুলো উইং কমান্ডার এস আর মীর্জাকেও জানিয়েছিলাম। আমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুই দিনের আন্দোলনেই যুদ্ধ জয় করা সম্ভব নয়, বিজয়ের জন্য যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। আমাদের উচিত ছিল, পাকিস্তানিরা পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার আগেই ছোট ছোট আঘাত আর খোঁচার মাধ্যমে তাদের নাজেহাল করা, আর ছোট ছোট উদ্যোগের সাহায্যেই চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য সামরিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা। আমার বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে ছিল, আমরা যদি এক জায়গায় ছোট্ট একটা ব্রিজ ভেঙে ফেলতে পারি বা অন্য এক জায়গায় ট্রান্সমিটার বিকল করে দিতে পারি, তবে পাকিস্তানিরা সব সময় একধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপের মধ্যে থাকবে। এভাবে ছোট ছোট চলাচল ও যোগাযোগের মাধ্যম বা স্থাপনা নষ্ট বা ধ্বংস করে আমরা তাদের ক্রমেই একটি দুর্বল অবস্থানে নিয়ে যেতে পারতাম। এসব কাজ আমাদের করা উচিত ছিল, আর এগুলোর জন্য আমাদের অনেক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু সেগুলো আমরা করিনি। তখন পাকিস্তানি বিমানের ভারতীয় ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসার অনুমতি ছিল না, শ্রীলঙ্কা হয়ে আসতে হতো। এ কারণে পাকিস্তানিদের তিন-চার গুণ বেশি জ্বালানি তেলের প্রয়োজন হতো। এ ছাড়া সড়কপথে চলাচলের জন্যও পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচুর জ্বালানি তেলের প্রয়োজন হতো। গোদনাইল থেকে ঢাকায় আসা-যাওয়ার রাস্তাটি কেটে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করলে পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে পারবে না। এটা ঠিক যে একবার রাস্তা কাটলে সেটিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেরামত করা সম্ভব। তবে একবার ঠিক করলে পুনরায় তা কাটাও সম্ভব ছিল। একই সঙ্গে গোদনাইল সড়কে অনেক জায়গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করাও কঠিন কোনো কাজ ছিল না। এতে তাদের যোগাযোগব্যবস্থা ঠিক রাখাই একটা বড় কাজে পরিণত হতো। বারবার নাজেহাল করা গেলে পাকিস্তানিরা কিছুটা হলেও অসুবিধায় পড়ত। সারা দেশে এ ধরনের ছোট ছোট তৎপরতা চালিয়ে পাকিস্তানিদের দৌড়ের ওপর

রাখা যেত। এতে ২৫ মার্চ এবং এরপর কিছুদিন পর্যন্ত তারা যে ফাঁকা মাঠে একতরফা খেলেছিল, তা পারত না।

আরেক ধরনের কার্যকর অসহযোগিতার কথা নিচে উল্লেখ করছি। কচুক্ষেত বাজারের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে এই বাজারে মাছ, মাংস, চাল, ডাল, শাকসবজি প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্যদ্রব্য আসত। কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বসবাসরত সব বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানি পরিবার কচুক্ষেত বাজার থেকে এসব পণ্য কিনত। কচুক্ষেত তখন অনুন্নত উপশহর ছিল। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের পর কচুক্ষেতের সাধারণ মানুষ বাজারে কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে সেনানিবাসে বসবাসরত সামরিক ও বেসামরিক মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনারা সব সময় চোরাগোপ্তা আক্রমণের ভয়ে ভীত থাকত বলে দূরের কোনো বাজারে যেত না। কচুক্ষেত বাজারে নিত্যনৈমিত্তিক জিনিসের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে তারা অনেকে একত্র হয়ে নিরাপত্তাসহ ঢাকা শহরের বড় বাজারগুলোতে যেত। এতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় কিছুটা কম থাকত। কিন্তু এভাবে নিরাপত্তাসহ বড় দলে চলাচলের ফলে তাদের সময় ও শ্রম বেশি লাগত, উপরন্তু চলাচলের গতিও মন্থর হয়ে পড়ত।

১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলে অন্যদের সঙ্গে আমিও তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে যাই। ইয়াহিয়া খান ঠাট্টার ছলে তাঁর স্টিকের সাহায্যে এক পাকিস্তানি ঊর্ধ্বতন অফিসারের পেটে খোঁচা দিয়ে বলেন, 'খাওয়াদাওয়া কি কম হচ্ছে, না খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো পাচ্ছ না?' এতে বোঝা যায় যে কচুক্ষেত বাজারের ঘটনা এবং এর ফলে সেনানিবাসে সৈন্যদের খাওয়াদাওয়ায় অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার কথাটি তিনি জানতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ, একটি ছোট ও কার্যকর অবরোধের সংবাদ প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। কারণ, অবরোধটি ছোট হলেও এর প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। কচুক্ষেতের এই অসহযোগিতার কাজটি করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বেসামরিক বাঙালি কর্মকর্তা ও সৈনিক, যাঁরা ক্যান্টনমেন্টের বাইরে থাকতেন। এ ধরনের কিছু কিছু অবরোধ অন্যান্য সেনানিবাসেও হয়েছিল, তবে তা ছিল খুব সাময়িক ও অপরিকল্পিত। এগুলো হয়েছিল একেবারে স্থানীয়ভাবে কোনো সমন্বয় ছাড়াই। এরকম অবরোধ বা ঘটনা যদি কেন্দ্রীয়ভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যেত, তাহলে হয়তো-বা হানাদার বাহিনীকে আমরা খুব অল্প সময়েই দুর্বল করতে পারতাম।

৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে সরিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। ৭ মার্চ জেনারেল টিক্কা খান ঢাকায় পৌঁছান। এরপর ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ জাতীয় অধিবেশন বসার ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণার পরও পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অতিরিক্ত সামরিক ইউনিট নিয়ে আসার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। তাঁদের মধ্যকার আলোচনায় দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমি লক্ষ করলাম, আলোচনার আড়ালে পাকিস্তানিদের অস্ত্র ও সেনা আসা অব্যাহত আছে। ১৫ মার্চ থেকে ঢাকায় শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খান উভয়েই আলোচনার নামে দুই ধরনের রাজনৈতিক খেলা খেলছিলেন। প্রায় ১০ দিন ধরে দুজনের মধ্যকার আলোচনা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিশেষ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেনি। এদিকে ভুট্টো বলেন যে মুজিবুর রহমানের দাবি অনুযায়ী নতুন সংবিধান প্রণয়নের আগে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে তা একই সঙ্গে পাকিস্তানের উভয় অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে করতে হবে। ২২ মার্চ আওয়ামী লীগ এই পরামর্শ গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু সেনাবাহিনী তাদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এটাকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে একটি নতুন ফর্মুলা দাঁড় করায়। সেনানিবাসে সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করার পর ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে আগের ছক-কাটা সামরিক আক্রমণের পথ বেছে নেন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন যে রাজনীতিবিদদের কাছে তাঁর নতিস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে আশ্বাস দেন যে সেনাবাহিনী খুব সহজেই এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তিনি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হন। পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছিল, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবারও স্থগিত হতে যাচ্ছে। আলোচনায় কোনো অগ্রগতি না দেখে ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র-জনতা পাকিস্তানের পতাকা না উড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।

কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীকে ১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। ২২ মার্চ অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ও সৈনিকেরা বায়তুল মোকাররমে একটি

২২ মার্চ বায়তুল মোকাররমে অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ও সৈনিকদের সমাবেশ

বিরাট সমাবেশ করেন। সেখানে তাঁরা কর্নেল ওসমানীর কাছে দেশের সংঘাতময় পরিস্থিতিতে তাঁদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চান। কর্নেল ওসমানী তাঁদের বললেন, 'চিন্তা করো না। আমরা অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ট্যাংক প্রতিহত করব।' অর্থাৎ, ওসমানী সাহেব সৈনিকদের বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা পাকিস্তানি বাহিনীর সামরিক তৎপরতা থামিয়ে দেবেন। তাঁর এই কথা শুনে বাঙালি অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকেরা হতাশ হন। পাকিস্তানিরা যেখানে ব্যাপক সামরিক শক্তি গড়ে তুলছে, সেখানে এ ধরনের কথা তাঁদের আশ্বস্ত করতে পারেনি। এদিনের সমাবেশে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ইসফাকুল মজিদ বলেছিলেন, 'আমরা সৈনিক। কথার চাইতে কাজে বিশ্বাস করি।' জেনারেল মজিদ একমাত্র বাঙালি, যিনি ইংল্যান্ডের রয়্যাল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্ডস থেকে ১৯২৪ সালে কিংস কমিশন পেয়েছিলেন। এ সময় হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন ভারতীয় স্যান্ডহার্ডস থেকে কিংস কমিশন পেয়েছিলেন। তিনি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানেরও জ্যেষ্ঠ ছিলেন। এদিন অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সামরিক সদস্যদের পক্ষ থেকে আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে জেনারেল মজিদসহ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা শেখ মুজিবকে একটি তরবারি উপহার দেন। এ ঘটনার দুই দিন আগে, অর্থাৎ ২০ মার্চ নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের একজন বঙ্গবন্ধুকে বলেন, 'হে বঙ্গবন্ধু, বাংলার স্বাধীনতা কী করে আদায় করতে হয়, তা আমরা জানি। শুধু আপনি আমাদের পাশে থাকুন। আমাদের নেতৃত্ব দিন।' এই সংবাদগুলো সে সময়ের পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছিল। তবু রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।

২৩ মার্চ সন্ধ্যার একটু পর আওয়ামী লীগের দুজন এমপিএ আমার বাসায় বেড়াতে আসেন। তাঁদের একজন পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এ কে এম মাহবুবুল ইসলাম। তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন এবং এমএনএ নির্বাচিত হন। তাঁর গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জে। তাঁরা আমাকে জানান, 'এবার একটা সুরাহা হতে যাচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে আমরা এখন একটি সমাধান পেতে যাচ্ছি।' এ কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই এবং প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খাই। যেখানে আমরা প্রতিদিন পাকিস্তানিদের শক্তিবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করছি, যেখানে বাঙালিদের আড়ালে রেখে পাকিস্তানি ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে গোপনে সভা করছেন, আর আমাদের নেতারা সবকিছু দেখেশুনেও নিশ্চিন্ত মনে আমাদের শান্তির বাণী শোনাচ্ছেন।

মার্চের শুরুতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনো স্বায়ত্তশাসনের কথা, কখনো ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার কথা, কখনো-বা কনফেডারেশনের কথা বলতেন। মার্চের শুরুতে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাদের অনেক আলাপ হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আলাপ কী হয়েছিল, তা কিন্তু সঠিকভাবে কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি। আলোচনার পর রাজনৈতিক নেতৃত্বও সংবাদ সম্মেলনে বা জনসমক্ষে খোলাখুলি কিছু বলতেন না। বিশেষ করে, ১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে ইয়াহিয়া বা ভুট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কী আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, তা কখনো জানা যায়নি। সবকিছু খোলাসাভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় কখনো কখনো রাজনৈতিক নেতাদের মন্তব্য জাতিকে আরও বিভ্রান্তিতে ফেলছে। ২১ মার্চ দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, সেখানে উল্লেখ ছিল, 'সংগ্রামী বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল তাঁর দলের শীর্ষস্থানীয় অপর ৬ জন সহকর্মীকে নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ১৩০ মিনিট আলোচনা শেষে তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ সহাস্যবদনে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে তাঁর বাসভবনে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। শেখ সাহেব বলেন রাজনৈতিক সংকট সমাধানের পথে তাঁরা এগোচ্ছেন।'

২৫ মার্চের সকাল থেকে দেখতে পাই, সেনানিবাসের অভ্যন্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছে। ট্যাংক, কামান ইত্যাদি ভারী অস্ত্রগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে। একটা যুদ্ধপূর্ব থমথমে ভাব সেনানিবাসের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছিল, সামনে একটি অনিশ্চিত সময় আসছে। আমি

পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে দীর্ঘ সময় চাকরি করেছি। সৈনিক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ আমার ছিল। তবু ভেবে দেখলাম, আসন্ন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আমার কোনো সমস্যা হলে হোক, কিন্তু আমার স্ত্রী ও পুত্রদের নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। আমি ওদের আজিমপুরে স্ত্রীর বড় বোনের বাসায় পাঠিয়ে দিলাম।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় আমি এয়ারপোর্টের টারমাকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। প্রতিদিন আমি এই কাজটি করতাম। এখানে দাঁড়িয়ে একান্তে বোঝার চেষ্টা করতাম যে প্রশাসন ও রাজনীতিতে প্রকৃতপক্ষে কী হতে যাচ্ছে। ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। তখন থেকে সব কাজ শেষে প্রতিদিন বিকেলবেলায় তাঁর গাড়িবহর নিয়ে তিনি ক্যান্টনমেন্টে আসতেন এবং জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে চা-চক্রে মিলিত হতেন। ২৫ মার্চ বিকেলে প্রতিদিনের মতো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিরাট গাড়িবহর নিয়ে সেনানিবাসে এলেন। প্রেসিডেন্টের জন্য নির্দিষ্ট গাড়ির ভেতরে ইয়াহিয়া খান বসা, গাড়িতে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। তিনি চলে গেলেন চা-চক্র অনুষ্ঠানে। সন্ধ্যার পরপরই চা-চক্র শেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর বিরাট গাড়িবহর নিয়ে সেনানিবাসের ভেতর থেকে চলে গেলেন প্রেসিডেন্ট হাউসে। এর কিছু পরে আমি লক্ষ করলাম, সেনানিবাস থেকে দুটি গাড়ি আগে থেকে অপেক্ষারত একটি বোয়িং ৭০৭ বিমানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ি দুটিতে কোনো পতাকা বা স্টার নেই, যা প্রেসিডেন্ট বা জ্যেষ্ঠ অফিসারদের গাড়িতে থাকে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, বোয়িং ৭০৭ বিমানটি সেনাসদস্যরা কর্ডন করে আছেন। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, ওই দুটি গাড়ির একটি থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেরিয়ে এলেন এবং বোয়িং ৭০৭-এ আরোহণ করলেন। অথচ একটু আগেই আমার সামনে দিয়ে ইয়াহিয়া খানের গাড়িবহর সরকারি বাসভবনে চলে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট হাউসে ইয়াহিয়া খানের চলে যাওয়াটা ছিল সাজানো একটি নাটক। উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যেন বোঝে যে ইয়াহিয়া খান প্রতিদিনের মতো তাঁর বাসভবনে চলে গেছেন, যা ছিল একটা ধোঁকা। পরে জেনেছিলাম, চার তারকা আর পতাকাদণ্ডে জাতীয় পতাকা লাগানো গাড়িতে নকল প্রেসিডেন্ট হিসেবে বসে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রফিক।

ইয়াহিয়া খানের এভাবে গোপনে ঢাকা থেকে চলে যাওয়া দেখে আমার মনে হলো, ওরা চেষ্টা করছে যেন ঢাকার মানুষ বা ক্যান্টনমেন্টের বাঙালিরা প্রেসিডেন্টের চলে যাওয়ার খবরটি জানতে না পারে। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোতে বঙ্গবন্ধুর বাসা ও আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের

ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেওয়া থাকত। প্রেসিডেন্ট বিমানে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে আমি বঙ্গবন্ধুর বাসার একটা টেলিফোন নম্বরে রিং করে ইয়াহিয়া খানের এইমাত্র ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সংবাদটি দিলাম। টেলিফোনের ওপার থেকে কে ফোন রিসিভ করেছিল, তা আমি জানতে পারিনি। কিন্তু গলার স্বর ছিল খুব গম্ভীর ও ভারী। আমি ফোনে কারও নাম ধরেও চাইনি। আর আমার পরিচয়ও তাকে বলিনি। তারপর আমি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে চলে যাই। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে যতগুলো বাঙালি পরিবার ছিল, তাদের অনেকের বাসায় গিয়ে আমি জানাই, 'এইমাত্র ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন। মনে হয়, আজ রাতে সাংঘাতিক কিছু একটা হবে। তবে আমি জানি না বা আমার কোনো ধারণাও নেই যে কী ঘটতে যাচ্ছে। যদি পারো তোমরা নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে যাও।'

আমি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজার বাসায় গিয়ে লক্ষ করলাম, বেশ কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা করছেন। আমি তাঁকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের ঢাকা ত্যাগের সংবাদটি জানালাম। তাঁকে আরও জানালাম যে আমি খবরটা বঙ্গবন্ধুর বাসায় পৌঁছে দিয়েছি কিন্তু সঠিক জায়গায় পৌঁছেছে কি না, তা নিশ্চিত নই। তাঁকে অনুরোধ করলাম বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়ে সংবাদটি আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে। রেজার বাসা থেকে আমি আমার বাসায় চলে আসি। রেজা আমার অনুরোধমতো বাসা থেকে বেরিয়ে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বঙ্গবন্ধুর বাসায় পৌঁছান। পরবর্তী অংশটুকু আমি রেজার বই থেকে উল্লেখ করছি—

> গেলাম বত্রিশ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। যেখানে মিছিল আর মিটিং-এর ডামাডোল চলছিল এতদিন, এখন একেবারে নিশ্চুপ সমস্ত এলাকা। বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর গেটের ভিতরে আগে ঢুকিনি কোনোদিন। আজ একরকম নিরুপায় হয়ে ভিতরে গেলাম। দোতলা বাড়ির সব কামরাতেই বাতি জ্বলছে, কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ নেই। ইতিমধ্যে আমার পরিচিত জাতীয় সংসদের এক সদস্য বেরিয়ে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম অবস্থা কেমন। উত্তরে তিনি বললেন, অবস্থা খুব ভালো, চার দফার মীমাংসা হয়ে গেছে, বাকি দুই দফার সমাধান রাত্রে হয়ে যাবে, সকালে ঘোষণা শুনতে পারবো আমরা। তিনি সেই সঙ্গে গুজব ছড়ানো বন্ধ করার উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোনো সুযোগ হয়নি আমার। সুতরাং বাড়ীর ভেতরে যাবার সাহস হলো না। মাননীয় সদস্যের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম বঙ্গবন্ধুর বাড়ী থেকে।

তিনি ফিরে এসে কিছু পরে আমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কারণ, ততক্ষণে টেলিফোন-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এ কথা রেজা পরবর্তী সময়ে আমাকে জানিয়েছিলেন।

ওই দিন রাতে আমি একটু আগেই, অর্থাৎ রাত ১১টার আগেই শুয়ে পড়ি। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। হঠাৎ গড়গড় করে আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার সামরিক জ্ঞান থেকে বুঝতে পারলাম, এটা বৃহদাকার সাঁজোয়া যানের শব্দ। আমি বিছানা থেকে উঠে লাইট না জ্বালিয়ে জানালার পর্দা ফাঁক করে দেখলাম, রাস্তা দিয়ে ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়িসহ বিশাল এক সৈন্যবাহিনী শহরের দিকে এগোচ্ছে। আমার সামনে যত দূর দেখা যায়, তত দূর পর্যন্ত আগুনের লাল শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পূর্ব দিকের বসতবাড়িগুলো আগুনের আলোতে লাল হয়ে গিয়েছে। এসব দেখে আমার মনে হয়েছিল, দেশে সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। সারা রাত বিছানায় শুয়ে-বসে কাটালাম। ঘুম আসছিল না। ঘুম আসা সম্ভবও নয়। শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে শুনছিলাম বন্দুক আর কামানের শব্দ। কয়েক ঘণ্টা গোলাগুলির পর ঢাকা শহরের সম্পূর্ণ এলাকা বা অধিকাংশ এলাকা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বুঝতে বাকি রইল না যে এই রাতে ঢাকা শহরে বহু লোক হতাহত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার হওয়ার খবর আমি কয়েকদিন পর পত্রিকা থেকে জানতে পারি। বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক নেতার গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদটি পড়ে প্রথমত আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তাঁর গ্রেপ্তারের কথা জানতে পেরে আমার মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয় যে বঙ্গবন্ধু কেন এই রকমের ভুল করলেন, যা তিনি সহজেই এড়িয়ে যেতে পারতেন। পরবর্তী সময়ে এই কথাটি আমাকে খুব পীড়া দিত যে এই ভুল না হলে মুক্তিযুদ্ধে আমরা আরও ভালো করতে পারতাম। হয়তো অনেক মানুষকে জীবন দিতে হতো না বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতো না। তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন অথচ গ্রেপ্তারের আগে কোনো আদেশ, নির্দেশ বা উপদেশ দেননি এবং পরিষ্কারভাবে আমাদের ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে কিছু বলেননি। তাঁর আদেশ বা নির্দেশের অভাবে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। আমি মনে করি, নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য বঙ্গবন্ধুর যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং গোপনে থেকে তিনি যুদ্ধে দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন। যা-ই হোক, বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাতে কী করতে পারতেন, আর কী করতে পারতেন না, সেটা অনুমানসাপেক্ষ। সেই রাতে যেটা ভালো মনে করেছেন

তিনি, সেটাই করেছেন। আমরা পুরো বিষয়টি বিচার করি আমাদের অবস্থান ও চিন্তাভাবনা থেকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হয়তো পুরো বিষয়টি বিবেচনা করেছেন তাঁর সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে, যেখান থেকে তিনি সবকিছু দেখতে ও বুঝতে পারতেন। তবে আমার ধারণা, তিনি গ্রেপ্তার না হলে ক্ষয়ক্ষতি কম হতো। সময়ও কম লাগত এবং মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর নেতৃত্বের অভাবে পরবর্তী সময়ে জন্ম নেওয়া অনেক বিভেদ, অবিশ্বাস, সন্দেহও কুঁড়িতেই বিনষ্ট হয়ে যেত।

২৫ মার্চ রাতে আক্রান্ত হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধুসহ শত শত লোকের নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার সুযোগ ছিল। ২৫ মার্চ রাতে সুযোগটি গ্রহণ না করায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারকে নিয়ে বহু রকম আলোচনা ও সমালোচনা হয়। তবে প্রথমেই এই ঘটনাটিকে আমাদের সোজা ও সরল চোখে দেখতে হবে এবং বুঝতে হবে যে প্রকৃত ঘটনাটি কী ঘটেছিল? এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ছিল এবং প্রত্যেকেই বুঝতে পারছিল যে পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করবে। তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই আন্দোলন ও যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রসঙ্গটি চলে আসে। তিনি যদি গ্রেপ্তার হন, তাহলে আন্দোলন ও সংগ্রামের নেতৃত্ব কে দেবেন? বঙ্গবন্ধুর খুবই কাছের সহকর্মী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। স্বভাবতই কেউ কেউ মনে করতেন, তাঁদের ডেকে বঙ্গবন্ধুর বলা উচিত ছিল, 'আমাকে (বঙ্গবন্ধুকে) যদি গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে তোমাদের আন্দোলন এগিয়ে নেওয়া এবং দেশকে স্বাধীন করার দায়িত্ব নিতে হবে। অতএব, নিজ নিজ উদ্যোগে তোমরা গোপন স্থানে চলে যাও এবং পরে সুযোগ বুঝে তোমরা একত্র হয়ে আমার রেখে যাওয়া কাজগুলো শেষ করবে।' আমার জানামতে, সেরকম কোনো নির্দেশ কিংবা আদেশ কিংবা পরামর্শ তিনি কাউকে দেননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যে ঘরে থাকতেন তার পাশের ঘরেই আমি মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে থাকতাম। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'স্যার, বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আপনি কি তাঁর কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পেয়েছিলেন?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'না, আমি কোনো নির্দেশ পাইনি।' ওই রাতে বঙ্গবন্ধু সবাইকে আত্মগোপন করার কথা বলেন, অথচ তিনি কোথায় যাবেন, সে কথা কাউকে বলেননি। যদি তিনি গ্রেপ্তার হন, তাহলে দলের নেতৃত্ব কী হবে, তা-ও তিনি কাউকে বলেননি। এ ছাড়া মঈদুল হাসান, উইং কমান্ডার এস আর মীর্জা এবং আমার মধ্যকার আলোচনাভিত্তিক *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর: কথোপকথন* গ্রন্থটিতে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় তাজউদ্দীন আহমদ ও শেখ মুজিবের সাক্ষাতের বিষয়ে সাংবাদিক মঈদুল হাসান বলেন :

২৫-২৬ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমান যে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী হবেন, তিনি যে বাড়িতেই থাকবেন—এই সিদ্ধান্তটা তিনি দলের নেতৃস্থানীয় কারও সঙ্গে আলাপ করেননি। তেমনি বলে যাননি যে তিনি না থাকলে কে বা কারা নেতৃত্ব দেবেন এবং কোন লক্ষ্যে কাজ করবেন। নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কি কোনো আলাদা কমিটি করতে হবে? তাঁদের কৌশলটা কী হবে? এঁদের কি কোনো কর্মসূচি থাকবে? সেখানে দলের প্রবীণদের কী ভূমিকা হবে, তরুণদেরই বা কী ভূমিকা হবে—এসব কোনো প্রশ্নের উত্তরই কারও জানা ছিল না।

মঈদুল হাসানের কথাগুলো সামগ্রিকভাবে বাস্তব। তাঁর কথাকে সমর্থন করে বলছি, ২৫ মার্চ রাতে তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। তাজউদ্দীন সাহেব তাঁকে স্বাধীনতার একটি লিখিত বার্তা রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর কথায় সম্মত হননি। উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার বার্তা প্রচার হলে এবং পাকিস্তানিরা তা শুনলে তারা আমাকে দেশদ্রোহী বলবে।' বঙ্গবন্ধুর এই কথা শুনে তাজউদ্দীন সাহেব হতাশ হয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু দেশের জন্য বহু কিছু করেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো তিনিও কিছু ভুল করেছিলেন। তিনি এমন সময় এ ভুলগুলো করেছেন, যখন সমগ্র জাতি একটা সংকটকালীন অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এ সময় সারা দেশের মানুষ তাকিয়ে ছিল বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তাঁর দিকে, তাঁর নির্দেশ শুনতে। কিন্তু সেই ক্রান্তিকালীন সময়ে তিনি নির্দেশ দিতে পারেননি। মার্চের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে কমসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য উপস্থিত ছিল। বিপরীতে এখানে কয়েক ব্যাটালিয়ন বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ছিল, যাদের সংখ্যা ছিল পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া বিপুলসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিক অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি যদি বাঙালি সেনা, ইপিআর আর পুলিশকে কোনো নির্দেশ দিতেন, তাহলে আমাদের বিশ্বাস, সাধারণ জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থনে অল্প রক্তপাতেই আমরা যুদ্ধ জয় করতে পারতাম। এটাই হয়তো-বা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল।

২৫ মার্চ রাতে হাজার হাজার মানুষ বেঁচে যেত, যদি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা ঠিক সময়ে যুদ্ধ শুরু করতে পারতাম। বারবার মনে প্রশ্ন জাগে, বঙ্গবন্ধু কেন ওই রাতে কাউকে কিছু বলে গেলেন না? আবার ভাবি, উনি কাদের বলবেন? হয় তাজউদ্দীন সাহেব, না হয় নজরুল ইসলাম সাহেবকে। তিনি হয়তো বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদেরও বলে যেতে পারতেন। শেষ

মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তাঁর (মুজিব সাহেবের) নির্দেশনা জানতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তিনি কাউকে কিছু বলেননি বা আমরা কিছুই জানতে পারিনি। পরবর্তী সময়ে জানতে পেরেছি, চট্টগ্রামে অবস্থিত ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদারের নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের মধ্যে বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা একটি সামরিক পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিকল্পনাটি ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরীর (বীর বিক্রম, পরে মেজর জেনারেল) মারফত কর্নেল ওসমানীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠানো হয়েছিল। সেনা কর্মকর্তারা চেয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে চলে এসে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন এবং যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন। এ সময় চট্টগ্রামসহ সারা পূর্ব পাকিস্তানেই বাঙালি সেনাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, ফলে যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ২৫ মার্চ রাতেও শেষ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন শেখ মুজিবকে জয়দেবপুর নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে। তাঁর এ উদ্যোগও সফল হয়নি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁর সামরিক পরিকল্পনা রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন ও নেতৃত্বেই বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। যাহোক, বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তারের বিষয়টি আপাতত একটি রহস্য হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস, এ রহস্যকে বহু গবেষক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন। যদি কেউ একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার হওয়াকে বিশ্লেষণ করেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ হবে না। বিষয়টিকে দেখতে হবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, আঙ্গিক ও অবস্থান থেকে। এ নিয়ে গভীর গবেষণা হওয়া উচিত।

২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমান আটক হওয়ার পর দেশবাসী সম্পূর্ণভাবে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পড়ে। তারা বুঝতে পারছিল না কী করবে? তারা কি যুদ্ধে যাবে, নাকি ঘরের মধ্যে বসে থাকবে। তাদের কাছে তো কোনো নির্দেশ নেই, তাদের তো এই পরিস্থিতিতে কী করণীয়, তা কেউ বলে দেয়নি। আপৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের উচ্চস্তরের নেতৃত্ব কী ধরনের হওয়া উচিত ছিল, সে সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না। যুদ্ধের আগে বা যুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগও নেননি। ফলে নেতাদের ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং নিজেদের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন অবধি চলতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্ব ও কাঠামোকেও আংশিকভাবে প্রভাবিত করে। যদি আগে থেকেই সিদ্ধান্ত

থাকত যে বঙ্গবন্ধুর ওপর কোনো প্রকার আঘাত এলে নেতারা অমুক জায়গায় মিলিত হয়ে তাজউদ্দীন সাহেব বা কোনো জ্যেষ্ঠ নেতার নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন, তাহলে হয়তো নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এত প্রকট হতো না। যুদ্ধের আগেই তাঁদের বলা উচিত ছিল, আমাদের লক্ষ্য কী এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে। এটা হলে আমরা একটি সফল মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারতাম। এ ছাড়া এ সংগ্রামে সহযোগিতার জন্য ভারত বা অন্য কোনো সরকারের সঙ্গে কী আলোচনা করতে হবে এবং তাঁদের কাছ থেকে কী ধরনের সাহায্যের অনুরোধ করতে হবে, তা আগেই নির্ধারিত থাকা দরকার ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা এই রকম কোনো পরিকল্পনা মার্চ মাসে নিয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই।

রাজনৈতিকভাবে কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নভাবে সেনা কর্মকর্তারা কোথাও কোথাও কিছু প্রস্তুতি নিলেও তা উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং কারও সঙ্গে কারও সমন্বয় ছিল না। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের পরিকল্পনাটিও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমর্থন পায়নি। ফলে ২৫ মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশে যখন পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করল, তখন এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সেনাসদস্যরা নিজস্ব উদ্যোগে যে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বিনা প্রস্তুতিতে সীমিত অস্ত্রপাতি নিয়ে তাঁরা প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করেন। এর ফলে বাঙালি সৈনিকদের ভীষণ ক্ষতি ও জীবনহানি হয়েছিল। চট্টগ্রামে ইবিআরসি, যশোরে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল, পিলখানায় ইপিআর, রাজারবাগে পুলিশসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক বাঙালি সেনাকে জীবন দিতে হয়।

আক্রান্ত হওয়ার পর আমরা দ্রুত পাকিস্তানিদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারিনি। পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে আমরা তাদের যে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারতাম, সেটা করতে পারিনি। তাই পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ পাকিস্তানিদের আক্রমণের পর দীর্ঘদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিধ্বস্ত ও বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে একত্র হওয়ার জন্য এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রপ্রাপ্তির আশায়। এরপর আমরা যুদ্ধ শুরু করি। আমাদের যদি আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া হতো, তাহলে আমরা আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে পারতাম এবং অনেক গুছিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে পারতাম বা ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার করতে হতো। রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশনা পেলে মার্চের

প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ যা ছিল তা দিয়ে পাকিস্তানিরা আঘাত বা আক্রমণ করার আগে আমরাই তাদের আক্রমণ করতে পারতাম। উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সবুজ সংকেত পাওয়া গেলে স্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানুষও আমাদের সঙ্গে যোগ দিত এবং আমাদের লোকবল আরও অনেক গুণ বেড়ে যেত। এই আঘাতে তখনই আমাদের বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল, আর যদি সরাসরি বিজয় না-ও হতো, তবু প্রতি পদে তাদের অভিযান ব্যাহত হতো এবং অনতিবিলম্বে বিজয় আমাদেরই হতো। এর জন্য কোনো বিদেশি সৈন্য আনারও দরকার হতো না। দেশে এত ধ্বংসযজ্ঞ বা সম্পদহানি ও অর্থনীতির এত বড় ক্ষয়ক্ষতি হতো না।

প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা এবং সাধারণ সৈনিক ও সদস্যদের একত্রে পাওয়া যেত। এ ছাড়া অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে আগে থেকেই উন্মুখ ছিলেন। এসব অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক মার্চ মাসজুড়ে ঢাকায় অনেক সভা ও সমাবেশ করে তা জানিয়েও দিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সব অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিকের নাম-ঠিকানা, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের কাছে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকেই পৌঁছে দিয়েছিলেন। মার্চ মাসে আমিসহ বেশ কিছু বাঙালি সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ছিলাম। এ ছাড়া আরও কিছু বাঙালি কর্মকর্তা এ সময় ছুটিতে দেশে ছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতাদের উচিত ছিল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। যদি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে সামান্য যোগাযোগও করা হতো, তাহলে আমরা সঠিকভাবে প্রস্তুত থাকতাম। ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি না নেওয়ার কারণে ২৫ মার্চের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়, যা পূর্বপরিকল্পনা থাকলে সহজে এড়ানো যেত।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকাসহ সারা দেশে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের খবর সবার কাছে বিদ্যুৎ-গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। একটি অদ্ভুত ব্যাপার হলো, টেলিফোনে হোক কিংবা অন্য যেকোনো উপায়ে হোক, সারা দেশেই খবরটি মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন জায়গায় বাঙালি সেনা, পুলিশ, ইপিআর নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের যুদ্ধ নিজেরাই শুরু করে। এদের অনেকে প্রথমে বাঁচার জন্য অস্ত্র নিয়ে সরে পড়ে, তারপর যুদ্ধ শুরু করে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। দেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত পাবনা,

যশোর, কুষ্টিয়া, রংপুর, সৈয়দপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামসহ সারা দেশে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের পাল্টা আক্রমণ করে। পাবনায় পুলিশ ও সাধারণ মানুষ পাকিস্তানিদের আক্রমণ করে পরাজিত করে। কুষ্টিয়ায় সবচেয়ে ব্যাপক প্রতিরোধযুদ্ধ হয়, যেখানে ইপিআর ও জনতার কাছে পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়। ২৫ মার্চে পাকিস্তানিদের আক্রমণ এবং এর ফলে বাঙালিদের প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথমত, এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কোনো প্রকার রাজনৈতিক নির্দেশ ছাড়াই। যদি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে যুদ্ধ শুরু হতো, তাহলে এই যুদ্ধের ফলাফল ভিন্ন হতো। দ্বিতীয়ত, বাঙালিদের আক্রমণের প্রথম দিকটি ছিল নিজেদের রক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু যখন সারা দেশে পাকিস্তানিদের আক্রমণ ও নিজেদের রক্ষার প্রচেষ্টার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, তখন বাঙালি সশস্ত্র যোদ্ধারা পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হন। এভাবেই যুদ্ধের প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল। সত্য এই যে আমরা কোনো যুদ্ধের নির্দেশ পাইনি। নির্দেশটা কেন আসেনি, সে জন্য ঐতিহাসিক, গবেষক, লেখক প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন মতামত দেবেন। তবে আমি মনে করি, রাজনৈতিক নেতারা যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তাঁদের থেকে কোনো নির্দেশনাও আসেনি। তাঁরা বিভিন্ন বাহিনীর কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা ও সৈনিকদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেননি। এমনকি বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের পাঠানো সামরিক পরিকল্পনাগুলোকেও কোনো আমলে আনেননি। তাঁরা হয়তো রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন করে তাঁদের দাবি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন, যা কিনা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয় এবং জাতিকে এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়।

২৫ মার্চ রাতের পর থেকে বাঙালি ইউনিটগুলো যুদ্ধে যোগ দেয় এ কারণে যে পাকিস্তানি বাহিনী প্রথমেই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন ইউনিট, ইপিআর সদর দপ্তর ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ওপর একযোগে আক্রমণ করে। এ অবস্থায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর ও পুলিশ নিজ নিজ ওয়্যারলেস মারফত তাদের বিভিন্ন ইউনিট, কোম্পানি ও ডিটাচমেন্টকে এসওএস বার্তা পাঠায়—'আমরা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছি।' ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র সেনাবাহিনী, বিশেষত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসারের বাঙালি সদস্যরা একযোগে বিদ্রোহ করে এবং নিরাপদ জায়গায় সরে পড়ে। পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দেন যে এসব বাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের আহ্বানে বিদ্রোহ করে যুদ্ধে নেমেছিলেন। এ তথ্য মোটেও সত্য নয়। যুদ্ধ চলাকালে আমি যুদ্ধরত

বাহিনীগুলোর অনেক সদস্যকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আপনারা স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে কি কোনো নির্দেশনা পেয়েছিলেন?' উত্তরে প্রত্যেকে বলেছেন, 'না।' তবে যুদ্ধ শুরুর পর বেশির ভাগ বাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাঁদের যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। আবার কোথাও কোথাও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৈনিকদের সঙ্গে একত্র হয়ে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করেন।

২৬ মার্চ যুদ্ধ দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানিরা ট্যাংক, এয়ারক্রাফট, কামান ও নৌবাহিনীর গানবোট থেকে বিভিন্ন জায়গায় গোলাবর্ষণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি বাহিনী বলতে সে সময় ছিল প্রধানত বাঙালি অফিসারদের নেতৃত্বে পাঁচটি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, মুজাহিদ ও আনসার। পাকিস্তানি বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণের আগে সেনা কর্তৃপক্ষ খোঁড়া অজুহাতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদের একত্রে না রেখে ছোট ছোট দলে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় বাঙালি সেনারা পাকিস্তানিদের হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হলেও সংগঠিতভাবে বাঙালি সৈনিকেরা পাকিস্তানিদের আক্রমণকে খুব একটা প্রতিহত করতে পারেনি। ৩১ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশের বড় একটি অংশ তারা দখল করে নেয়। এ ছাড়া এপ্রিল মাসের মধ্যে বলতে গেলে পুরো দেশই তাদের দখলে চলে যায়।

পাকিস্তানি বাহিনী হত্যাযজ্ঞের সংবাদ যেন প্রচারিত না হয়, তার জন্য সব বিদেশি সাংবাদিককে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (পরে শেরাটন, বর্তমানে রূপসী বাংলা) আটক করে রাখে এবং ২৭ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য করে। অসহযোগ আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল, তাই পাকিস্তানি বাহিনী প্রথম চোটেই তা দখলে নেয় এবং বহু ছাত্র ও শিক্ষককে হত্যা করে। এরপর তারা আক্রমণ চালায় পিলখানা ইপিআর ক্যাম্পে ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। পুলিশ ও ইপিআররা প্রতিরোধ করলেও তা অল্প সময়েই ভেঙে পড়ে। অনেক জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ এবং বাঙালি সেনারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে। তবে আমি আগেই উল্লেখ করেছি, সমন্বয় ও নেতৃত্বের অভাবে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া আধুনিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কুষ্টিয়া এলাকায় ইপিআর ও সাধারণ মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই হয় এবং এতে পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

পাবনাতেও সাধারণ মানুষ আর পুলিশ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করে। ঢাকার উত্তরে জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কিছু বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ের পর আরও উত্তরে সরে যায়। চট্টগ্রামে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ও ইপিআরের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি করে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়। একইভাবে রাজশাহী, দিনাজপুর, কুমিল্লা, সৈয়দপুর, যশোরসহ বিভিন্ন জায়গায় বাঙালি সৈনিকেরা কিছু প্রতিরোধের পর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো শরণার্থীরা ভারতে যেতে শুরু করে। পাকিস্তানিদের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ভারতেও অনুভূত হতে শুরু করে। প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর সেখানে বাঙালির পক্ষে জনমত দানা বেঁধে ওঠে। তারা অবিলম্বে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হস্তক্ষেপের দাবি জানায়। ৩১ মার্চ ভারতীয় সংসদে পাকিস্তানি সামরিক সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৬ মার্চ সন্ধ্যায় জেনারেল ইয়াহিয়া পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে এই জঘন্য অপরাধের দায়ভার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর চাপিয়ে দেন। তিনি এই ভাষণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রশংসা এবং শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু তখন তাদের কাছে বন্দী ছিলেন। ফলে তাঁর (শেখ মুজিব) পক্ষে এর প্রতিবাদ করা তখন সম্ভব ছিল না। তবে বাংলাদেশের কোনো মানুষ জেনারেল ইয়াহিয়ার এই ভাষণ বিশ্বাস করেনি। সাধারণ মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, ইয়াহিয়া খান এক জঘন্য আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে ধোঁকা দিয়ে শেখ মুজিবের ওপর দোষ দিতে চাচ্ছে। জেনারেল ইয়াহিয়া বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছে। শেখ মুজিব একজন দেশদ্রোহী। তাই ২৫ মার্চ রাতে দেশরক্ষা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।' আমি যখন এই খবর পত্রিকায় পড়লাম, তখন এটিকে আমার কাছে তামাশা ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। এ ঘোষণার ভেতর তাদের কুমতলব ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাইনি। জেড এ ভুট্টো পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন করে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে ২৬ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি বলেন, 'থ্যাংকস গড! পাকিস্তান হ্যাজ বিন সেভড।'

২৬ মার্চ সারা দিন কারফিউ ছিল। ২৭ মার্চ সকালে অল্পক্ষণের জন্য কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়। ২৫ মার্চ সন্ধ্যার পর থেকে স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে

আমার দেখা হয়নি। তাই ২৭ মার্চ সকালে ওদের নিয়ে আসার জন্য নিজেই জিপ চালিয়ে আজিমপুরে যাই, পথে রাস্তার দুই পাশে ভয়ংকর ও বীভৎস দৃশ্য দেখি। চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। কালো পিচের রাস্তা রক্তে লাল হয়ে গেছে। ভাবলাম, এরপর তো এই হত্যাকারীদের সঙ্গে থাকার প্রশ্নই আসে না। আজিমপুর থেকে আসার পথে আমার স্ত্রীকে রাস্তার ডানে-বামে তাকাতে নিষেধ করি এবং ছেলেমেয়েরা যেন না তাকায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে বলি। কারণ, রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা বীভৎস সব লাশ দেখে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। গাড়িতে বসেই আমি স্ত্রীর উদ্দেশে বললাম, 'দেখো, এই দেশে আমরা আর থাকব না। তুমি কি রাজি আছ?' ও আমাকে পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করল এবং বলল, 'আমি প্রস্তুত।' আমি আরও বললাম, 'তেজগাঁওয়ের সরকারি আবাসিক ভবনে থাকা নিরাপদ নয়। আমাদের অন্য বাসায় ওঠা উচিত।' কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারি কোয়ার্টার ছেড়ে আমরা পুনরায় আজিমপুরে স্ত্রীর বোনের বাসায় ওঠার সিদ্ধান্ত নিলাম।

২৭ মার্চ সন্ধ্যায় ভাবলাম, এয়ারফোর্স অফিসার্স মেসে গিয়ে দেখি মেসের কী অবস্থা। মেসে গিয়ে দেখলাম, কয়েকজন পাকিস্তানি কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ করলাম, একটি সেনাভর্তি ট্রাক অফিসার মেসে প্রবেশ করল। সৈনিকদের অনেকের হাতে অগ্নিবর্ষক অস্ত্র (ফ্লেম থ্রোয়ার) দেখলাম। সৈনিকেরা গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অফিসার্স মেসের একটু পেছনেই ছিল নাখালপাড়া গ্রাম। নাখালপাড়া গ্রামটি ছিল গরিব, রিকশাওয়ালা ও খেটে খাওয়া মানুষের বাসস্থান। পাকিস্তানিদের ধারণা ছিল, এই গরিব মানুষগুলোই আসল শত্রু, কারণ এরাই সব আন্দোলনের পুরোভাগে থাকে। অগ্নিবর্ষক অস্ত্রগুলো দিয়ে ওরা এদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের শিখায় পুরো এলাকা লাল হয়ে গেল। ঢাকায় কারফিউ থাকার কারণে নাখালপাড়ার বাসিন্দারা বাসায় আবদ্ধ ছিল। সব ঘরবাড়িতে দারুণভাবে আগুন জ্বলে উঠল। তাদের তখন ঘর থেকে দৌড়ে বের হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। তাদের তো আগুন থেকে বাঁচতে হবে। যখন তারা ঘর থেকে দৌড়ে বের হওয়া শুরু করে, তখন এই অসহায় মানুষগুলোর ওপর পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করতে শুরু করল। আমার পাশে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর কয়েকজন অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের একজন আমারই সামনে বলে উঠলেন, 'দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ডিল উইথ দ্য বাস্টার্ডস।' এই কথাটা আমি জীবনে ভুলব

না। নিজ চোখের সামনে এই ঘটনা দেখে আমি স্থির করলাম, এদের সঙ্গে আমি আর এক মুহূর্তও থাকব না।

২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রূপ নেয়। এখান থেকে প্রথমে স্থানীয় নেতারা ও পরে মেজর জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। আমি মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা শুনি এবং চট্টগ্রামে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা জানতে পারি। এই ভেবে উৎফুল্ল হই যে আমরা আক্রান্ত হয়ে চুপ করে নেই, আমরা আক্রমণও শুরু করেছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পাকিস্তানি বাহিনী স্থলপথে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আক্রমণ করতে না পেরে ২৯/৩০ মার্চ বিমানের সাহায্যে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে বোমাবর্ষণ করে। ২৮ বা ২৯ মার্চের পর থেকে বিমানবাহিনীর যুদ্ধজাহাজগুলো বাঙালিদের পরিবর্তে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি বৈমানিকদের দ্বারা উড্ডয়ন করা হতো। আমিসহ সব বাঙালি কর্মকর্তা তখন পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে ছিলাম নামেমাত্র। আমাদের কোনো দায়িত্ব-কর্তব্যে নিযুক্ত করা হতো না। পাকিস্তান বিমানবাহিনী কোথাও আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলে আমরা ধারণা করতে পারতাম, কিন্তু কবে, কখন ও কোথায় তা কার্যকর হবে, তা নির্দিষ্টভাবে জানতে পারতাম না। তাই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র আক্রমণের কথা অনুমান করতে পারলেও সুনির্দিষ্টভাবে আক্রমণের কোনো খবর জানতে পারিনি।

এভাবেই শেষ হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন আর সূচনা হয় প্রতিরোধযুদ্ধের। অসহযোগ আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতারা মোটামুটি সফল হয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিরোধযুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় দূরদৃষ্টি দেখাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন, যার জন্য আমাদের অনেক উচ্চমূল্য দিতে হয়েছিল।

স্বাধীনতার ঘোষণা ও অস্থায়ী সরকার গঠন

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধ কি কোনো ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল? স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে এ ধরনের আলোচনা, দ্বিমত, বিভাজন বা তর্ক মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিল না। এমনকি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের আগে পর্যন্ত এ ধরনের কথাবার্তা শোনা যায়নি। এটা শুরু হয় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকে। মুক্তিযুদ্ধকালে আমরা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারিনি যে ভবিষ্যতে স্বাধীনতার ঘোষণা কোনো বিভ্রান্তি বা মতভেদের বিষয় হবে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে আলোচনা ও মতবিরোধ বা বিতর্ক শুরু হয়। এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে নানা কথা বলেন। সেগুলো সত্য নাকি অসত্য, তা জানার উপায় নেই। এগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে কেউ কোনো দলিল উত্থাপন করেননি। আমার মনে হয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো তাঁদের আবেগপ্রসূত।

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রকাশ্যে কাউকে কিছু বলেননি বলেই আমি জানি। অনেকে বলেন, বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাতে এক হাবিলদারের মারফত চিরকুট পাঠিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আবার বলা হয়, বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার জন্য সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কোথাও কোথাও এমনও উল্লেখিত হয়েছে যে বঙ্গবন্ধু ইপিআরের বেতারযন্ত্রে বা ডাক ও তার বিভাগের টেলিগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি প্রচার করেন। এগুলোর কোনো যুক্তিসংগত প্রমাণ আমি কোথাও পাইনি। আর যা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় তার বিশ্বাসযোগ্যতা খুঁজে পাইনি।

কোন যুক্তিতে বঙ্গবন্ধু চিরকুট পাঠাবেন, যেখানে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণায় তাঁর কোনো বাধাই ছিল না? বলতে গেলে মার্চ মাসের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই দেশ চলেছে। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসেও সারা দেশে দু-চারটা সরকারি ভবন ছাড়া কোথাও পাকিস্তানি পতাকা ওড়েনি, বরং সবাই স্বাধীন বাংলার পতাকা অথবা কালো পতাকা উড়িয়েছে। এ ধরনের অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু কেন গোপনে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে যাবেন? স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাইলে তিনি তো জনগণের পাশে থেকেই তা করতে পারতেন। তাঁর মতো সাহসী এবং ইতিহাসের অন্যতম জনপ্রিয় নেতার স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে রাতের অন্ধকারের প্রয়োজন হয় না। আমরা যত দিন যুদ্ধ করেছি, তত দিন পর্যন্ত এই চিরকুট পাঠানোর কথা শোনা যায়নি। বরং আমরা সবাই আলোচনা করতাম যে বঙ্গবন্ধু কেন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেলেন না, দিলে কী ক্ষতি হতো ইত্যাদি। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে আমি যতটুকু জানি, আমার স্মৃতিতে যতটুকু আছে এবং যুদ্ধের সময় যা ঘটেছে তা নিচে উল্লেখ করলাম।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন ঢাকা ছেড়ে চলে যান, তখন একটা চরম সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। সবাই ভাবতে থাকেন, এখন আমাদের কী করণীয়। এ সময় তাজউদ্দীন আহমদসহ আরও কিছু নেতা বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে সমবেত ছিলেন। সেখানে এক ফাঁকে তাজউদ্দীন আহমদ একটি টেপ-রেকর্ডার এবং স্বাধীনতা ঘোষণার একটা খসড়া বঙ্গবন্ধুকে দেন এবং তাঁকে তা পড়তে বলেন। কিন্তু তিনি তা পড়েননি। এ ঘটনা স্বয়ং তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিক ও লেখক মঈদুল হাসানকে বলেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি মে মাসে ভারতে যান। পরে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের স্পেশাল এইড হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকবার দিল্লি যান। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। মঈদুল হাসান যখন কলকাতায় থাকতেন তখন প্রতিদিন সকালে তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। তাঁর নির্দেশে অন্যান্য নানা বিষয়েও কাজ করতেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহের জন্য তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করেন। তাজউদ্দীন আহমদের কথাগুলো তখন তাঁর ডায়েরিতে তিনি লিখে

রেখেছিলেন। সেই সময় তাঁদের মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা ও ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কথোপকথন হয়েছিল তা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

কোনো মাধ্যমে বা চিরকুটে পাঠিয়ে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, ২৫ মার্চ রাতে তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতা-কর্মীরা প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অথচ তাঁরা কেউ কিছু আঁচ করতে পারবেন না বা জানতে পারবেন না, এটা তো হয় না। তবে কি তিনি তাঁদের বিশ্বাস করতে পারেননি? এটা তো আরও অবিশ্বাস্য। বঙ্গবন্ধু যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেনই, তবে তিনি ৩২ নম্বর সড়কের বাসায় থাকবেনই বা কেন। মুক্তিযুদ্ধকালে আমিও একদিন তাজউদ্দীন আহমদকে ২৫ মার্চের রাতের ঘটনা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাজউদ্দীন আহমদ স্বীকার করেছিলেন, সেই খসড়া ঘোষণাটি তাঁর নিজের লেখা ছিল এবং তিনি বঙ্গবন্ধুকে খসড়া ঘোষণাটি পাঠ করার প্রস্তাব করেছিলেন। লেখাটা ছিল সম্ভবত এই রকম: 'পাকিস্তানি সেনারা আমাদের আক্রমণ করেছে অতর্কিতভাবে। তারা সর্বত্র দমননীতি শুরু করেছে। এই অবস্থায় আমাদের দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম।' তাজউদ্দীন সাহেব আরও বলেন, এই খসড়া ঘোষণাটা শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়ার পর সেটা তিনি পড়ে কোনো কিছুই বললেন না, নিরুত্তর রইলেন। অনেকটা এড়িয়ে গেলেন।

পরবর্তী সময়ে মঈদুল হাসানের কাছ থেকে জানতে পারি, তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, 'মুজিব ভাই, এটা আপনাকে বলে যেতেই হবে। কেননা কালকে কী হবে, যদি আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়? তাহলে কেউ জানবে না যে আমাদের কী করতে হবে? এই ঘোষণা কোনো গোপন জায়গায় সংরক্ষিত থাকলে পরে আমরা ঘোষণাটি প্রচার করতে পারব। যদি বেতার মারফত কিছু করা যায়, তাহলে সেটাও করা হবে।' বঙ্গবন্ধু তখন প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'এটা আমার বিরুদ্ধে একটা দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানিরা আমাকে দেশদ্রোহের বিচার করতে পারবে।' এ কথায় তাজউদ্দীন আহমদ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সম্ভবত রাত নয়টার পরপরই ধানমন্ডির ৩২ নম্বর ছেড়ে চলে যান। পরবর্তীকালে মঈদুল হাসান এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুল মোমিনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনিও ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল মোমিন বলেন, তিনি যখন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঢুকছিলেন, তখন দেখেন

যে তাজউদ্দীন আহমদ খুব রাগান্বিত চেহারায় ফাইলপত্র বগলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আবদুল মোমিন তাজউদ্দীনের হাত ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি রেগে চলে যাও কেন?' তখন তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর কাছে আগের ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু একটু ঝুঁকিও নিতে রাজি নন। অথচ আমাদের ওপর একটা আঘাত বা আক্রমণ আসছেই।'

২৫ মার্চ রাতের ওই ঘটনার পর বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর বাড়িতে ফিরে যান। রাত ১০টার পর ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যান। বঙ্গবন্ধু তাঁদের তৎক্ষণাৎ সরে যেতে বলেন। বঙ্গবন্ধু নিজে কী করবেন, সেটা তাঁদের বলেননি। তাঁরা দুজন যখন ওখান থেকে তাজউদ্দীন আহমদের বাড়িতে গেলেন, তখন রাত বোধ হয় ১১টা। ওখানে কামাল হোসেন ও আমীর-উল ইসলাম আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাজউদ্দীনকে নিয়ে তাঁরা দুজন অন্য কোথাও চলে যাবেন।

১৯৭২ সালে তাজউদ্দীন আহমদ কথোপকথনের সময় মঈদুল হাসানকে বলেন, 'আমীর-উল ইসলাম ও কামাল হোসেন যখন এসে বলল যে বাড়ি থেকে এখনই সরে যাওয়া দরকার, তখন আমি ওদের বলিনি, তবে আমার মনে হয়েছিল, আমার কোথাও যাওয়া উচিত নয়।' তাজউদ্দীন আহমদ মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে সম্ভবত কথাগুলো বলেছিলেন। বিষয়টি তাজউদ্দীন আহমদ পরে ব্যাখ্যা করে বলেন, 'যেখানে আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা, যাঁকে এতবার করে বলেছি, আজকে সন্ধ্যাতেও বলেছি, তিনি কোথাও যেতে চাইলেন না এবং তাঁকে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য যে সংক্ষিপ্ত একটা বার্তা টেপ-রেকর্ডে ধারণ বা ওই কাগজে স্বাক্ষর করার জন্য বলায়, তিনি বললেন, এটাতে পাকিস্তানিরা তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করতে পারবে! উনি এতটুকুও যখন করতে রাজি নন, তখন এ আন্দোলনের কী-ই বা ভবিষ্যৎ?' তাজউদ্দীন আহমদ, আমীর-উল ইসলাম ও কামাল হোসেনের মধ্যে এরকম আলাপ শেষ না হতেই চারদিকের নানা শব্দ থেকে বোঝা গেল, পাকিস্তানি সৈন্যরা সেনানিবাস থেকে বের হয়ে আক্রমণ শুরু করেছে। এরকম একটি মুহূর্তে কামাল হোসেন ধানমন্ডি ১৪ নম্বর সড়কের দিকে এক অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। অন্যদিকে আমীর-উল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে তাজউদ্দীন যান লালমাটিয়ায়। এই কথাগুলো মঈদুল হাসান *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর: কথোপকথন* গ্রন্থেও বলেছেন।

অবাক করার বিষয় হলো, পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণার সেই ছোট্ট খসড়াটি, যা তাজউদ্দীন আহমদ তৈরি করেছিলেন, তার প্রায় হুবহু একটি

নকল বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের ঘোষণা হিসেবে প্রচার হতে দেখি। ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাতেও তাজউদ্দীনের সেই খসড়া ঘোষণার কথাগুলো ছাপা হয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে যখন পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের আক্রমণ করে, সেই রাতেই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাটি জনসমক্ষে কীভাবে এল? ২৬ মার্চ তারিখে তো সারা দেশেই সান্ধ্য আইন ছিল। আওয়ামী লীগের তরুণ কর্মী এবং ছাত্রলীগের নেতারা স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুকে মার্চ মাসে বেশ চাপ দিচ্ছিল। ধারণা করা যায়, সেই সময় তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর খসড়াটি তাঁদের দিয়েছিলেন এবং এঁদের মাধ্যমে যদি এটা স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে প্রচারিত হয়ে থাকে, তাহলে আমি বিস্মিত হব না।

পরবর্তী সময়ে ঘটনার প্রায় এক বছর পর আরেকটা কথা প্রচার করা হয় যে, ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার ঠিক আগে শেখ সাহেব ইপিআরের বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন। এই তথ্যটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রথমত, সামরিক বাহিনীতে থাকার ফলে আমি জানি যে সিগন্যাল সেন্টার বা বার্তাকেন্দ্র সব সময় অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক দ্বারা পরিচালনা করা হয়। সিগন্যালই কোনো বাহিনীর প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের মূল যোগাযোগমাধ্যম। সেখানে তো বিশ্বাসীদের বাদ দিয়ে সন্দেহের পাত্র বাঙালিদের হাতে সিগন্যাল-ব্যবস্থা থাকতে পারে না। বাস্তবেও পাকিস্তানি বাহিনী আগে থেকেই পিলখানায় ইপিআরের বেতারকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখেছিল। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধু যাঁর মারফত এই ঘোষণা ইপিআরের বার্তাকেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি স্বাধীনতার ৪৩ বছরেও জনসমক্ষে এলেন না কেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁর জীবদ্দশায় কখনো সেই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেননি কেন। একইভাবে চট্টগ্রামের ইপিআর বেতার কেন্দ্র থেকে কে, কীভাবে জহুর আহমেদকে বার্তাটি পাঠালেন, তা রহস্যাবৃত্তই থেকে গেছে। কাজেই ইপিআরের বার্তাকেন্দ্র ব্যবহার করে শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন—এটা সম্ভবত বাস্তব নয়।

দ্বিতীয়ত, জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এমন কোনো সংবাদ আমরা শুনিনি। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের নেতারা স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে ভারত সরকারকে বেশ চাপ দেওয়া শুরু করেন। ভারত সরকার বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও অন্য প্রধান নেতাদের জিজ্ঞেস করে, শেখ মুজিবুর

রহমান কি স্বাধীনতার প্রশ্নে কাউকে কিছু বলে গেছেন? তারা আরও জানতে চায় যে স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো প্রমাণ, কোনো দলিল, কোনো জীবিত সাক্ষ্য আমাদের কাছে আছে কি না? এ সময় জহুর আহমেদ চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু কাউকেই স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলে যাননি। জহুর আহমেদ চৌধুরী নিজে তাজউদ্দীনকে বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁকে কিছু বলে যাননি।

ইপিআরের বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠান—এ দাবিটির প্রচার শুরু হয় ১৯৭২ সালে। এর আগে এটি শোনা যায়নি। অথচ ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১২টায় টেলিযোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে শেখ মুজিব চাইলে শুধু একটি ফোন করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (এখন রূপসী বাংলা) ভিড় করা যেকোনো বিদেশি সাংবাদিককে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা জানাতে পারতেন। তাহলে মুহূর্তের মধ্যে সেটি সারা পৃথিবীতে প্রচার পেয়ে যেত।

বেশ পরে স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়ে আরেকটি তথ্য প্রকাশ পায়। এতে বলা হয় যে বঙ্গবন্ধু টেলিগ্রামের মাধ্যমে কাউকে কাউকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন। সেই ঘোষণার একটি কপি কিছুদিন আগে পত্রিকায় ছাপানো হয়। এই ঘোষণায় পাওয়া বিবৃতি আগের ঘোষণা থেকে পৃথক। ঘোষণা-সংবলিত টেলিগ্রামটি হাতে লেখা এবং প্রাপকের স্ত্রী দাবি করেছেন যে এটি বঙ্গবন্ধুর নিজের হাতে লেখা। মিথ্যা প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় সাধারণ বিবেচনা বা জ্ঞানও রহিত হয়ে যায়। টেলিগ্রাম যে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পাঠানো হয় এবং এখানে প্রেরকের হাতের লেখা প্রাপকের কাছে যায় না, তা তারা ভুলে যান।

যাহোক, বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত কথিত স্বাধীনতা ঘোষণার কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ বাজারে আছে। এই সংস্করণগুলো সরকারি গ্রন্থ ও আওয়ামী লীগের প্রচারিত গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন জায়গায় কেন এই ভিন্নতা, তার উত্তর কেউ দিতে পারে না। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত *স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র ৩য় খণ্ড*-তে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাগুলোর একটিকে সংযুক্ত করে। পরে, ২০০৪ সালে, এই ঘোষণাটির দালিলিক কোনো প্রমাণ না থাকার কথা বলে উল্লিখিত বই থেকে তা বাদ দেওয়া হয়।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর অভিযানের পর ইস্ট পাকিস্তান রেডিওর চট্টগ্রাম কেন্দ্রের বাঙালি কর্মকর্তারা বেতারের মাধ্যমে কিছু করার পদক্ষেপ

নেন। চট্টগ্রামে সান্ধ্য আইনের মধ্যেই তাঁরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে কিছু প্রচার করতে উদ্যোগী হন। সেখানকার বেতার কেন্দ্রের বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে বেতারে কিছু-না-কিছু বলা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাঁরা সবাই মিলে স্বাধীনতা ঘোষণার একটা খসড়া তৈরি করেন। ২৬ মার্চ বেলা দুইটায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে গিয়ে তাঁরা সেই খসড়াটি নিজেদের কণ্ঠে প্রচার করেন। পরবর্তী সময়ে সেই ঘোষণা চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নানও পাঠ করেন। তাঁর ভাষণটি সেদিন সাড়ে চারটা-পাঁচটার দিকে পুনঃপ্রচার করা হয়। তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে—এমন কথা বলা হয়েছিল। তবে প্রথম যে ঘোষণাটি পাঠ করা হয়েছিল, তার থেকে পরবর্তী সময়ে পাঠ করা ঘোষণাটি একটু আলাদা ছিল।

এ সময় বেতারের কর্মীরা দুটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। প্রথমত, যদি কোনো সামরিক ব্যক্তিকে দিয়ে এই কথাগুলো বলানো যায়, তাহলে এর প্রভাব আরও ব্যাপক হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন চালুকৃত বেতার কেন্দ্রটির নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সামরিক বাহিনীর লোক প্রয়োজন। তাঁরা জানতে পারলেন, সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিকেরা চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে বিদ্রোহ করে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ করছেন। তাঁরা খোঁজ নিয়ে আরও জানতে পারেন যে মেজর জিয়াউর রহমান নামের একজন ঊর্ধ্বতন বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যান্য কর্মকর্তা, সৈনিকসহ পটিয়ায় রয়েছেন। ২৭ মার্চ সকাল ১০টার দিকে এসব বেতারকর্মী পটিয়ায় যান। তাঁরা মেজর জিয়াকে বেতার কেন্দ্রের প্রতিরক্ষার জন্য কিছু বাঙালি সেনাসদস্য দিয়ে সাহায্য করার অনুরোধ জানান। মেজর জিয়া সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে সম্মতি দেন। এ সময় তাঁদের মধ্যে কেউ একজন মেজর জিয়াকে অনুরোধ করে বলেন, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার একটি ঘোষণা তিনি পড়তে রাজি আছেন কি না। মেজর জিয়া বেশ আগ্রহের সঙ্গে এই প্রস্তাবে রাজি হন। তিনি পটিয়া থেকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে এসে প্রথম যে ঘোষণা দিলেন, সেটা ভুলভাবেই দিলেন। কারণ, তিনি প্রথম ঘোষণায় নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে সম্বোধন করেছিলেন। পরে সংশোধন করে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সেটি টেপে ধারণ করা হয় এবং ২৭ মার্চ সন্ধ্যার কিছু আগে তা পুনঃপ্রচার করা হয়। আর এভাবেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ ঘটল।

রেডিওতে আমি মেজর জিয়ার ঘোষণা শুনেছি। আমি ওই সময় জিয়াকে চিনতাম না। তবে এই ঘোষণায় আমি স্বস্তিবোধ করলাম এবং আশ্বস্ত হলাম যে অন্তত মেজর পর্যায়ের একজন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা এই যুদ্ধে জড়িত হয়েছেন। আমি পরে শুনেছি, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি শিল্পপতি এম আর সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নানও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই ঘোষণা সারা বাংলাদেশের মানুষ শুনেছে। আমার ধারণা, আমার মতো অনেকে যাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, এই ঘোষণা শোনার পর তাঁরা আরও উৎসাহিত হন। এবং দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে যুদ্ধ আমরা আরম্ভ করেছি, তা সফল হবেই। এই ঘোষণা শুনে আমি নিজেও খুব উৎফুল্ল এবং আনন্দিত হয়েছিলাম। তবে এটাও সত্য, যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, স্বাধীনতার ঘোষণা বেতারকর্মীরা নিজ নিজ মতো করে আগেই দিয়েছিলেন।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজ উদ্যোগে মেজর জিয়ার কাছে গিয়েছেন এবং তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। মেজর জিয়া নিজস্ব উদ্যোগে তাঁদের কাছে আসেননি। এটা ঠিক, জিয়া তাঁদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তিনি নিজে স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্যোগ নেননি। ২৬ মার্চ দুপুরে এম এ হান্নান সাহেব স্বাধীনতার যে ঘোষণাটি পড়েছিলেন এবং ২৭ মার্চ সন্ধ্যার দিকে মেজর জিয়া যেটা পড়েন, তার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। ২৬ মার্চেরটা অনেকে হয়তো শুনতে পাননি। কারণ, সেদিন তো সবাই বিভিন্ন কারণে উদ্বিগ্ন-হতবিহ্বল ছিলেন। তবে হান্নান সাহেবের কথারও একটা মূল্য ছিল, যদিও তিনি বেসামরিক লোক ছিলেন এবং জাতীয়ভাবে পরিচিত ছিলেন না। অন্যদিকে যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর একজন বাঙালি মেজরের মুখে স্বাধীনতার ঘোষণা শোনা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার ছিল।

মেজর জিয়ার ঘোষণাটিকে কোনোভাবেই স্বাধীনতার ঘোষণা বলা চলে না। মেজর জিয়া রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন না বা স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার মতো উপযুক্ত ব্যক্তিও ছিলেন না। যে ঘোষণা চট্টগ্রাম বেতার থেকে তিনি দিয়েছিলেন, ঠিক একই ধরনের একাধিক ঘোষণা ২৬ ও ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাও দিয়েছিলেন, এমনকি বেতারকর্মীরাও একই ধরনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে মেজর

জিয়ার এই ঘোষণাটি প্রচারের ফলে সারা দেশের ভেতরে ও সীমান্তে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মনে সাংঘাতিক একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। সেই সংকটময় মুহূর্তে জিয়ার ভাষণটি বিভ্রান্ত ও নেতৃত্বহীন জাতিকে কিছুটা হলেও শক্তি ও সাহস জোগায়। যুদ্ধের সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে শুনেছি এবং যুদ্ধের পরবর্তী সময়ও শুনেছি, মেজর জিয়ার ঘোষণাটি তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে কতটা উদ্দীপ্ত করেছিল। মেজর জিয়ার ঘোষণায় মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে, হ্যাঁ, এইবার বাংলাদেশ সত্যিই একটা যুদ্ধে নেমেছে। হান্নান সাহেব বা অন্য ব্যক্তিদের ঘোষণা ও মেজর জিয়ার ঘোষণার মধ্যে তফাতটা শুধু এখানেই ছিল। মেজর জিয়া যে কাজটি করতে পেরেছিলেন, তা করা উচিত ছিল জাতীয় পর্যায়ের প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের এবং এর জন্য তাঁদের একটা পূর্বপরিকল্পনাও থাকা প্রয়োজন ছিল।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে আরেকটি চরম সত্য ও বাস্তব কথা হলো, ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর স্বাধীনতার ঘোষণা হলো কি না, তা শোনার জন্য সাধারণ মানুষ কিন্তু অপেক্ষা করেনি। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কোনো ঘোষণা বা কারও আবেদন বা কারও নিবেদনের জন্য বাংলাদেশের মানুষ অপেক্ষা করেনি। যে মুহূর্তে তারা আক্রমণের শিকার হয়েছে, সেই মুহূর্তে তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে, যেমন চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, জয়দেবপুর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নওগাঁ, রাজশাহী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহসহ প্রায় সর্বত্র পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাঙালি সামরিক বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যসহ সাধারণ মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুতরাং, কে স্বাধীনতার ঘোষণা দিল বা কখন দিল, সেটা খুব একটা মূল্য রাখে না। স্বাধীনতার ঘোষণা আর ঘোষকের বিষয়টি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে খুব বেশি প্রভাবিত না করলেও পরবর্তী সময়ে অনেক বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। আমি মনে করি, এই বিভ্রান্তির অবসান হওয়া উচিত। জিয়ার ২৭ মার্চের ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে যেসব বাঙালি ছিল, তাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, এ সম্পর্কে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবে এই ঘোষণাই কারও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার একমাত্র কারণ নয়। আমার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই কথাগুলো বলছি। আমি যুদ্ধে যাব, সে জন্য কারও ঘোষণার অপেক্ষা করিনি। আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিই যে আমি যুদ্ধে যাব।

২৫ মার্চের পর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাঁচটি বাঙালি পদাতিক ইউনিট এবং কয়েকটি ইপিআর উইং স্থানীয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করে। ইউনিট বা উইং বিদ্রোহ করার পর এসব বাঙালি সামরিক ব্যক্তির ফিরে যাওয়ার সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফিরে গেলে কোর্ট মার্শাল এবং মৃত্যু অবধারিত, এটি তাঁদের খুব ভালো করেই জানা ছিল। তবে ফিরে গেলে কোর্ট মার্শাল কিংবা মৃত্যু হবে, এই ভয় থেকেই যে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্যি নয়। আমি বলব, শতকরা ৯৫ ভাগ সৈন্যই দীর্ঘদিনের বৈষম্য আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিবেকের তাড়নায় যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী সামরিক কর্মকর্তা ও সেনাদের পক্ষে পাকিস্তানি বাহিনীতে ফিরে যাওয়ার সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাঁদের জীবনে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছিল একমাত্র লক্ষ্য। দেশকে পাকিস্তানের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলা ছাড়া বাঙালি সৈনিকদের আর কোনো বিকল্প ছিল না। এই কারণেই বিদ্রোহী সৈনিকেরা দ্রুততার সঙ্গে অস্থায়ী সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়তা করেছিল।

এপ্রিলের প্রথম দিকে প্রতিরোধযুদ্ধ আস্তে আস্তে ঢাকা বা বিভিন্ন মফস্বল শহর থেকে সীমান্তের দিকে পিছিয়ে যেতে থাকে। স্বল্প শক্তি আর প্রস্তুতিহীন বাঙালি সেনাদের এর চেয়ে বেশি কিছু করার সামর্থ্যও ছিল না। বিদ্রোহী বাঙালি সেনারা ক্রমেই বুঝতে পারেন যে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য তাঁদের মধ্যে সমন্বয় দরকার এবং স্থানীয় ও বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হওয়া প্রতিরোধযুদ্ধকে একটি একক নেতৃত্বের আওতায় আনা প্রয়োজন। সর্বোপরি যুদ্ধের বৈধতার জন্য রাজনৈতিক সরকার দরকার। এই বোধ এবং ধারণা থেকেই হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে ৪ এপ্রিল বিদ্রোহী সামরিক কর্মকর্তাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর এটি ছিল এ ধরনের প্রথম পদক্ষেপ। এ সভায় কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানীসহ বেশ কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন কয়েকজন বেসামরিক কর্মকর্তা ও ভারতীয় প্রতিনিধিও। সেখানে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একটি সরকার গঠন করতে হবে। এই সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এবং সেই সরকারের অধীনেই তাদের শুরু করা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হবে। বস্তুত, মুক্তিযুদ্ধ চালানো এবং স্বাধীন সরকার গঠনের জন্য বাঙালি সৈনিকদের পক্ষ থেকে তখনই একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবস্থান তৈরি হয়। এ সভায় বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তারা বাংলাদেশকে চারটি সামরিক অঞ্চলে

বিভক্ত করে একেকজন একেক অঞ্চলের দায়িত্ব নেন। ৪ এপ্রিল সেনা কর্মকর্তাদের সভায় সরকার গঠনের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তটি ছিল যুগান্তকারী। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মেজর খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম, পরে ব্রিগেডিয়ার) উল্লেখ করেছেন, 'এ ছাড়া তাকে [কর্নেল ওসমানীকে] আরও অনুরোধ করা হয়, আরও নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অতি শীঘ্র আমাদের বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হউক, যাতে আমরা বহির্জগতের স্বীকৃতি পাই এবং যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাই।' যখন জাতি নেতৃত্বহীন এবং নেতারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না, তখন সেনা কর্মকর্তাদের এ সুপারিশ অস্থায়ী সরকার গঠন ও যুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

২৬ মার্চের পর পাকিস্তান সরকার তার কূটনৈতিক তৎপরতা দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বারবার এটাই বোঝানোর চেষ্টা করে যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সুর মেলায়, ফ্রান্সও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্কসহ মুসলিম দেশগুলো খুব দ্রুত পাকিস্তানের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। সেন্ট্রাল ইস্টার্ন ট্রিটি অর্গানাইজেশনও (সেন্টো বা সিইএনটিও) এ ব্যাপারে কাউকে হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানায়। আরব রাষ্ট্রগুলো, বিশেষত সৌদি আরব, আরব আমিরাত পাকিস্তানের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। সেই তুলনায় মিসরের ভূমিকা ছিল কিছুটা নিরপেক্ষ। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানায়। ইয়াহিয়া খান জবাবে ভারতের সমালোচনা করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অন্যদিকে চীনও অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে তার সমর্থন ব্যক্ত করে এবং পাকিস্তানকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রাথমিক পর্যায়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে ছিল। পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা ও পাকিস্তানপ্রীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে এ ধরনের একটি বৈরী আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকার গঠন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

তাজউদ্দীন আহমদ ৩ বা ৪ এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগে

দিল্লিতে তিনি নিজেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি এই পরিচয় দিয়েছেন যাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সাক্ষাৎ দিতে সম্মত হন। এই সাক্ষাতের সময় ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'আমি আপনার কাছ থেকে কয়েকটি বিষয় জানতে চাই। আপনারা কি সত্যিকারভাবে স্বাধীনতা চান?' প্রত্যুত্তরে তাজউদ্দীন পরিষ্কারভাবে বলেন, 'আমরা স্বাধীনতা চাই।' তারপর ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'তাহলে আপনাদের অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন করতে হবে।' তাজউদ্দীন বললেন, 'আমরা করব।' আলোচনার পর ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনাদের স্বাধীনতার জন্য ভারতের পক্ষে যা সম্ভব, সবকিছু করা হবে।' যদিও তাজউদ্দীন আহমদ নিজেকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেন, কিন্তু তখনো বাংলাদেশের কোনো সরকার গঠিত হয়নি।

তাজউদ্দীন আহমদ খুব বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমি তাঁকে ভীষণ পছন্দ করতাম। তিনি ছিলেন একজন পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক নেতা। তিনি ভেবেছিলেন, রাজনৈতিক দিক দিয়ে যদি তিনি ভারতের সমর্থন পান, তাহলে এই যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া অনেক সহজ হবে। সে জন্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাজউদ্দীনসহ রাজনৈতিক নেতারা যখন জানতে পারলেন, বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তারা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছেন, তখন তাঁরা আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে অন্তত যুদ্ধের জন্য কিছুটা অগ্রসর হওয়া গেছে। সেনা কর্মকর্তাদের এই কাজটি খুবই প্রশংসাযোগ্য ছিল। বিদ্রোহী সেনারা চিন্তা করেন যে তাঁরা যদি রাজনৈতিক সরকারের অধীন একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে যুদ্ধ করে একসময়-না-একসময় তাঁরা দেশকে স্বাধীন করতে পারবেন।

পরবর্তীকালে মঈদুল হাসানের সঙ্গে আলোচনায় জেনেছিলাম, ২৪/২৫ মার্চ কথা প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদ শুনেছিলেন যে কোনো বিপদ দেখা দিলে দলের তরুণ নেতারা কলকাতার ভবানীপুরে বরিশালের প্রাক্তন এমপিএ চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ১ এপ্রিল কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার আগে তাজউদ্দীন আহমদ সেই ঠিকানায় তাঁদের খোঁজে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কারও সাক্ষাৎ পাননি। ৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় দিল্লি থেকে ফিরে এসে তিনি আবারও ভবানীপুরে যান। সেখানে তিনি যুবনেতা ও তাঁদের সমর্থকদের সাক্ষাৎ পান। এ এইচ এম কামারুজ্জামান, ব্যারিস্টার

আমীর-উল ইসলাম ছাড়া আওয়ামী লীগ এবং যুব ও ছাত্র সংগঠনের আরও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভবানীপুরের গাজা পার্কের কাছে রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডের একটি বড় বাড়িতে ছিল ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং বা 'র'-র অফিস ও অতিথি ভবন। কেবল যুবনেতারা নন, তাঁদের সমন্বয়কারী চিত্তরঞ্জন সুতারও সেখানে থাকতেন। জানা যায়, 'র'-র সঙ্গে চিত্তরঞ্জন সুতারই ছিলেন যোগসূত্র। তাজউদ্দীনের দিল্লি সফরের কথা ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। ওখানে গিয়েই তাজউদ্দীন তাঁদের তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দার মুখে পড়েন। তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়, যেমন কে তাঁকে দিল্লি যেতে বলেছে, কোন অধিকারে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন ইত্যাদি। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন তাজউদ্দীনের উদ্যোগকে সমর্থন করেন। যুবনেতাদের কটূক্তি ও নিন্দার মুখে উত্তেজিত না হয়ে তাজউদ্দীন তাঁদের জানান, দিল্লিতে সর্বোচ্চ মহলে আলাপ-আলোচনার ফলে একটা সমঝোতায় আসা গেছে। এর ভিত্তিতে স্বাধীনতার পক্ষে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হবে, তা ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীনের বেতার ভাষণের মাধ্যমে আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হবে। সেই যুবনেতারা চিত্তরঞ্জন সুতারের সহায়তায় ভারত সরকারের কাছে তাজউদ্দীন সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং তাঁর বেতার-বক্তৃতা বন্ধ করার দাবি পাঠান। কয়েকজন এমএনএ এবং এমপিএ এই দাবিনামায় স্বাক্ষর করেন। তাজউদ্দীন সাহেব এতে বিচলিত না হয়ে সীমানা অতিক্রম করে যেসব সংসদ সদস্য ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের খুঁজে বের করেন এবং তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় ভারত সরকার সহযোগিতা করে। দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, তা তাঁদের খুলে বলেন। তাজউদ্দীন সংসদ সদস্যদের সমর্থন লাভে সমর্থ হন। আগে উল্লেখিত সেনা কর্মকর্তাদের ৪ এপ্রিলের সভার সিদ্ধান্ত, সংসদ সদস্যদের সমর্থন ও ভারত সরকারের নৈতিক সহযোগিতা যুবনেতা ও চিত্তরঞ্জন সুতারের উদ্যোগকে দুর্বল করে দেয়।

লর্ড সিনহা রোডের ১০ নম্বর বাড়িটি পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা রাজনৈতিক নেতাদের থাকার জন্য বরাদ্দ করেছিল ভারত সরকার। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এ এইচ এম কামারুজ্জামান, এম মনসুর আলীসহ আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতা এ বাসায় এসে ওঠেন। ভারতীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা নেতাদের জন্য কলকাতায় এ

ধরনের আরও কিছু বাসা বরাদ্দ করেছিলেন। ১০ এপ্রিলের আগে (সম্ভবত ৮ এপ্রিল) ১০ নম্বর লর্ড সিনহা রোডে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা, এমএনএ এবং এমপিএ নতুন সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে সভায় বসেন। সভায় সরকার এবং মন্ত্রিসভার কাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি করে রাষ্ট্রপতিশাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবে। সরকারে চার সদস্যের মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্য থাকবেন এ এইচ এম কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও খন্দকার মোশতাক আহমদ। কর্নেল এম এ জি ওসমানী মন্ত্রীর পদমর্যাদায় মুক্তিবাহিনী বা বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান, অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পরে তাঁরা আগরতলায় আরেকটি সভা করেন। সেখানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, কর্নেল ওসমানী, চট্টগ্রামের এম আর সিদ্দিকীসহ কিছু নেতা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ সরকার গঠনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং কে কোন দপ্তরের দায়িত্বে থাকবেন তা চূড়ান্ত করা হয়।

কলকাতায় প্রথম সভায় তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রকাশ্যে শপথ নেবেন। প্রথমে এর জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল মুক্ত চুয়াডাঙ্গা। কিন্তু এই খবর পাকিস্তানিরা জেনে যায় এবং সেখানে বোমাবর্ষণ শুরু করে। পরে শপথ গ্রহণের স্থান খুব গোপনে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা (পরে মুজিবনগর) নির্ধারণ করা হয়। সেখানে ১৭ এপ্রিল ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা শপথ নেন। এর আগে ১১ এপ্রিল নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বেতার ভাষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

যাহোক, ১৬ এপ্রিলের মধ্যে সরকার গঠনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। রাত প্রায় ১২টার সময় জানা গেল, নতুন রাষ্ট্রের পতাকা তৈরি করা হয়নি। এত রাতে তো দর্জি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অবশেষে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ডেপুটি হাইকমিশনারের বাড়ির কাছে এক দর্জির দোকান আছে। মধ্যরাতে সেই দর্জির ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে বলা হলো, পতাকা তৈরি করে দিতে। লোকটি সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। পতাকা প্রস্তুত হওয়ার পর যখন দর্জিকে

তাঁর প্রাপ্য দেওয়ার কথা উঠল, তখন সেই দর্জি দুই হাত জোর করে বললেন, 'আমাকে মাফ করবেন, এই পতাকা বানানোর জন্য আমি কোনো অর্থ নিতে পারব না।' কয়েক দিন পর আবার তাঁর প্রাপ্য অর্থ দিতে গেলে তাঁকে আর পাওয়া গেল না। এর পরও চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি।

১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে নির্বাচিত এমএনএ প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করেন এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পাঠ করান। বিকেলের মধ্যে শপথ গ্রহণের সব আনুষ্ঠানিকতা নির্বিঘ্নে শেষ হয়। তাজউদ্দীন সাহেবের দূরদর্শিতা এবং দৃঢ়তার ফলে আমরা স্বাধীনতার দিকে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তাজউদ্দীন আহমদকে যে মূল্যায়ন করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি। ১০ এপ্রিল সরকার গঠনের পর থেকে দায়িত্বপ্রাপ্তরা সরকার ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় সক্রিয় হন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় এই মন্ত্রিসভার সাহায্যে অস্থায়ী সরকার পরিচালিত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বেসামরিক কর্মকর্তাদের একটা অংশ অস্থায়ী সরকার পরিচালনায় যথেষ্ট সহযোগিতা করে।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিব নগরে (বৈদ্যনাথতলা) সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়গুলো ছিল ছড়ানো-ছিটানো। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের অফিস ছিল কলকাতার ৮ থিয়েটার রোডে। থিয়েটার রোডে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি ছোট ঘর ছিল, সেই ঘরে বসেই তাজউদ্দীন সাহেব বাংলাদেশ সরকারের কাজকর্ম সম্পন্ন করতেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যেকোনো বিষয় নিয়ে যুক্তিসংগত আলোচনা করতে কোনো ধরনের বাধা ছিল না। এমনকি কাউকে তিনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করে কথাও বলতেন না। সবাই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্য তিনি ভারতীয়দের কাছে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। তাজউদ্দীন সাহেব নয় মাসের মধ্যে সম্ভবত কোনো একদিন ঘণ্টা দুয়েকের জন্য তাঁর পরিবারকে দেখতে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোনো সময় তিনি তাঁর পরিবারকে দেখতে গিয়েছিলেন বলে আমার মনে পড়ে না। তিনি কতটা সাধারণ জীবনযাপন করতেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কাজকর্ম মোটামুটিভাবে নিজেই করতেন।

অস্থায়ী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অন্য মন্ত্রীরা পরিবারসহ কলকাতায় ডা. সুন্দরী মোহন রোডের (সিআইটি রোড নামে বেশি পরিচিত) একটি অ্যাপার্টমেন্টের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে পরিবারসহ থাকতেন। তাজউদ্দীন আহমদের পরিবারও এই অ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্ল্যাটে ছিল। কিন্তু তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ওই ফ্ল্যাটে এক দিনও থাকেননি। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও অন্য মন্ত্রীরা তাঁদের দাপ্তরিক কার্যক্রম সাধারণত এসব বাসস্থানে থেকেই পরিচালনা করতেন। থিয়েটার রোডে প্রত্যেকের জন্য একটি করে কার্যালয় থাকলেও কদাচিৎ তাঁরা এই কার্যালয়ে আসতেন। প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখানে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীরা থিয়েটার রোডে নিয়মিতভাবে না আসার কারণে বাইরে থেকে মনে হতো, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের অন্য সদস্যদের মধ্যে খুব একটা আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ ও বৈঠক হয় না। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর কার্যালয় ও আবাসস্থলও ছিল থিয়েটার রোডে। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে যাঁদের ওসমানী সাহেবের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হতো, তাঁরা কর্নেল ওসমানীর কার্যালয়-সংলগ্ন ঘরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা করতেন। ওসমানী সাহেবের অফিসে লোকজন ছিল অত্যন্ত সীমিত। আমি ছিলাম ওসমানী সাহেবের একমাত্র জ্যেষ্ঠ ও

সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা। আমাদের সঙ্গে সেখানে সেনাবাহিনীর একজন ডাক্তার ও একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন। এ ছাড়া কখনো কখনো স্টাফ অফিসার হিসেবে দু-একজন সামরিক অফিসার সাময়িকভাবে আমাদের সঙ্গে থাকতেন। দুজন ভারতীয় কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে আমাদের কার্যালয়ে যোগাযোগ রাখতেন।

প্রথম দিকে থিয়েটার রোডের কয়েকটি বড় কামরায় জ্যেষ্ঠ বেসামরিক অফিসারদের কার্যালয় ছিল। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এইচ টি ইমাম, প্রতিরক্ষাসচিব এম এ সামাদ, সংস্থাপনসচিব নুরুল কাদের খান, অর্থসচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান, স্বরাষ্ট্রসচিব নুরুদ্দিন আহমদ অফিস করতেন। উল্লিখিত বেসরকারি কর্মকর্তারা ছাড়া আরও কয়েকজন বেসামরিক কর্মকর্তা থিয়েটার রোডে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আরও কিছু বাঙালি বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারি কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরা আলোচনার জন্য এসব সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতেন। অন্য বেসামরিক কর্মকর্তারা বেশির ভাগ সময় পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে, যেখানে অধিকসংখ্যক বাঙালি উদ্বাস্তু থাকত, তাদের দেখাশোনা ও তদারক করতেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম কলকাতার বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিস থেকে পরিচালিত হতো। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মোশতাক আহমদ। তাঁর

কলকাতার থিয়েটার রোডে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়

কার্যক্রম সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না। তিনি বেশি মাত্রায় বিদেশি কূটনীতিক ও গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি হাইকমিশন অফিস এবং নিজের বাসস্থানে দাপ্তরিক কাজকর্ম করতেন। একবার সরকারের কাজে তাঁর আমেরিকা যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সন্দেহজনক গতিবিধি ও আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর সফর বাতিল করে দেন। সরকারের পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন মাহবুবুল আলম চাষী।

একটি সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যত রকমের সুবিধা, অর্থ ও লোকবল থাকা প্রয়োজন, তা না থাকা সত্ত্বেও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম যথেষ্ট ফলপ্রসূ ছিল। তবে স্বীকার করতেই হবে, পূর্বপরিকল্পনা না থাকায় এবং বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় পরবর্তী সময়ে তাজউদ্দীনকে অস্থায়ী সরকার পরিচালনায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও কোন্দল স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশেও বেশ প্রকট ছিল। এসবই হয়েছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবে।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদান

পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী ছিল না। সংগত কারণে তারা সত্তর সালের নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ করেনি। তারা এই ফলাফল মেনে নিলে বাঙালিরা ক্ষমতায় আসবে এবং ছয় দফা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে। এটি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অপরিসীম ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। সুতরাং, বাঙালির দাবিকে তারা কোনোভাবেই কার্যকর করতে প্রস্তুত ছিল না। পাকিস্তানিদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই আমার মনে সন্দেহ হয় যে, পাকিস্তানিরা আমাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এই কারণে তারা গোপনে প্রতিদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসতে শুরু করে। আমার সন্দেহের বিষয়টি আমি আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়মিত অবহিত করতাম। তাঁদের বলতাম, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে, তারা একটি অশুভ ও খারাপ লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে। মার্চ মাসের প্রথম থেকেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে, রাজনৈতিক সমাধানের নামে আমরা কোনো মরীচিকার পেছনে ছুটছি কি না। চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে পাকিস্তানিদের কর্মকাণ্ড স্পষ্টতই প্রমাণ করছিল যে তারা আন্তরিক নয়। আমার এই সন্দেহ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও ঘনীভূত হচ্ছিল। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। মুক্তিযুদ্ধ হবে এবং এতে আমি অংশগ্রহণ করব, এমন ভাবনা আমি প্রথম থেকেই লালন করছিলাম। কিন্তু আগে উল্লেখিত ২৭ মার্চে নাখালপাড়ার মর্মান্তিক ঘটনা ও পাকিস্তানি জুনিয়র অফিসারের মন্তব্যের পর কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে থাকি।

আমি ঢাকায় সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা ছিলাম। আমার পদবির কারণে আমি সব সময় বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকদের কাছে পৌঁছাতে পারতাম না এবং তাদের সঙ্গে সবকিছু নিয়ে আলোচনাও করতে পারতাম না। এ বিষয়ে আমি উইং কমান্ডার এম কে বাশারসহ কয়েকজনকে বিশ্বাস করতাম এবং তাদের সাহায্য নিতাম। বাশার আমার ছাত্র ছিল, আমি তাকে ফ্লাইং শিখিয়েছি। সে আমাদের গোপন আলোচনার প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করত। সীমান্ত অতিক্রমের আগ পর্যন্ত আমি ঢাকায় ছিলাম। এই সময়ে আমি কোনো রাজনৈতিক নেতার খোঁজখবর পাইনি। সংগত কারণেই তাঁরা গা-ঢাকা দিয়েছিলেন কিংবা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সময় তাঁদের কোনো রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা দেখা যায়নি এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করাও সম্ভব ছিল না। এই এক মাস আমি অফিসেও যাইনি। ইতিমধ্যে জেনে গেছি, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় গণমাধ্যম থেকে জানতে পারছিলাম যে মুক্তিযুদ্ধে তারা সর্বাত্মক সাহায্যও করছে। আমাদের আলোচনায় বাশার ছাড়া ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজাও যোগ দিত। এসব গোপন আলোচনায় কীভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব এবং কীভাবে ভারতে যাব, তা প্রাধান্য পেত। বাশারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কী মত?' ও বলল, 'আমি প্রস্তুত, স্যার।' আমি বললাম, 'প্রস্তুত হলেই তো হবে না। আমাদের যাওয়ার নিরাপদ পথ ও সময় ঠিক করতে হবে।' আলোচনা শুরু হলো, কে কে যাব, কবে যাব, কোনো দিক দিয়ে যাব ইত্যাদি।

পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তান বিমানবাহিনী সম্পর্কে দু-একটি কথা উল্লেখ করছি। ১৯৭১ সালের আগে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র দুটি এয়ারবেস ছিল—একটি ঢাকায় এবং অপরটি চট্টগ্রামে। এ ছাড়া বিমান ওঠানামার জন্য আরও কয়েকটি বিমানবন্দর ছিল, যা মূলত বেসামরিক বিমান চলাচলে ব্যবহৃত হতো। ঢাকায় তখন এক স্কোয়াড্রন জঙ্গি বিমান ছিল। আর ছিল কয়েকটা পরিবহন বিমান। সেনাবাহিনীর একটা অ্যাভিয়েশন স্কোয়াড্রন ছিল, যা তারা নিজেরা পরিচালনা করত। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিমানবাহিনীর প্রায় ১ হাজার ২০০ সদস্য ছিল, যার অর্ধেকের কিছু বেশি ছিল বাঙালি।

সম্ভবত ১৯৬৯ কিংবা ১৯৭০ সালের মাঝামাঝিতে বেসামরিক বৈমানিকেরা 'ইস্ট পাকিস্তান এয়ারলাইনস পাইলট ফোরাম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকার এই উদ্যোগে

কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিল না। বাঙালি বৈমানিকেরা আদালতের আশ্রয় নেন। আদালত তাঁদের পক্ষে রায় দেন। আমার ধারণা যে বেসামরিক বৈমানিকেরা ভবিষ্যতে পরিস্থিতি যে খুব বেশি ভালো থাকবে না বা বাঙালির অনুকূলে থাকবে না, তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে যেকোনো সময় যেকোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা দরকার, যাতে সরকারের সব কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও সরকারের কাছে বৈমানিকদের দাবিগুলো উপস্থাপন করা যায়। দেশে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে পাইলটদের যেন বহিষ্কার করতে না পারে, তা-ও লক্ষ রাখা এ সংগঠনের একটি উদ্দেশ্য হতে পারে। বেসামরিক বৈমানিকদের আলোচনাগুলো হতো ইস্ট পাকিস্তান এয়ারলাইনস পাইলট ফোরামের অফিসে। অফিসটি ছিল ঢাকার তেজকুনি পাড়া আওলাদ হোসেন মার্কেটের কাছে। কখনো-বা আলোচনা হতো তাঁদের কারও বাড়িতে। আমি বাঙালি বেসামরিক বৈমানিকদের কথা এ জন্য বর্ণনা করলাম যে পরবর্তী সময়ে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয় এবং বিমানবাহিনী গঠনে আমাকে সাহায্য করে।

অপর পক্ষে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালি সামরিক অফিসারদের মধ্যে আমি, উইং কমান্ডার বাশার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজা গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আলোচনার জন্য বেছে নিতাম বিভিন্ন চায়নিজ রেস্তোরাঁ বা পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠান। আমাদের গোপন আলোচনার বিষয়গুলো আমরা অন্য সমমনা বাঙালি বৈমানিকদেরও অবহিত করতাম। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ (বীর উত্তম, পরে এয়ারভাইস মার্শাল ও বিমানবাহিনীর প্রধান), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম সদর উদ্দিন (বীর প্রতীক, পরে এয়ারভাইস মার্শাল ও বিমানবাহিনীর প্রধান), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নুরুল কাদের (পরে স্কোয়াড্রন লিডার)। এ সময় জানতে পারলাম, কিছু কিছু জায়গায় বাঙালিরা সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে কিংবা কিছু স্থানে সীমান্ত অতিক্রম করে একত্র হওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে তারা যুদ্ধ করতে পারে।

২৮ মার্চ আমি দুই সপ্তাহ ছুটির জন্য আবেদন করি এবং যুদ্ধের এ পরিস্থিতিতেও কর্তৃপক্ষ আমার এত লম্বা ছুটি মঞ্জুর করে। কারণ, পাকিস্তানিরা চাইছিল যে অফিসে ওরা কী করছে এবং ওদের কী পরিকল্পনা, এসব গোপনীয় বিষয় যাতে আমরা জানতে না পারি। আমার জ্যেষ্ঠতার কারণে, আমি অফিসে থাকলে স্বভাবত ওদের সব খবর আমি জানব। সে

জন্য যখন আমি নিজে থেকে ছুটির আবেদন করলাম, তখন তারা খুব খুশিমনে ছুটি মঞ্জুর করে দেয়। ছুটির ১৫ দিন আমি আমার কার্যালয় কিংবা ক্যান্টনমেন্টে যাইনি। আমি তাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে চাইনি। এতে ওরা আমাকে সন্দেহ করতে পারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করে দিতে পারে। আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলে আমার আর ফিরে আসা হবে না এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এ সময় তারা বিবৃতি দিত, 'আমরা দেশের বন্ধু, দেশের পরিবেশ শান্ত আছে।' রেডিও, টেলিভিশনে সারাক্ষণ এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণা চালাত। কখনো একটি দোকানকে জোর করে খুলিয়ে টিভিতে প্রচার করত, 'এই তো সব দোকান খোলা। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।' সরকারের এসব কর্মকাণ্ড আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম। বুঝতে পারতাম, দেশের মানুষ এদের শাসন সমর্থন করছে না। আমরা যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি, তার সংগত কারণ আছে। প্রায় সময়েই আমরা যুদ্ধে যাওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করতাম।

২৮ বা ২৯ মার্চ আমরা দেশত্যাগের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আমার পুরো পরিবার, আমার স্ত্রীর বড় বোন ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মারগুবের পরিবারসহ আমরা সবাই সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার জন্য ডেমরা থেকে শীতলক্ষ্যা নদী ধরে নৌকায় রওনা হই। পথে রাত হয়ে গেলে আমরা মারগুবের এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নিই, জায়গাটার নাম এখন আর মনে নেই। পরদিন সকালবেলা যাত্রা করে বিকেলের দিকে আমরা ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের ট্যাঙ্গাবর নামের একটি জায়গার কাছাকাছি এলে চরে ধাক্কা লেগে আমাদের নৌকার পাটাতন ছিদ্র হয়ে যায় এবং নৌকায় পানি উঠতে থাকে। আমরা ট্যাঙ্গাবরে থেমে যাই। এ সময় স্থানীয় অনেক লোক সাহায্যের জন্য আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। আমি লোকগুলোর চালচলন দেখে ভরসা পেলাম না। এদের ওপর বিশ্বাস হলো না আমার। এতগুলো পরিবার নিয়ে এদের আশ্রয়ে রাতে কি নিরাপদে থাকতে পারব? আমার মন সায় দিচ্ছিল না। তাই এখানে আমাদের নৌকা মেরামত করে পুনরায় ঢাকার উদ্দেশে রওনা হই। নৌকার পাটাতন ছিদ্র হওয়ার পরই মারগুবের বোন, ভাই, বাবা ট্যাঙ্গাবর থেকে সীমান্ত অতিক্রমের উদ্দেশ্যে চলে যায়। পরে জানতে পারি, তারা সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেনি। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মারগুবকে পরে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করে দেওয়া হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে দেশে ফেরত আসে। ১৯৭২ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারগুব নিহত হয়।

ট্যাঙ্গাবর থেকে ঢাকায় ফেরার পথে বেশ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে আমরা টোক নামের একটি জায়গায় নদীর কিনারে এসে নৌকা নোঙর করি। অন্য বড় বড় নৌকার মাঝখানে আমাদের ছোট্ট নৌকাটি রাখি, যাতে ঝড়ে ডুবে না যায়। এখান থেকে নৌকার মাঝির সঙ্গে কর্দমাক্ত পথে আমরা এক অজানা পথে হাঁটতে শুরু করি। রাত ১১টা নাগাদ আমরা কাঞ্চন নামক এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বাসায় পৌঁছাই। মাঝি চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার, এই লোকটি ভালো। তাঁকে আমি জানি। আপনারা রাতটা এখানে থাকতে পারেন।'

আমরা ওই রাতে চেয়ারম্যানের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। লোকটি খুবই চমৎকার ছিলেন। তিনি আমাদের একটি ছোট্ট ঘরের অর্ধেক ছেড়ে দিলেন। আমরা সবাই খিচুড়ি খেয়ে ওই ছোট্ট ঘরটিতে ঘুমিয়ে পড়ি। এই বাড়িতে আমার পরিবার ছাড়াও ঢাকা থেকে আসা আরও অনেকে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা সম্ভবত আগে এসেছিল। পরদিনও আমরা ওই বাড়িতে ছিলাম। আমি চারদিকের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলাম। সেখান থেকে সীমান্ত অতিক্রমের কোনো বন্দোবস্ত করা যায় কি না, কিংবা কোন পথে আমাদের যাওয়াটা নিরাপদ হবে, তা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। লক্ষ করলাম, কেউ কোনো দিকে যাচ্ছে না। তাই তৃতীয় দিন ঠিক করলাম, আমরা ঢাকায় ফিরে যাব এবং ঢাকায় এসে ভালো করে জেনে-বুঝে পুনরায় সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করব। এদিন সকালে আমরা ঢাকার উদ্দেশে রওনা হই। ফেরার পথে নৌকায় নদী পার হওয়ার সময় খুব সাবধানে থাকি। কারণ, পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা ছিল। নদী পার হয়ে ঘাটে এসে দেখি, একটি বাস দাঁড়ানো অবস্থায় আছে। আমরা ওই বাসে করে আজিমপুরে আমার স্ত্রীর বোনের বাসায় গিয়ে উঠলাম।

প্রথমবার পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আমি ১৮ বা ১৯ এপ্রিলে অফিসে এসে যোগদান করি। গিয়ে দেখি, আমার স্থলে অন্য একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন বদলি হয়ে এসেছে পাকিস্তান থেকে। জানতে পারলাম, তখনো আমার কোথাও বদলি হয়নি, কিংবা তারা আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ-ও বলেনি যে আমার জায়গায় আরেকজন অফিসার এসেছে। ২৬ মার্চের পর এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন বাঙালিকে বহাল রাখা সম্ভবপর ছিল না, তা আমি নিজেও বুঝতাম। অফিসে এসে পুনরায় যোগদান করেছি সত্য, কিন্তু অফিসে তেমন যেতাম না। কদাচিৎ গেলেও বসতাম অন্য রুমে। আমার রুমে বসত পাকিস্তান থেকে আসা নতুন গ্রুপ ক্যাপ্টেন। অফিসে

কোনো কাজ করতাম না। যখন ওদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন হতো, তখন দেখতাম ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে। এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব অস্বস্তিবোধ করতাম।

আমি আজিমপুরে থাকা অবস্থায় ওরা আমাকে ফোন করলে আমি আমার সত্যিকার ঠিকানা দিতাম না, বলতাম, আমি ধানমন্ডিতে থাকি। আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলে ওরা যেন আমাকে সহজে খুঁজে না পায়। চাকরিতে যোগদান করার দিন দশেকের মধ্যে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল এ রহিম খান ঢাকায় আসেন। তিনি আসার পর আমি আবার ছুটির দরখাস্ত করি। আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়, আমি ক'দিনের ছুটি চাই? আমি বললাম যে আমার কমপক্ষে তিন মাসের ছুটি লাগবে। তারা আমার ছুটি অনুমোদন করল। ছুটিতে আমি আজিমপুরে আমার স্ত্রীর বোনের বাসাতেই বেশির ভাগ সময় থাকতাম। মাঝেমধ্যে এক-আধ দিনের জন্য অন্য বাসায় থাকতাম। ওখান থেকে অন্যান্য বাঙালি অফিসার, যেমন উইং কমান্ডার বাশার, স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। এদের সঙ্গে সব সময় আমার সরাসরি কথা হতো না, অনেক ক্ষেত্রে আমি রেজার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। আমারা আবারও সীমান্ত পেরোনোর উদ্যোগ নিলাম এবং ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তারা বাঙালিদের অসন্তোষ বা মুক্তিযুদ্ধকে কোনো গুরুত্ব দিত না। মার্চ-এপ্রিল মাসের সাময়িক সাফল্যে তারা মনে করেছিল, বাঙালিরা আর কখনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না, মুক্তিযুদ্ধ তো অনেক দূরের কথা। এপ্রিল মাসে একদিন আমি মাঠে দাঁড়িয়ে আছি, সেই সময় এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্সের চিফ আমাকে দেখে—যেহেতু আমি বাঙালি—একটু খোঁচা মেরে বলল, 'আমি চট্টগ্রাম থেকে আসলাম, আগামী ২৫ বছর বাঙালি আর স্লোগান দেওয়ার সাহস পাবে না!'

আমরা আবার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করি এপ্রিল মাসের শেষের দিকে। এবার আরিচা ফেরি পার হয়ে উত্তর বাংলা দিয়ে সীমান্ত পেরোনোর ইচ্ছা। সকাল ১০টার দিকে পরিবারসহ ঢাকা থেকে আরিচার পথে রওনা হই। আমাদের পরিকল্পনা ছিল পদ্মা নদী পার হয়ে রাজশাহী দিয়ে সীমান্ত পার হব। আরিচা যাওয়ার পথে অনেক পথচারী আমাদের সাবধান করে দেয়। তারা বলে, 'আপনারা আরিচা যাবেন না। আরিচায় অনেক পাকিস্তানি সেনা টহল দিচ্ছে।'

আরিচা পৌঁছাতে বিকেল হয়ে যায়। আরিচা যাওয়ার পথে কোনো ব্রিজ ছিল না, বেশ কয়েকটি ফেরি পার হতে হতো। আরিচা পৌঁছে দেখি সেখানে প্রচুর পাকিস্তানি সেনা টহল দিচ্ছে। আরিচা ঘাট পেরোনো প্রায় অসম্ভব। এবারও সীমান্ত অতিক্রম করার উদ্যোগ সফল হলো না। আবার ঢাকায় ফিরে আসতে হলো।

ফিরে এলাম বটে, তবে আমাদের মধ্যে নতুন করে আবারও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সলাপরামর্শ শুরু হয়। আমাদের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হলো, আমরা সবাই একসঙ্গে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেব না, বরং আলাদা আলাদাভাবে সীমান্ত অতিক্রম করব। ধরা পড়লে যাতে পাকিস্তানিরা আমাদের সবাইকে একসঙ্গে না পায়, অন্তত একটি অংশ যেন সীমান্ত অতিক্রম করে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে। আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কোন পথ নিরাপদ হবে বা কোন পথ দিয়ে আমরা সীমান্ত অতিক্রম করব, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। সীমান্ত পেরোনোর নিরাপদ পথ খুঁজে বের করা আর সরেজমিনে তা পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নুরুল কাদেরকে পাঠালাম। ও ফিরে আসার পর আমরা সবাই তার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে যাত্রা করব।

নুরুল কাদের প্রথমে আগরতলায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। এরপর সে আমাদের নেওয়ার জন্য ঢাকা রওনা দেয়। পথে সে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আটক হয়। সৌভাগ্যবশত সে পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানিদের হাত থেকে ছাড়া পায়। নুরুল কাদের ঢাকায় এসে আমাদের জানায়, 'পথ পরিষ্কার আছে। আমরা যেতে পারব।' আমি বেশিসংখ্যক জঙ্গি বৈমানিক সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করি। পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধে বিমানবাহিনী গড়ে উঠলে এরা বৈমানিক হিসেবে কাজ করতে পারবে। ফলে আমার পরিকল্পনার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত হয়েছিল, তারা সবাই বৈমানিক ছিল এবং প্রত্যেকেরই যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ছিল।

দেশ ত্যাগের জন্য তৃতীয় ও শেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করি ১২ মে। আমরা সকালে দুটো গ্রুপে রওনা হই। সিদ্ধান্ত ছিল, ঢাকা থেকে প্রথমে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপারে ঘোড়াশালে পাটের মিলে উঠব। সেখানে গিয়ে ঠিক করব কোথায় যাব। পাটের মিল বেছে নেওয়ার কারণ, জুট করপোরেশনে চাকরির সুবাদে এখানকার মিলগুলোতে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজার কর্তৃত্ব ছিল। রেজা এখানে আমাদের এক বা দুই দিন আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিতে পারবে। কিন্তু এই পথ দিয়ে আমরা যেতে পারিনি। কারণ, নরসিংদী বাজারের কাছে

পৌঁছে শুনি, পাকিস্তানি সেনারা বাজারটি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমাদের পথপ্রদর্শক সুরাত আলী বলল, 'এই পথ দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। অন্য পথ দিয়ে যেতে হবে।'

সুরাত আলী আগে সৈনিক ছিল এবং যুদ্ধের আগে সে রেজার অধীনে জুট মিলে চাকরি করত। আমরা কুমিল্লা হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য রওনা হই। রাতে কোনো এক গ্রামে আশ্রয় নিই। সকালে খাওয়াদাওয়া সেরে সীমান্তের উদ্দেশে যাত্রা করি। একটা খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় পার্শ্ববর্তী সড়কে পাকিস্তানি সেনাদের গাড়ির একটি বিশাল বহর দেখতে পাই। দেখেই সবাই ধানখেতের আলের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ি। আমার পরিবার, রেজার পরিবার, বাশারের পরিবার, বদরুল আলম, সুরাত আলীসহ আমরা সম্ভবত সতেরো জনের একটি দল ছিলাম। আমি সবাইকে দৌড়াদৌড়ি না করে স্থির ও স্বাভাবিক থাকতে বলি। পাকিস্তানি সেনাদলটি গাড়ির বহর থামিয়ে আমাদের কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে। তারপর চলে যায়। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। পুনরায় সীমান্তের পথে অগ্রসর হই।

১৪ মে সন্ধ্যায় আমরা কালীর বাজার নামের একটি জায়গায় এসে পৌঁছাই। শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। কোথায় যাব, রাতে কোথায় থাকব, এ নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত। এ সময় ওই এলাকার একজন ডাক্তার এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলেন, 'স্যার, এই লোককে জিজ্ঞেস করেন। তিনি আপনাদের জন্য কিছু করতে পারেন।' তিনি একজন কৃষক। তিনি বললেন, 'স্যার, আপনারা আমার সঙ্গে আসেন।' লোকটি আমার ছেলেকে কোলে নিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। পথ ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। এদিকে বিরামহীন বৃষ্টি পড়ছে। আমরা সবাই বৃষ্টিতে ভিজে গেছি। সারা দিন হাঁটার পর আমরা এমনিতেই খুব ক্লান্ত। কৃষকের বাড়ি পৌঁছাতে আরও দেড়-দুই মাইল হাঁটতে হলো।

কৃষকের ঘরের মেঝে খড় দিয়ে ঢাকা। সেখানে আমাদের বিশ্রামের জায়গা করে দেওয়া হলো। আমরা খুব ক্লান্ত আর দুর্বল ছিলাম। লোকটির পরিবারের সদস্যরা কোথায় থাকবে, তা জানার মতো অবস্থা আমাদের ছিল না। দরজাটা বন্ধ করে আমরা সবাই ওই মেঝেতে শুয়ে পড়ি এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি।

রাত দুইটার দিকে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। আমরা ঘুম থেকে উঠে বসলাম। সবাই আতঙ্কিত। ভাবছি পাকিস্তানি বাহিনী এসে গেছে। ঠিক করলাম, কিছুতেই দরজা খোলা যাবে না। একজন তো বলে ফেলল, 'আমরা গুলি চালাব।' আমি বললাম, 'আস্তে, ধৈর্য ধরো। সেনাবাহিনী এসে থাকলে

কিছু করার নেই। দু-একটা গুলি চালিয়ে কিছু করা যাবে না। দরজা আমাদের খুলতেই হবে। বরং দরজা খুলে দেখি কে এসেছে।'

দরজা খুলে দেখা গেল সেই কৃষক। তিনি বললেন, 'স্যার, আপনাদের জন্য অল্প খাবার তৈরি করেছি, আপনারা যদি খেয়ে নিতেন।' আমাদের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠল, 'এখন খাব না। এখন আমরা ঘুমাব।' আমি বললাম, 'খেতে হবে। এই রাতে এত কষ্ট করে লোকটা আমাদের জন্য রান্না করে নিয়ে এসেছে। তা না খেয়ে আমরা ঘুমাতে পারি না। আমাদের খেতে হবে।' আমরা খাওয়াদাওয়া শেষ করে আবার শুয়ে পড়লাম।

গরিব মানুষ, ছোট্ট একটি ঘর; সম্পদ বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই নেই। লোকটি এই রকমই নিঃস্ব ও দরিদ্র ছিলেন। তাঁর হয়তো একটি বা দুটি মুরগি ছিল। তার মধ্যে একটি জবাই করে গভীর রাতে রান্না করে আমাদের আপ্যায়ন করেছিলেন। যুদ্ধের সময় কলকাতায় এই লোকটির সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানি সেনারা ওঁদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেবার আমি তাঁকে কিছু অর্থ দিয়েছিলাম। যুদ্ধের পর আমি তাঁর খবর নেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করেছি। এমনকি ওই গ্রামেও লোক পাঠিয়েছি, কিন্তু তাঁর কোনো সন্ধান পাইনি। দেশের জন্য এ ধরনের সবকিছু উজাড় করে দেওয়া মানুষগুলোর কোনো খবর কি আমরা রাখি? তাঁরা কি স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে পারছে? মাঝেমধ্যে নিজেকে এ ধরনের প্রশ্ন করি, কিন্তু কোনো জবাব পাই না। দেশের জন্য সব ত্যাগ করা এই লোকগুলো প্রতিদানের আশায় কখনো কারও কাছে যাননি। তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশকে ভালোবেসেছেন আর তাঁদের সামান্য যা ছিল, তা দেশের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। আমি এ ধরনের দেশপ্রেমিককে জানাই সালাম।

যাহোক, ১৫ মে সকাল ১০টায় আমরা সবাই নিরাপদে আগরতলার কাছাকাছি মতিনগর বিএসএফ ক্যাম্পে পৌঁছালাম। প্রাথমিকভাবে সেখানে আমরা কেউ আমাদের সত্যিকার পরিচয় দিইনি বা আমরা যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর লোক, তা বলিনি। সেখানে আমরা ছদ্মনাম ব্যবহার করি এবং নিজেদের ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিই। আমি নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম কাপড়ের ব্যবসায়ী হিসেবে। অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যোগাযোগ হয়ে যায় এবং আমাদের পরিচয় প্রকাশ পায়। ওখানে মেজর খালেদ মোশাররফসহ কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। আমরা সেখানে রাজনীতিক তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ বাহিনী বা মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ আবদুর রবের (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) দেখা পাই।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব আগরতলায় সর্বজ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে প্রথম দিকে তিনি আমাদের সবার সঙ্গে দেখা করতে অনীহা প্রকাশ করেন। একপর্যায়ে উইং কমান্ডার বাশারের চাপে তিনি আমাদের সাক্ষাৎ দিতে রাজি হন। যত দূর মনে পড়ে, ২ নম্বর সেক্টরের ক্যাপ্টেন মেহবুবুর রহমানও (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) সেখানে উপস্থিত ছিল। এরপর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা আমাদের নাম কী, আমরা কী করি, আমাদের সঙ্গে কোনো অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না ইত্যাদি কিছু মামুলি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। আমরা সবাই সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। এরপর আমরা আগরতলায় গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেদের নাম লেখাই। আমাদের সবার থাকার ব্যবস্থা করা হয় আগরতলা ডাকবাংলোয়।

এদিন, অর্থাৎ ১৫ মে রাতে হঠাৎ জানতে পারি, এক লোক আমাকে খুঁজছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, পরের দিন আমাকে ভারতীয় জেনারেল কালকাৎ সিংয়ের সঙ্গে কলকাতায় যেতে হবে। ১৬ মে খুব ভোরে আমি আগরতলা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হই। সেখানে কালকাৎ সিং ও ২ নম্বর সেক্টরের মেজর শাফায়াত জামিলের (বীর বিক্রম, পরে কর্নেল) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কিছু সময় পর একটি ডিসি থ্রি বিমানে আমরা তিনজন কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করি। সন্ধ্যা হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছাই। আমি আর শাফায়াত জামিল একটি ছোট্ট হোটেলে যাই। হোটেলে আমাদের একটি ছোট কক্ষ দেওয়া হয়। সেই কক্ষে মাত্র একটি খাট। শাফায়াত জামিল আমার চেয়ে বয়সে ছোট এবং পদবিতেও কনিষ্ঠ ছিল। সে আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। তাই সে বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বলল, 'স্যার, আপনি খাটে থাকেন, আমি নিচে থাকি।' বিকল্প না থাকায় এভাবেই ওই রাতে সে নিচে থাকে।

পরদিন ১৭ মে আমরা বালিগঞ্জে যাই। সেখানে বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী মনসুর আলী, কামারুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক এবং কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করি। বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয় থিয়েটার রোডে স্থানান্তর হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁদের কর্মকাণ্ড এখান থেকে পরিচালিত হয়েছিল। সেদিন তাজউদ্দীন

সাহেব আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করেন। আমি তাঁকে বলি, 'স্যার, আমরা বিমানবাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা একসঙ্গে ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছি। আমরা সবাই দক্ষ বৈমানিক; অনেকের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। আমাদের অনেক এয়ারম্যানও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, যারা প্লেন রক্ষণাবেক্ষণে অভিজ্ঞ। আমাদের সবার উদ্দেশ্য হলো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। যদিও আমরা বৈমানিক, তবে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে কাজ দেওয়া হবে, আমরা সে কাজই করব। বর্তমান সময়ে যেকোনো যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে শেষ পর্যন্ত বিমানযুদ্ধ আবশ্যক হয়ে পড়ে। বিমানবাহিনী ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ করাটা কঠিন। তাই আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধেও একদিন না একদিন বিমান ও বৈমানিকদের প্রয়োজন হবেই। সেই সময় যদি আমাদের নিজস্ব কিছু বিমান থাকে এবং একটি এয়ারফিল্ড পাওয়া যায়, তাহলে আমরা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারব।' সাক্ষাতের সময় আমি এভাবেই তাঁকে কিছু জঙ্গি বিমান সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা বলি। তাজউদ্দীন সাহেব আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন এবং বললেন, 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

একটু আগেই উল্লেখ করেছি, ভারতে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে ১৭ মে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। কর্নেল ওসমানীকেও ঢাকার পরিস্থিতি, স্বতন্ত্র বিমানবাহিনী ও বিমানযুদ্ধ সম্পর্কে আমার পরিকল্পনার কথা বলেছিলাম। আমি ওসমানী সাহেবকে বলি, 'এই অবস্থায় যদি কিছু বিমান পাই, তাহলে আমরা পাকিস্তানিদের সাংঘাতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে পারব।' উনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করলেও তখনই বিমান পাওয়া এবং এই উদ্যোগ কার্যকর করা যে সম্ভব নয়, তা উল্লেখ করেন। আমি নিজেও জানতাম যে এত তাড়াতাড়ি বিমান পাওয়া সম্ভব নয়, তবে বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের অবহিত করাটা আমার খুব জরুরি মনে হয়েছিল।

কলকাতায় অবস্থানকালে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরে যে দৃশ্য দেখলাম, তা আমাকে একটু অবাকই করল। এটা তো সত্যি যে, আমরা একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি এবং সেই যুদ্ধ জয়ের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। অথচ অস্থায়ী সরকারের মধ্যে আমি সেসবের সাংঘাতিক অভাব লক্ষ করলাম। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, অথচ যুদ্ধের কোনো পরিকল্পনা নেই। আরও দেখলাম, একই বিষয় নিয়ে সবাই যে যার মতো আলোচনা করছেন। বাঙালির জীবন-মরণ সমস্যা তাঁদের কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। কর্নেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাকে

পরিষ্কারভাবে তেমন কিছু বলেননি। কতজন বাঙালি সৈনিক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, কতজন মুক্তিযোদ্ধা নতুনভাবে যোগ দিয়েছে, কতজন প্রশিক্ষণ নিচ্ছে প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তিনি আমাকে একটি কথাও বলেননি। আমার মনে হলো, তখন পর্যন্ত আমাদের ওপর তাঁর সন্দেহ দূর হয়নি। তিনি হয়তো ধারণা করছিলেন যে আমরা পাকিস্তানের চর হয়ে এসেছি। যদিও আমার সঙ্গে কর্নেল ওসমানীর বহুদিনের পরিচয়। তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন-জানতেন। তবু আমাকে তিনি কিছু বলেননি। আবার এ-ও হতে পারে যে, তিনি নিজেও পুরো বিষয়টি ভালোভাবে জানতেন না। ফলে সে সময় আমি যুদ্ধের সম্পূর্ণ চিত্রটা পাইনি। এরই মধ্যে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা কর্নেল খারা আমাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

কলকাতায় দুই দিন থাকার পর কর্নেল ওসমানী বলেন, ভারতীয় বিভিন্ন বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে আলোচনা করতে আমাকে দিল্লি যেতে হবে। আমি কলকাতায় আসার পর সম্ভবত আমার উপস্থিতি সম্পর্কে দিল্লিতে খবর পাঠানো হয়। গ্রুপ ক্যাপ্টেন বাদামি আমাকে দিল্লি নিয়ে যেতে কলকাতায় আসেন। ২০ কিংবা ২১ মে বাদামির সঙ্গে আমাকে দিল্লি পাঠানো হয়। গ্রুপ ক্যাপ্টেন বাদামি ভারতের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি তখন আমাকে কিছু বলেননি, আর আমিও আগ বাড়িয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইনি। তাঁর পদবিটা আমি পরে জানতে পারি। দিল্লিতে গিয়ে বাদামি সাহেব একটা বিরাট বাংলোয় আমার থাকার ব্যবস্থা করেন। সেখানে আমি একটা কামরায় একাই থাকতাম।

দিল্লিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কর্মকর্তারা আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন। তাঁরা পাকিস্তান বিমানবাহিনী সম্পর্কে জানতে চান। আমার অগোচরে আগরতলা থেকে উইং কমান্ডার বাশার, স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নুরুল কাদেরকেও দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়। তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে প্রশ্ন করা হয়। সম্ভবত তাঁরা আমার বিবৃতির সঙ্গে তাদের বিবৃতি মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। আমাদের আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি পরীক্ষা এবং গোয়েন্দা-বিষয়ক সংবাদ গ্রহণের জন্য ভারতীয়রা এই কাজটি করে থাকতে পারে। তারা যখন দেখল, আমার বিবৃতির সঙ্গে তাদের বিবৃতির কোনো পার্থক্য নেই, তখন তারা আমাদের ওপর আস্থা আনতে পারল। আমি পাকিস্তান বিমানবাহিনী থেকে ভারতে এসেছি এবং তাদের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কাজ করব, তাই আমাদের যাচাই-বাছাই করে

নেওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। মূলত এ জন্যই আমাদের সবাইকে দিল্লি যেতে হয়েছিল।

দিল্লিতে আমাদের নিয়ে যাওয়ার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য যাচাই করা ছাড়াও এর সঙ্গে আরেকটি কারণ ছিল। সেটা হলো, পাকিস্তান সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব বিভিন্ন তথ্য জেনে নেওয়া। দিল্লিতে থাকা অবস্থায় ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তারা আমাদের কাছে পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা সম্পর্কে জানতে চান। যেমন পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর অফিসগুলো কোথায়, বিমানগুলো কোথায় রাখা হয় ইত্যাদি। আমরা যারা সামরিক বাহিনীর লোক ভারতে গিয়েছিলাম, তারা ভারতীয় বাহিনীকে পাকিস্তানিদের সম্পর্কে যতটা সামরিক তথ্য দিয়েছি, ভারত তা পঞ্চাশ বছরেও জানতে পারত না। এ ছাড়া আমরা পাকিস্তানি বাহিনীর সত্যিকার চিত্র, অর্থাৎ তাদের দক্ষতা, ভারত সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা ও যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে ভারতীয়দের তথ্য দিয়েছিলাম। যুদ্ধের সময় গোয়েন্দা তথ্য খুব বেশি দরকার হয়। এমনকি তারা পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞেস করত, 'আমরা যদি পাকিস্তানি বাহিনীকে আক্রমণ করি, তবে তার প্রতিক্রিয়া কীরূপ হবে।' একটি অফিসে ২০-৩০ বছর চাকরি করলে অফিসের কর্মকর্তাদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটা জানা যায়। শত্রু বাহিনীকে কাবু করার জন্য এ ধরনের তথ্য ভীষণ জরুরি। আমার মনে হয়, আমাদের প্রদত্ত তথ্য ভারতীয় বাহিনীকে যুদ্ধকৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। আলোচনার সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর দুর্বল দিক এবং কীভাবে সহজে দ্রুত বাংলাদেশকে স্বাধীন করা যায়, তা ভারতীয়রা আমাদের লিখিত আকারে উপস্থাপন করতে বলে। আমরা তা-ই করলাম।

দিল্লিতে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণা বা চিন্তাভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। আলোচনার সময় বলি যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য এসেছি, তাই যুদ্ধের জন্য আমরা যেকোনো কাজ করতে প্রস্তুত। আমরা যদি যুদ্ধ করি, তাহলে কোন পরিকল্পনায় যুদ্ধ করব, তারও একটি খসড়া ভারতীয়রা আমাদের কাছে চেয়েছিল, যা আমরা দিয়েছিলাম। দিল্লিতে আমি ভারতীয় বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে মুক্তিবাহিনী, মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত বিষয় এবং বিমানবাহিনী গঠন সম্পর্কে আলোচনা করি। আমরা তুলনামূলকভাবে বেশিসংখ্যক জঙ্গি বিমানের বৈমানিক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম, তাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু জঙ্গি বিমান প্রদানের কথা বলেছিলাম।

দিল্লিতে আমার সঙ্গে উচ্চপদস্থ যেসব সামরিক কর্মকর্তার কথা হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডিরেক্টর অব এয়ার ইন্টেলিজেন্স, ডিরেক্টর অব এয়ার অপারেশন্স, ডিরেক্টর অব নেভাল ইন্টেলিজেন্স, ডিরেক্টর অব আর্মি ইন্টেলিজেন্স প্রমুখ। অশোক রায় নামে একজন ভারতীয়ের সঙ্গে সেখানে আলাপ হয়। তিনি সম্ভবত ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারি, তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ে দেখাশোনা করছেন। অশোক রায়ের সঙ্গে বিদেশি সাহায্য কতটা পাওয়া যেতে পারে এবং ভারতীয়রা কতটা সাহায্য করতে পারে, সে বিষয়ে আমার আলোচনা হয়।

গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় ভারত সরকারের মনোভাব জানা সম্ভব ছিল না। তবু দিল্লিতে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে এবং সেখানকার সার্বিক পরিবেশ দেখে আমার মনে হয়েছিল, ভারতীয়রা আমাদের পক্ষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কি না, কিংবা আমাদের কতটুকু সহায়তা করবে ইত্যাদি বিষয়ে তখনো তারা কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তার পরও আমার ধারণা হয়েছিল, ভারত সরকার এমন একটা পদক্ষেপ নেবে, যাতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। আর পাকিস্তান যাতে ভবিষ্যতে ভারতের জন্য শক্ত প্রতিপক্ষ বা বড় ধরনের হুমকি হতে না পারে, তা-ও এই সুযোগে সে নিশ্চিত করবে। প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যমান রাজনৈতিক বিষয়টি তাদের জন্য একটা সুযোগ, পাশাপাশি আরেকটা সুযোগ হলো বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নে সহায়তা করা। দুটো সুযোগই একটা জায়গায় এসে মিলেছে। এই সুযোগ হাতছাড়া করার প্রশ্নই আসে না। আমার ধারণা হয়েছিল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করা এবং বাংলাদেশ যাতে স্বাধীন হয়, সে সম্পর্কে একটা অলিখিত কিংবা বেসরকারি সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল।

দিল্লি সফরে আমি বুঝতে পারি, ভারত সরকার আমাদের যুদ্ধে সাহায্য করবে কি না, সেটা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। এটা কোনো সামরিক সিদ্ধান্তের বিষয় ছিল না। সুতরাং, আমি এ বিষয়ে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাদের কোনো পীড়াপীড়ি করিনি। বুঝতে পারছিলাম, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো ক্ষমতা তাঁদের নেই। তবে একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম, যা আমি একটু আগেও বলেছি, ভারত সরকার যুদ্ধের বিষয়ে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত না নিলেও পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য দুর্বল করার যে সুযোগটা তাদের সামনে এসেছে, তা তারা হাতছাড়া করবে না। একই

সঙ্গে বাংলাদেশকে সাহায্য করার মাধ্যমে তারা একটি মানবিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

দিল্লিতে আলাপ-আলোচনার বিষয়গুলোর সারাংশ হলো, আমি সত্যি যুদ্ধ করতে এসেছি না পাকিস্তানের চর বা অন্যের চর হিসেবে এসেছি, সে ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হতে চাচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, আমার কাছ থেকে পাকিস্তানের সামরিক তথ্য যত বেশি সম্ভব তারা জানার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে কী কী করা সম্ভব, তা-ও তারা আমার কাছে জানার চেষ্টা করে।

আমি ১৮ মে থেকে কয়েক দিন দিল্লিতে ছিলাম। জিজ্ঞাসাবাদের পর দিল্লিতে এম কে বাশার, সুলতান মাহমুদ আমার সঙ্গে যোগ দেয়। ওখান থেকে আমরা সবাই একত্রে রওনা দিয়ে ৩১ মে আগরতলায় এসে পৌঁছাই। সেখানে কিছুদিন থেকে ৪ জুন আমি আমার পরিবারসহ কলকাতায় চলে আসি। উইং কমান্ডার বাশারও তার পরিবারসহ আমাদের সঙ্গে কলকাতায় আসে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন বাদামিও প্রায় সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

কলকাতায় আসার পর লিটন হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রুপ ক্যাপ্টেন বাদামিই থাকার ব্যবস্থা করেন। এরপর আমি প্রতিদিন সকালে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তর ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে যাওয়া শুরু করি। কর্নেল ওসমানী চাইতেন আমি যেন নিয়মিত সেখানে যাই এবং তাঁর সঙ্গে কার্যালয়ে বসি। এ সময় সবার মধ্যে একটা অনিশ্চিত ভাব ছিল। ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে কেউ জানত না। ভারত তখন পর্যন্ত আমাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র দিচ্ছিল না। কর্নেল ওসমানী বলতেন, তাঁর বিশ্বাস, ইন্দিরা গান্ধী অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। তার পরও যেহেতু আমরা অস্ত্র পাচ্ছি না, তাই সবার মতো কর্নেল ওসমানীর মধ্যেও মাঝেমধ্যে একটা হতাশার ভাব লক্ষ করেছি। আমি কলকাতায় গিয়ে দেখলাম, যোগাযোগব্যবস্থা, বিশেষ করে বেতার যোগাযোগের অভাবে সদর দপ্তর থেকে সেক্টর কিংবা সেক্টর কমান্ডারদের কাছে কোনো নির্দেশনা যায় না। সেক্টর কমান্ডারদের ওপর সদর দপ্তরের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাঁদের ভেতর কোনো ধরনের সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড চোখে পড়েনি। কলকাতায় আসার পর থেকে আমি লক্ষ করেছি, যা সত্যের খাতিরে আমার বলা উচিত, অনেকে মুক্তিযুদ্ধকে সত্যিকারভাবে যুদ্ধ হিসেবে না নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা মনে করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, ভারত তো যুদ্ধে নামবেই

এবং তারাই আমাদের হয়ে পাকিস্তানিদের উৎখাত করে দেবে। তাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ লম্বা চুল-দাড়ি রেখে সৈনিক বুট পরে সিগারেট হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এসব দৃশ্য আমাকে ভীষণ আহত করত। তাদের ভেতর পেশাদারির ছাপ ছিল না। অর্থাৎ, তাদের ভেতর যুদ্ধ করার কোনো একাগ্রতা ছিল না। এ ধরনের আচরণ আমি মূলত নেতৃত্ব পর্যায়ের কারও কারও মধ্যে লক্ষ করেছি, সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের আচরণ ছিল ভিন্ন।

হোটেলে কিছুদিন থাকার পর আমার স্ত্রী-সন্তানদের বাংলাদেশি উদ্বাস্তু ক্যাম্পের পাশে কল্যাণীতে একটি বাসায় পাঠিয়ে দিই। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের পরিবারগুলোর বসবাসের জন্য কল্যাণীর আবাসিক এলাকায় এ ধরনের বেশ কয়েকটি বাড়ি বরাদ্দ করেছিল। আমি চলে আসি কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে। প্রথম দিকে কর্নেল ওসমানী ও আমি একই কামরায় থাকতাম। পরবর্তী সময়ে আমি অন্য কামরায় চলে যাই। এই কামরায় আমরা তিনজন থাকি। আমি ছাড়া এই কামরায় একজন ডাক্তার ও একজন অফিস সহকারী থাকতেন। মশার উপদ্রবে রাতে ঘুমানো যায় না। একসময় স্ত্রীকে একটি মশারি পাঠাতে বলতে বাধ্য হই। এখানে আরেকটা বড় সমস্যা, ঘুমালে শরীরের ওপর দিয়ে বড় বড় ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি করে। কামরায় ছিল একটিমাত্র শৌচাগার। ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের অফিসের সমস্ত লোক এই শৌচাগার ব্যবহার করে। প্রতিদিন আমাদেরই শৌচাগারটি পরিষ্কার করতে হয়।

আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে কল্যাণীতে থাকতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ৮টি উদ্বাস্তু শিবির দেখাশোনা করতেন। সারাটা সময় নার্স হিসেবে উদ্বাস্তু শিশুদের সেবা ও শিক্ষা কার্যক্রম চালাতেন। এর জন্য তিনি কোনো সম্মানী নিতেন না। কলকাতা থেকে ক্যাম্পের দূরত্ব প্রায় ৪৬ মাইল। যুদ্ধ চলাকালে আমি পরিবারের সঙ্গে সাকল্যে মাত্র তিনবার সাক্ষাৎ করতে পেরেছি। এমনও হয়েছে, পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি আর তখনই এমন একটি কাজ এল, রাত একটা পর্যন্ত অফিসেই থাকতে হলো। ফলে পরিবারের কাছে আর যাওয়া হলো না। এ জন্য আমার স্ত্রীর কোনো অভিযোগও ছিল না।

কলকাতায় দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে থাকি, কবে আমাকে যুদ্ধে পাঠানো হবে। কর্নেল ওসমানীকে বললাম, 'স্যার, আমাদের কাজের সুযোগ করে দিন। বিমানবাহিনীতে ছিলাম বলে আমরা যুদ্ধে যেতে পারব না? ২১-

২২ বছর পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে চাকরি করেছি, যুদ্ধও করেছি, অথচ স্বদেশের জন্য যুদ্ধে কোনো কাজই আমার নেই। একেবারে কাজ ছাড়া বসে থাকব, তা তো হয় না।' দেখলাম, তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। আরও লক্ষ করলাম, বাংলাদেশ থেকে আসা সিএসপি অফিসার, শিক্ষক, ডাক্তার, ছাত্ররা যুদ্ধে যোগদান করতে চায়, কিন্তু তাদের নেওয়া হচ্ছে না।

এখানে প্রাসঙ্গিক না হলেও সেই সময়ে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। কলকাতায় গিয়ে একটা বিষয় জানতে আমার বেশ আগ্রহ হয়েছিল। সেটা হলো, ওখানকার মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কী ভাবছে বা শহরে কোনো প্রকার দেয়াললিখন কিংবা পোস্টার আছে কি না। আমি সত্যি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, বিভিন্ন জায়গায় বা বিভিন্ন দেয়ালে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অনেক কথা লেখা আছে। এতে আমার ধারণা হলো, সারা ভারতের কথা বলতে না পারলেও, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বভাবত মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করার আগে আমি মুক্তিবাহিনীর বিষয়ে আমাদের সরকারি অবস্থান তুলে ধরব। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের অধীন, আর প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্নেল এম এ জি ওসমানী মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের সশস্ত্র বাহিনীকে 'বাংলাদেশ বাহিনী' বলা হলেও 'মুক্তিবাহিনী' হিসেবে এটি বেশি পরিচিত ছিল। কখনো কখনো এই বাহিনীকে 'মুক্তিফৌজ'ও বলা হয়েছে। বাংলাদেশ বাহিনীর রূপ কেমন হবে, এর সদস্যদের কাজ কী হবে, এদের নেতৃত্ব-কাঠামো কেমন হবে, এর অঙ্গসংগঠনগুলো কী হবে, ভারতীয় বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক কেমন হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ২৮ জুন বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে একটি বিস্তারিত নির্দেশাবলি দেওয়া হয়। এই নির্দেশাবলি জানা থাকলে আমার লেখা বুঝতে পাঠকের সুবিধা হবে। সে কারণে পরিশিষ্ট ১-এ তা মুদ্রিত হলো।

নির্দেশনাবলিতে উল্লেখ আছে যে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠবে নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনীর সমন্বয়ে। যেসব মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে সামরিক বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসার ইত্যাদি বাহিনীর সদস্য ছিলেন, তাঁদের নিয়মিত বাহিনীর সদস্য বলা হবে। আর যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশা থেকে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের অনিয়মিত বা গণবাহিনীর সদস্য বলা হবে। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি তাঁর সদর দপ্তরের মাধ্যমে এই মুক্তিবাহিনীকে পরিচালনা করবেন। বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মুক্তিবাহিনীর অভিযান, সংগঠন, প্রশাসন, সাজসরঞ্জাম, সদস্যদের ব্যক্তিগত বিষয়াদির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। তিনি

মুক্তিবাহিনীর অস্ত্রপাতি, যানবাহন, যোগাযোগ, বদলি, পদবি, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মকানুন, নির্দেশনাবলি ইত্যাদি প্রস্তুত করবেন এবং কার্যকর করবেন। প্রধান সেনাপতি তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সেক্টর অধিনায়কদের কাছে ন্যস্ত করতে পারবেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বিএসএফের সঙ্গে মুক্তিবাহিনী কীভাবে কাজ করবে, বা কতটুকু সহযোগিতা পাবে, তা-ও বলা হয়েছে এই নির্দেশনাবলিতে। অভিযান পরিচালনার কিছু মৌলিক নীতিমালাও এই নির্দেশনাবলির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। অভিযান পরিচালনার নীতিমালা ও নির্দেশনাবলি সময়, পরিস্থিতি, নতুন যোদ্ধা এবং অস্ত্রসম্ভার প্রাপ্তি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে পরবর্তী সময়ে পরিবর্তন করা হয়।

যত দূর মনে পড়ে, ২৮ জুনের আগে বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক নির্দেশনা প্রচার করা হলেও ২৮ জুন দেওয়া এই নির্দেশনাই ছিল যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে প্রথম লিখিত ও অনেকাংশে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনাবলি। আগেই উল্লেখ করেছি, ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর আলোকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং একটি সাংগঠনিক রূপ পেয়েছিল। এই সম্মেলনের মাধ্যমেই বাংলাদেশ বাহিনী গঠন, নেতৃত্ব নির্ধারণ, সমন্বয় সাধন ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর জন্য যা অত্যন্ত জরুরি ছিল। পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় তিন মাস পর, জুলাই মাসে। তেলিয়াপাড়া সম্মেলনের বিষয়ে কিছু তথ্য আগে উল্লেখ করেছি। পাঠকের সুবিধার জন্য নিচে কিছুটা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলাম।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য ১ এপ্রিল তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে উপস্থিত হন। ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) পূর্বাঞ্চলীয় মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার ভি সি পান্ডে সেখানে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাঙালি অফিসাররা ব্রিগেডিয়ার পান্ডের কাছ থেকে কর্নেল এম এ জি ওসমানী এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, কর্নেল ওসমানীসহ ওই এলাকার সব সামরিক অফিসার ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় মিলিত হয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করবেন। ব্রিগেডিয়ার পান্ডের মাধ্যমে আগরতলায় কর্নেল ওসমানীকে আর রামগড়ে ৮ ইস্ট বেঙ্গলের অফিসারদের আলোচনার সংবাদ জানানো হয়।

৪ এপ্রিল সকাল ১০টায় তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের ব্যবস্থাপকের বাংলোয় সামরিক কর্মকর্তাদের সভা শুরু হয়। এখানে উপস্থিত হন কর্নেল (অব.) এম

এ জি ওসমানী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাহউদ্দীন মোহাম্মদ রেজা (পরে কর্নেল, সালাহউদ্দীন মোহাম্মদ রেজা তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে মুক্তিবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন), লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) আবদুর রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কে এম সফিউল্লাহ (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল ও সেনাপ্রধান), মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর (অব.) কাজী নুরুজ্জামান (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল), মেজর নুরুল ইসলাম (পরে মেজর জেনারেল), মেজর শাফায়াত জামিল, মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী (বীর বিক্রম, পরে মেজর জেনারেল), ক্যাপ্টেন আবদুল মতিন (বীর প্রতীক, পরে ব্রিগেডিয়ার) প্রমুখ। এ ছাড়া বৈঠকে বিএসএফের ব্রিগেডিয়ার পান্ডে, আগরতলার (ত্রিপুরা) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সায়গল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমা প্রশাসক কাজী রকিবউদ্দীনও (বর্তমানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার) উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উদ্ভূত পরিস্থিতির সার্বিক মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে বাংলাদেশ সরকার গঠন না হলেও বাস্তবতার প্রয়োজনে সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসারের সদস্য এবং সাধারণ সশস্ত্র জনতাকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হবে। কর্নেল ওসমানী মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ বা প্রধান সেনাপতি থাকবেন। মুক্তিযুদ্ধের সুবিধার্থে বাংলাদেশকে মোট চারটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন মেজর জিয়াউর রহমান—চট্টগ্রাম অঞ্চল, মেজর কে এম সফিউল্লাহ—সিলেট অঞ্চল, মেজর খালেদ মোশাররফ—কুমিল্লা অঞ্চল এবং মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)—কুষ্টিয়া অঞ্চল। সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, ভারী অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদের অভাব মেটানোর জন্য তাঁরা অবিলম্বে ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করবেন। এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ সরকার গঠনেরও আগে এবং সভার কোনো লিখিত কার্যবিবরণী রাখা হয়নি। তবে মৌখিকভাবে বাহিনীর সংগঠন, নেতৃত্ব ও যুদ্ধ পরিচালনার যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা পরবর্তী সময়ে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন পায়। ১১ এপ্রিল নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণে এই সভার সিদ্ধান্তের কিছু অংশ উচ্চারিত হয়েছিল। পরে এই সভার সিদ্ধান্তগুলোকে পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজনের মাধ্যমে আরও সময়োপযোগী করে তোলা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটলে তেলিয়াপাড়ার সভায় নির্দেশিত চারটি সামরিক অঞ্চলকে জুন মাসের মধ্যে নয়টি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। অঞ্চল কমান্ডাররা নিজেরাই মাঠপর্যায়ে আলোচনা করে অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ করে নেন। অঞ্চলের কোনো সুনির্দিষ্ট নাম না থাকলেও তাঁরা যে এলাকায় দায়িত্বরত ছিলেন, সেই এলাকার নামে অঞ্চলগুলো পরিচিত হয়। যেমন চট্টগ্রাম অঞ্চল, সিলেট অঞ্চল, রাজশাহী অঞ্চল ইত্যাদি। বাংলাদেশের এই অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য ভারতীয় বাহিনী আটটি সেক্টর গঠন করে। এগুলোর নাম ছিল ইংরেজি বর্ণের ক্রমানুসারে, যেমন এ, বি, সি, ডি, ই, ই(১), এফ, জে সেক্টর। বাংলাদেশের অঞ্চলগুলো ভারতীয় সেক্টরের সহযোগিতায় তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড এবং অভিযান পরিচালনা করত। ভারতীয় সেক্টরগুলো আমাদের অঞ্চলগুলোর সমান্তরাল সংগঠন হলেও আমরা প্রায় সবকিছুর জন্যই তাদের ওপর নির্ভরশীল থাকতাম। কালক্রমে বাংলাদেশ বাহিনীর অঞ্চলগুলোও সেক্টর হিসেবে পরিচিতি পায় এবং সংখ্যানুসারে তাদের নামকরণ হয়। যেমন ১ নম্বর সেক্টর, ২ নম্বর সেক্টর ইত্যাদি।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি থেকে আগরতলা হয়ে কলকাতায় ফিরে আসার পর আমি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং মন্ত্রী এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে দিল্লিতে ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনার বিষয়গুলো অবহিত করি। তাঁদের জানাই যে ভারত আমাদের সাহায্য করার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। আরও জানাই, যদি ভারত আমাদের সাহায্য করে, তাহলে কতখানি সাহায্য প্রয়োজন হবে, তার একটি সম্ভাব্য রূপরেখা তাদের দিয়ে এসেছি। তাদের আমি এ-ও বলেছি, পাকিস্তানি বাহিনী উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। আমাদের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে গতানুগতিক বা প্রথাগত যুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রথমে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ দিয়ে শুরু করতে হবে। ভবিষ্যতে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে কোনো এক পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হবে এবং গেরিলাযুদ্ধ প্রথাগত যুদ্ধে রূপান্তরিত হবে। তখন যুদ্ধের অংশ হিসেবে বিমানও ব্যবহার করতে হতে পারে। সেটা কখন সম্ভব হবে, তা এখনই বলা যাবে না। এ মুহূর্তে আোমাদের গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আমার আলাদাভাবে কথা হয়েছিল।

তখন তাজউদ্দীন আহমদকেও একই কথা বলেছিলাম যে আমাদের প্রথম দিকে গেরিলাযুদ্ধই চালাতে হবে। কারণ, সম্মুখযুদ্ধ চালানোর মতো জনবল, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ইত্যাদি আমাদের নেই। প্রশিক্ষিত পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে এগুলো ছাড়া প্রথাগত যুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। মনে হয়েছিল, তাজউদ্দীন আহমদ আমার মতামত বুঝতে পেরেছিলেন এবং আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন।

ভারত সরকার যুদ্ধের শুরু থেকেই আমাদের বাছাই করা যুবকদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) আমাদের ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়; এই সময়ে যুব অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয়। এই শিবিরগুলোকে ইয়ুথ ক্যাম্পও বলা হতো। যেসব সাধারণ যুবক সীমান্ত অতিক্রম করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে আসত, তাদের এসব ক্যাম্পে রাখা হতো। আমাদের এমএনএ এবং এমপিএরা এসব শিবির তদারকের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরও নির্বাচন করতেন। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এসব যুব শিবিরে আসা যুবকদের দেখাশোনা করত। ভারতীয়রা ক্যাম্পে থাকা যুবকদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করত।

যুব শিবির থেকে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতারা, বিশেষ করে, নূরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আবদুর রব ও তোফায়েল আহমেদ শুধু নিজেদের সমর্থক এবং ছাত্রলীগের ছেলেদের গেরিলা হিসেবে রিক্রুট করা শুরু করেন। বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরে দায়িত্ব পাওয়ার পর আমি চেয়েছিলাম, আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের সদস্য ছাড়াও অন্যান্য যুবক, যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে ভারতে এসেছে, তাদের সবাইকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেওয়া হোক। আমি কর্নেল ওসমানীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যদের অবহিত করেও বিশেষ ফল পাইনি। প্রথম দিকের মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব ছিল প্রকট। এই অবস্থা চলতে থাকে প্রায় আগস্ট মাস পর্যন্ত। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তন হয়।

মাঠপর্যায়ে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সেক্টর অধিনায়কদের। তাঁরা তাঁদের এলাকায় অভিযানের লক্ষ্যবস্তুগুলো ঠিক করতেন। এরপর গেরিলাদের লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ এবং ধ্বংস করার দায়িত্ব দিতেন। গেরিলারা সঠিক

প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত না হলে যে সেক্টর অধিনায়কেরা তাঁদের কাছ থেকে ভালো ফল পাবে না এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যুব শিবির রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছিল, তা সেক্টর অধিনায়কেরাও আমাদের অভিহিত করেন। জুলাই মাসে সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলনে বিষয়টি উত্থাপিত হলে বিশেষ কোনো আলোচনা ছাড়াই তা এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং নিচের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

> ৯. যুব শিবির
>
> **যুব শিবির সংগঠনটি বাংলাদেশ বাহিনীর অধীন নয়। প্রধান সেনাপতি অথবা সেক্টর অধিনায়কেরা যুব শিবিরের কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট নন, যদিও সংগঠনটি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে আসীন প্রধানমন্ত্রীর অধীন। নিজস্ব বাহিনীর ঘাটতি পূরণ এবং জরুরি সম্প্রসারণের চাহিদা মেটানোর পর, যথাসময়ে যুব শিবিরে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্র যুব শিবিরে কোনো প্রশিক্ষক সরবরাহ করবে না, যদি না বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়।**
>
> **সদর দপ্তর বাংলাদেশ বাহিনী পত্র নম্বর ০০১০ জি, তারিখ ৫ আগস্ট ১৯৭১**

বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরে যোগ দেওয়ার পর কথা প্রসঙ্গে গেরিলাযোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের কথা ওঠে। কর্নেল ওসমানী আমাকে জানান, শুধু আওয়ামী লীগের এমপিএ এবং এমএনএরা আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের যুবকদের মধ্য থেকে গেরিলাযোদ্ধা নির্বাচন করবেন। এ বিষয়ে আমি দ্বিমত পোষণ করি এবং কর্নেল ওসমানীকে বলি, 'স্যার, শুধু আওয়ামী লীগের সমর্থকদের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না। যদি এটা করা হয়, তাহলে অত্যন্ত ভুল হবে। বহু ছাত্র, সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ভারতে এসেছেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। তাঁরা রাজনীতি করেন না। আমি নিজেও রাজনীতি করি না। সুতরাং, যাঁরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য এসেছেন, তাঁদের যুদ্ধে না নেওয়াটা হবে অত্যন্ত অন্যায়। তাঁদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং যুদ্ধে যেতে দিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধকে দলীয়করণ করলে তা যুদ্ধকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।' আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেছিলাম, মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনের বিষয়টি যেন মন্ত্রিসভায় তোলা হয় এবং জরুরিভাবে এটি পুনর্বিবেচনা করা হয়। তিনি এ বিষয়ে তখন কোনো উত্তর দেননি। শুধু বলেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত এখনই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, কারণ এটি মন্ত্রিপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি তখন তাঁর সঙ্গে বা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। আমরা যারা যুদ্ধে যোগ দিতে গিয়েছি, তাদের অনেকে তখন আওয়ামী লীগ করতাম না বা রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। হাজার হাজার যুবক সবকিছু ত্যাগ করে দেশকে স্বাধীন করার জন্য ভিনদেশে এসেছে। তাদের আমরা যুদ্ধ করতে দেব না, প্রশিক্ষণ নিতে দেব না, এটা তো যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই অন্যায়। এই কথাগুলো আমি কর্নেল ওসমানীকে বলেছি। আমি খুব আশা করেছিলাম, ওসমানী সাহেব এ বিষয়ে কিছু একটা করবেন এবং একটি ইতিবাচক উত্তর দেবেন। এগুলো শুধু আমার কথা ছিল না, বরং তাতে সমস্ত বাঙালি যুবকের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল। তাদের এই আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বল করে দেয় মন্ত্রিসভার ওই সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাড়া যুদ্ধে নেওয়া হবে না। বিষয়টি তরুণদের মধ্যে খুব অসন্তোষের সৃষ্টি করে। যুবকেরা দেশ থেকে পালিয়ে সীমান্তে যুব শিবিরে আসতে থাকে, আর সেখানে তারা প্রশিক্ষণে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। অথচ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ তারা পেল না।

একদিন মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনের বিষয়ে ওসমানী সাহেবের ঘরে আলোচনা হচ্ছিল। দেখলাম, কয়েকজন এমপিএ এবং এমএনএ যাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনের জন্য। আমি কর্নেল ওসমানীকে বললাম, 'স্যার, আমার মনে হয়, ওনারা ঠিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করতে সক্ষম হবেন না। ওনাদের তো এসব কাজের অভিজ্ঞতা নেই। যুদ্ধ বা যোদ্ধা বিষয়ে ওনারা বিশেষ কোনো জ্ঞান রাখেন না। যারা যুদ্ধ করবে, সে গেরিলাই হোক আর নিয়মিত সৈন্যই হোক, তাদের যুদ্ধ করার মতো মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা থাকতে হবে। জনপ্রতিনিধিরা যোগ্যতা নির্ধারণের এই কাজটি সঠিকভাবে করতে সক্ষম হবেন না।' আমি আরও বলেছিলাম, 'স্যার, সামরিক বাহিনীর যেসব অফিসারকে কাজে লাগানো হচ্ছে না বা যেসব বেসামরিক কর্মকর্তা, শিক্ষক, ডাক্তার দেশ ছেড়ে এখানে এসেছেন, আপনি এঁদের গেরিলা নির্বাচনের দায়িত্ব দিন। তাঁদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে অথবা অন্যদের চেয়ে এ বিষয়ে তাঁদের ধারণা বেশি।' এখানে বলে রাখা ভালো, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অনেক দিন পর্যন্ত বেশ কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবীকে কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁরা কলকাতা বা আগরতলায় অলসভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন।

অন্য একদিন আমি কর্নেল ওসমানীকে দেখলাম, গেরিলা রিক্রুট করার দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন এমএনএকে ব্রিফ করছেন। সেদিন আমি বলেছিলাম, 'স্যার, একজন এমএনএর ব্যাকগ্রাউন্ড কী? কেউ হয়তো উকিল ছিলেন, কেউ হয়তো ব্যবসায়ী ছিলেন, আবার কেউ হয়তো ঠিকাদার ছিলেন। জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের যোগ্যতা ভিন্ন। তাঁরা জনগণের কাছাকাছি থাকবেন এবং তাঁদের কল্যাণে কাজ করবেন। কিন্তু যুদ্ধের জন্য সৈন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। এ কাজটি খুব সচেতন এবং যত্নশীলভাবে করতে হয়। এমএনএ হলেই যে তিনি একজন শক্ত, সমর্থ, যোগ্য যোদ্ধা বাছাই করতে সক্ষম হবেন, তা সঠিক নয়। গেরিলা রিক্রুট করার জন্য এককভাবে শুধু এমএনএদের দায়িত্ব দেওয়া একটা ভুল সিদ্ধান্ত হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এর জন্য ভোগান্তি হবে সেক্টর অধিনায়কের।' আমার বক্তব্য তাঁর কাছে গুরুত্ব পেল না। তিনি বলেন, 'এটা উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত।' আমি আর কিছু বলতে পারলাম না, চুপ হয়ে গেলাম।

মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনের এই দুর্বলতা যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যন্ত ছিল। আগস্ট মাসের পর থেকে আমাদের রিক্রুটমেন্ট খুব গতি লাভ করে। কিন্তু এমএনএদের দুর্বলতার কারণে মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। আমি এমএনএদের সম্পৃক্ততা অক্ষুণ্ন রেখে মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন আরও গতিশীল এবং কার্যকর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি। (দেখুন পরিশিষ্ট ২)। প্রস্তাবটি লক্ষ করলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনে এমএনএ এবং এমপিএদের সম্পৃক্ততা আমাদের জন্য কী সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। আমার এই প্রস্তাব মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কার্যকর করা হয় এবং এমএনএ ও এমপিএদের সহযোগিতার জন্য পৃথক কর্মকর্তা দেওয়া হয়, যাঁরা সার্বক্ষণিকভাবে ইয়ুথ ক্যাম্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অনেক পরে রাজনৈতিক পরিচয়, অর্থাৎ আওয়ামী লীগ-বহির্ভূত সাধারণ যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাঠানো হয়। প্রশিক্ষণের পর অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মতো তারাও কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানার ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং সফল হয়। এভাবে ক্রমে সর্বস্তরের মানুষকে যুদ্ধে সম্পৃক্ত করা হয়। যুদ্ধের শুরুতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার পরিবর্তে আলাদা আলাদা উদ্যোগ আমাদের যুদ্ধের জন্য খুব ভালো ছিল না। সাধারণ মানুষ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসেছিল, তারা এটা চায়নি। তারা চেয়েছিল, দেশত্যাগী প্রতিটি

মানুষ মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে এবং এই অধিকার তাদের রয়েছে। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক ছাড়াও নানা রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর লোক এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। এভাবে দেশের সব দল ও মতের মানুষের অংশগ্রহণে আমরা পাকিস্তানকে দ্রুত পরাস্ত করতে পেরেছিলাম।

যেকোনো কাজের জন্য মোটিভেশন বা উদ্বুদ্ধকরণ বা প্রেষণা বা প্রণোদনা দরকার। যদি কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা দেশের মধ্যে প্রণোদনার অভাব থাকে, তবে সেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা দেশের দ্বারা কৃত কোনো কাজের সুফল পাওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নেওয়ার জন্য অসংখ্য ছাত্র, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য আসে। যুদ্ধক্ষেত্রে নেওয়ার আগে এসব যোদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা সঠিকভাবে তৈরি করে নেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল। রণাঙ্গনে যদি কোনো ব্যক্তির দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, ধৈর্য ইত্যাদি গুণাবলি সঠিক পরিমাণে না থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে যুদ্ধে ভালো কোনো ফল আশা করা যায় না। তাই মুক্তিযুদ্ধে প্রণোদনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইয়ুথ ক্যাম্পে যুবকদের মানসিকতা সঠিকভাবে তৈরি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রণোদনা টিম গঠন করা হয়। বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে যুবকদের প্রশিক্ষণে পাঠানোর আগে তাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য প্রচারপত্র তৈরি করা হয়, যাতে তারা আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এই মহৎ কাজটি করতে গিয়ে একটি বড় ধরনের ভুল হয়। যেখানে দল ও মতের ঊর্ধ্বে একজন যোগ্য, দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য বা ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ দেওয়া উচিত ছিল, সেখানে তা না করে শুধু দলীয় বিবেচনায় প্রণোদনার প্রশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। এসব প্রশিক্ষকের সিংহভাগই ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নেতার রণাঙ্গনে প্রণোদনা প্রদানের যোগ্যতা ও গুণাবলির যথেষ্ট অভাব ছিল। এই নেতারা এ কাজে কোনো শ্রম দিতেন না এবং নতুন যোদ্ধাদের সুন্দরভাবে উদ্বুদ্ধ বা মোটিভেশন করতেন না। তাই নতুন যোদ্ধারা প্রণোদনার দিক দিয়ে যুদ্ধের উপযোগী হতো না। আমার দৃষ্টিতে সঠিকভাবে প্রণোদনার কাজটি প্রায় হয়নি বললেই চলে। তবে যুদ্ধের শেষের দিকে প্রণোদনার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োজিত করা হয়েছিল। তত দিনে যে ক্ষতি হওয়ার, সেটা হয়ে গিয়েছিল।

আমি শুধু ফরিদপুরের এমএনএ ওবায়দুর রহমানকে এই কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে দেখেছি।

প্রশিক্ষণে মোটিভেশন বা উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টি যে গুরুত্ব পাচ্ছে না বা অলক্ষ্যে থেকে যাচ্ছে, তা আমাদের বেশ চিন্তিত করে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক বিষয় নিয়ে সদর দপ্তরে একটি 'পজিশন পেপার' লেখা হয়, তাতেও এই উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। নিচে আমি সেই প্রতিবেদনের কিছু অংশ তুলে ধরলাম।

> জুলাই মাস থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণে প্রবেশিত সংখ্যা ৫ হাজার থেকে ৮ হাজার এবং আগস্টে ৮ হাজার থেকে ১২ হাজারে বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে প্রতি তিন সপ্তাহে কুড়ি হাজারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই বিশাল পরিমাণ গেরিলা ভর্তির কারণে তাদের আনুগত্য, সাহস এবং আত্মোৎসর্গের মতো ব্যক্তিগত গুণাবলির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এটি কাকতালীয় যে, কিছু পরিমাণ ছেলে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন। ফলে রিক্রুটদের অধিকাংশই হয় প্রণোদিত নয় অথবা গেরিলা হওয়ার যোগ্যতা নেই। এতে ফল দাঁড়িয়েছে :
>
> ক. কিছু গেরিলা ভেতরে গিয়েছে মূলত অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, যেমন লুট, হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে।
>
> খ. কিছু দল ভেতরে গিয়ে প্রায়ই তাদের অস্ত্রগুলো ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য রেখে দিচ্ছে এবং কোনো অভিযান পরিচালনা করছে না। ছেলেদের একটি বড় অংশ একেবারে তাৎপর্যহীন কিছু কাজ করছে, যা যুদ্ধে কোনো সাহায্য করছে না, যেমন টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া।
>
> গ. শতকরা মাত্র ১০ থেকে ১৫ ভাগ ছেলে সত্যিকার অর্থে যথাযথ অভিযান পরিচালনা করছে। তবু ভেতরের সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাবে এর সার্বিক প্রভাব প্রায় নগণ্য।
>
> ঘ. চূড়ান্ত বিচারে ভেতরের কিছু গেরিলা অভিযানে আংশিকভাবে হলেও উল্টো ফল হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।

গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের অনেকের ধারণা, গোপনে গাছের আড়াল থেকে একটি বা দুটি গুলি ছুড়লেই গেরিলাযুদ্ধ হয়ে যায়। আসলে তা নয়। গেরিলাযুদ্ধ হলো খুবই সংগঠিত ও বিশদ পরিকল্পনার সাহায্যে পরিচালিত যুদ্ধ। গেরিলাযুদ্ধের প্রধানত দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে গেরিলারা পরিকল্পিত ও ঝটিকা আক্রমণে শত্রুবাহিনীকে বিধ্বস্ত করবে। দ্বিতীয়ত, গেরিলাদের মূল লক্ষ্যবস্তু থেকে শত্রুর দৃষ্টি অন্যদিকে ব্যস্ত রাখবে, চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে শত্রুকে সব

সময় ব্যস্ত রাখবে, শত্রুর যোগাযোগের পথ ও মাধ্যমকে ধ্বংস করবে, তাদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটাবে, শত্রুর বিপক্ষে নৈতিক প্রচারণা চালাবে ইত্যাদি। গেরিলাযুদ্ধের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, গেরিলারা তাদের সকল কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষ বা স্থানীয়দের সহায়তায় গোপনে থেকে বা স্থানীয়দের মধ্যে মিশে গিয়ে দ্রুত ও অতর্কিত আক্রমণ করে শত্রুকে নাজেহাল করবে এবং আক্রমণের পরপরই স্থান ত্যাগ করবে।

গেরিলাযুদ্ধ হলো একটি বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল। যুদ্ধের ময়দানে গেলাম, কয়েকটি গুলি ফোটালাম আর ফিরে এলাম—এটাকে যুদ্ধ বলা যায় না। শত্রুকে ঘায়েল করাই হলো যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যুদ্ধের ময়দানে একজন যোদ্ধাকে কৌশলগতভাবে খুব সতর্ক আর তীক্ষ্ণ হতে হয়। যুদ্ধে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে যেমন বিজয়ী হওয়া যায়, তেমনি নিজেরও পরাজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যুদ্ধ হচ্ছে একটি কৌশলনির্ভর অভিযান বা আক্রমণ, যেখানে প্রতিটি ছোটখাটো বিষয় এবং প্রতিটি মুহূর্তকে নিখুঁতভাবে ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ, যুদ্ধ নিছক শক্তি আর অস্ত্রের ব্যবহার নয়, বরং আরও বেশি কিছু। যুদ্ধের সময় একজন যোদ্ধার বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অস্ত্রের সঠিক ব্যবহারের সম্মিলন ঘটাতে হয়। তা না হলে শত্রুকে সহজে ঘায়েল করা যায় না। গেরিলাযুদ্ধে যোদ্ধাদের অনেক কিছু লক্ষ রাখতে হয়। যেমন তেলের ডিপো যদি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়, তাহলে ওই তেলের ডিপোতে কতজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে, ডিপোটি কী পরিমাণ মজবুত, এটাকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া সহজ কি না, একে ধ্বংস করতে গেলে আমরা শত্রুর কাছে ধরা পড়ব কি না ইত্যাদি। সফল অভিযান পরিচালনার জন্য এসব তথ্য গেরিলাদের বিস্তারিতভাবে জানতে হয়।

যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় প্রশিক্ষণ ও অভিযানের বিষয়ে ভারতীয় বিএসএফ সব ধরনের সমন্বয় সাধন করত। মুক্তিযুদ্ধে যথাযথভাবে পরিকল্পনা না করেই গেরিলাদের অভিযানে পাঠানো হতো। অনেক সময় অভিযান শুরু হওয়ার আগেই তারা ধরা পড়ে যেত। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে গেরিলা অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি যে পরিমাণ দরকার হতো, তা ভারতীয়দের কাছ থেকে পাওয়া যেত না। আমার মনে পড়ে, অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও সরঞ্জামের ২০-২৫ শতাংশের বেশি ভারত থেকে পাওয়া যেত না। যেমন ব্রিজ ডিমোলিশন করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের যে ধরনের বা যেরকম বিস্ফোরক দেওয়া হতো, তা দিয়ে ব্রিজ তো দূরের কথা, একটা টেলিফোন পোস্টও ওড়ানোও সম্ভব ছিল না। প্রয়োজনের তুলনায় অস্ত্র ও

সরঞ্জামের অপ্রতুলতার বিষয়টি জেনেও ভারতীয়রা কোনো-না-কোনো অজুহাতে তা কম সরবরাহ করত।

বিএসএফ পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহ না করার কারণ তাদের হয়তো অস্ত্র ছিল না অথবা তারা সরকারের অনুমতি পায়নি। আমার মনে হয়েছিল, ভারতীয়রা প্রথম দিকে যুদ্ধটি শুধু টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কোনো কিছু অর্জন করতে চায়নি। তখন পর্যন্ত ভারতীয়দের সহযোগিতার কথা বলতে গেলে বলব, তারা সীমান্তে কতগুলো সামরিক ঘাঁটি তৈরি, মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু লজিস্টিক সহায়তা ও কিছু হালকা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু করেনি। শুনেছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশ (পরে ফিল্ড মার্শাল) বিএসএফের প্রধান কে এফ রুস্তামজিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সীমান্তে তাঁরা ততটুকু তৎপরতা চালু রাখবেন, যতটা পাকিস্তানিরা সহ্য করতে পারে এবং পাকিস্তান যেন সেটিকে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে পরিণত করতে না পারে। ভারতীয়দের সে সময়ের সহযোগিতা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। ভারতীয় বাহিনী জুলাই মাস পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো সিগন্যাল সরঞ্জাম দেয়নি। জুলাইয়ের পর তারা অল্প কিছু সিগন্যাল সরঞ্জাম দেয়। অথচ সিগন্যাল সরঞ্জাম ছাড়া যুদ্ধ কল্পনাই করা যায় না। জুলাই মাস পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বার্তা আদান-প্রদানের জন্য নিকটস্থ ভারতীয় সেনাবাহিনী বা বিএসএফের সিগন্যাল-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল থাকতে হতো। এর ফলে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় অথবা বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ খুব বিঘ্নিত হতো।

গেরিলাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যেও মতভেদ ছিল। জেনারেল মানেকশ চাইতেন, অল্প কয়েক দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে হাজার হাজার গেরিলা সৃষ্টি করা হোক। বিপরীতে পূর্বাঞ্চল কমান্ডের সিজিএস মেজর জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব (পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) চাইতেন, স্বল্পসংখ্যক গেরিলাকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হোক। যাহোক, মে মাস থেকে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার করে গেরিলাযোদ্ধা প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করার সিদ্ধান্ত হয়। আগেই বলেছি, যোদ্ধাদের বাছাই করা হতো বিভিন্ন যুব শিবির থেকে। আমাদের এমএনএ এবং এমপিএরা এই কাজটি করতেন। প্রশিক্ষণের জন্য কর্মসূচি ছিল বেশ সংক্ষিপ্ত। সময়ের কথা ভেবেই এটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। সময়সীমা ছিল মাত্র দুই থেকে চার সপ্তাহ। অথচ একজন গেরিলাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে

কমপক্ষে তিন মাস সময়ের প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধ-পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। এ কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে কিছুটা ঘাটতি থেকেই যায়। এসব যুবকের অধিকাংশই যেহেতু আন্তরিকভাবে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল, তাই প্রশিক্ষণের এই ঘাটতি খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। প্রথম দল বেরিয়ে আসে জুন মাসের মাঝামাঝি।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে যখন নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয়, তখন বাঙালি যোদ্ধারা অস্ত্র ব্যবহার করতে জানুক বা না জানুক, তাদের প্রত্যয় ছিল, তারা যুদ্ধ করবে। তাদের এ ধরনের প্রত্যয় বা দৃঢ়তা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। পাশাপাশি উপলব্ধি করেছি, তাদের দৃঢ়তা বা সদিচ্ছা আছে, সাহসও আছে, কিন্তু চিন্তায় গভীরতা বা পরিপক্বতার অভাব রয়েছে। এই অবস্থা দূর করা যেত, যদি তাদের গেরিলাযুদ্ধের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হতো। তারা যদি কিছুদিন বেশি প্রশিক্ষণ নিতে পারত, তারা যদি শিখতে পারত যে যুদ্ধের সময় আড়ালে থেকে শত্রুকে কীভাবে আক্রমণ করতে হবে বা এ-জাতীয় অন্যান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারত, তাহলে তারা নিজেদের আরও নিরাপদে রেখে যুদ্ধ করতে পারত। সেটাই হতো গেরিলাযুদ্ধের সার্থকতা। কিন্তু অনেক ছেলে এসব দিক বিবেচনা না করে বা সঠিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ ধরনের অজ্ঞতার ফলে কত মুক্তিযোদ্ধা যে মারা গেছে, তার অন্ত নেই। তারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছে। এভাবে প্রথম দিকে আমাদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। প্রশিক্ষণের দুর্বলতা সেক্টর অভিযানগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে দিত। এই দুর্বলতার জন্য সেক্টর অধিনায়কেরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। তাঁরা অনেক সময়ই এই দুর্বলতাগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর বা প্রধান সেনাপতিকে অবহিত করতেন। এখানে ১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর এম রফিকুল ইসলামের (বীর উত্তম, পরে মন্ত্রী) একটি মন্তব্য তুলে ধরছি। ২৯ সেপ্টেম্বর প্রধান সেনাপতির কাছে আরও কয়েকটি মন্তব্য ও সুপারিশের সঙ্গে এটি তিনি প্রেরণ করেছিলেন।

> প্রধান সেনাপতির জন্য পয়েন্ট
>
> ৮. গেরিলাদের প্রশিক্ষণ
>
> ক. এটা স্পষ্ট যে প্রশিক্ষণকেন্দ্র গেরিলাযুদ্ধের ওপর কোনো পাঠদান করছে না, বিশেষত গেরিলাঘাঁটি এবং কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে। ফলে গেরিলাদের নিয়োগের পর তারা গুরুতর প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পতিত হচ্ছে।

> খ. গেরিলাদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তা অধিক মাত্রায় প্রথাগত ধারার এবং অনমনীয় স্বভাবের। গেরিলাদের ধারণা, কোনো অ্যামবুশ বা রেইড প্লাটুনের নীচ এবং এলএমজি ছাড়া পরিচালনা করা যায় না। এ ধরনের অনমনীয়তা গেরিলা অভিযানে কাম্য নয়।
>
> ১ নম্বর সেক্টর, পত্র নম্বর XXXX, তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

প্রথম দিকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা গেরিলাদের ভারতীয় বাহিনীর অধীনে রাখা হতো। কেন এটা করা হতো, আমি নিজেও বুঝিনি। এমনকি প্রশিক্ষণের পর গেরিলাদের যেসব অঞ্চলে, অর্থাৎ ভারতীয় সেক্টর এলাকায় পাঠানো হতো, তা আমাদের সদর দপ্তর জানতে পারত না। ভারতীয়রা এটা সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখত। অনেক সময় ভারতীয় বাহিনীর কাছে মজুত থাকা নিজস্ব গেরিলা বা মুক্তিযোদ্ধাদের সেক্টর অধিনায়কেরা ব্যবহার করতে পারতেন না। ফলে সেক্টরে অভিযান পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেত অথবা অভিযানের সংখ্যা কমে আসত। সেক্টর অধিনায়কেরা নিয়মিত তাঁদের এই সমস্যার কথা আমাদের অবহিত করতেন। এ ধরনের একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করে সদর দপ্তরে প্রেরিত একজন সেক্টর অধিনায়কের চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।

> ১. ওপরে বর্ণিত আপনার বার্তার সারমর্ম বুঝতে পেরেছি। আপনাকে লেখা আমার ব্যক্তিগত পত্র অনুযায়ী সহায়তাকারী সেক্টর অধিনায়ক তাঁদের উপরস্থ সদর দপ্তরের নির্দেশে আমাদের প্রশিক্ষিত গেরিলা এবং সেক্টর সেনাদল ফেরত দেননি। সহায়তাকারী সেক্টর অধিনায়ক তাঁদের পরিচালনা ও নিয়োগ করছেন। আপনার অনুমোদিত কর্মসূচির একটি নকল সাহায্যকারী সেক্টর অধিনায়ককে দেওয়া হয়েছে।
>
> ২. আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে মিত্রবাহিনীর উপরস্থ কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনাটি উপস্থাপন করা হোক, যাতে তারা প্রশিক্ষিত গেরিলা ও সেক্টর সেনাদলকে আমাদের নিকট হস্তান্তর করে।
>
> সদর দপ্তর ১ ব্রিগেড, পত্র নম্বর ১০১/১/জি, তারিখ ২৯ জুলাই ১৯৭১

ভারতীয় কর্মকর্তারা গেরিলাদের লক্ষ্যবস্তু নির্বাচন করে বাংলাদেশের ভেতরে অভিযানে পাঠাত। ভারতীয় কর্মকর্তাদের বাংলাদেশের ভেতরে লক্ষ্যবস্তুর ভৌগোলিক অবস্থান ও শত্রু সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য ও ধারণা থাকত না। ফলে অনেক জায়গায় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ সফল হতো না। মুক্তিযুদ্ধে এর প্রভাব খুব একটা ভালো হয়নি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের আমাদের সেক্টরের অফিসাররা যেভাবে সঠিক ও কার্যকর নির্দেশ দিতে পারতেন, তা কোনো ভিনদেশির পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেক্টর অফিসার ও গেরিলারা একে

অন্যকে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে বুঝতে পারবেন, ভিনদেশির পক্ষে তা সম্ভব নয়। সেক্টর অফিসারদের জন্য গেরিলাদের যোগ্যতা বোঝা ও তাদের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করা সহজ হতো। কারণ, তারা উভয়েই একই অঞ্চল বা দেশ থেকে এসেছে, তারা উভয়েই একই পরিবেশ, একই আবহাওয়া ও একই সংস্কৃতিতে বড় হয়েছে। এ ছাড়া তারা একই ভাষায় কথা বলেন। তারা জানত, তাদের অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনায় কী সুবিধা বা অসুবিধা আছে। ২০ আগস্ট ভারতীয় সেনাপ্রধান ও পূর্বাঞ্চল কমান্ডারের সঙ্গে আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর অন্যতম ছিল গেরিলাদের অভিযান প্রসঙ্গ। সিদ্ধান্ত হয় যে বাংলাদেশি সেক্টর অধিনায়কেরা গেরিলাদের অভিযানগুলো পরিচালনা করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর না হওয়ায় যে সমস্যাগুলো দেখা দেয়, তা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে অবহিত করা হয়। বর্ণিত সমস্যার অংশবিশেষ নিচে বর্ণিত হলো :

> গেরিলাদের পরিচালনা : চিফ অব স্টাফ [মেজর জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব] ও আর্মি অধিনায়কের [জেনারেল অরোরা] সঙ্গে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, সেক্টর অধিনায়কেরা গেরিলাদের পরিচালনা করবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এখনো সহায়তাকারী বাহিনীর অফিসাররা গেরিলাদের পরিচালনা করছেন, যাঁরা এলাকা এবং জনগণ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন না, অথচ অভিযানের সফলতার জন্য তা অত্যন্ত জরুরি। কখনো কখনো মানচিত্রের সূত্রে পূর্বনির্ধারিত এলাকায় ঘাঁটি স্থাপনের জন্য গেরিলাদের বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কৌশলগত চাহিদা অনুযায়ী ঘাঁটি নির্ধারণ করা যায় না। এগুলো স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতায় গড়ে তুলতে হয়। ফলে বেশ বড় সংখ্যক গেরিলা হয় ফেরত চলে আসছে এবং অন্য সেক্টরে যোগ দিচ্ছে অথবা পুরোপুরি হতাশ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

গেরিলা অভিযানের ক্ষেত্রে ৮ বা ১০ জনের একটি গেরিলাদলকে দেওয়া হতো দু-একটি পিস্তল এবং কয়েকটি গ্রেনেড। অভিযানের কোনো বিস্তারিত পরিকল্পনা থাকত না বা গেরিলাদের কোনো ব্রিফও করা হতো না। পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও টাকাপয়সা ছাড়াই তাদের অভিযানে পাঠানো হতো। এভাবে এক-আধটা পিস্তল আর কয়েকটি গ্রেনেড দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কী আর হতো? দু-একটা গ্রেনেড নিক্ষেপ করে মুক্তিযুদ্ধকে কত দূর আর নেওয়া যায়? এটি ছিল খুব অপেশাদার একটি কাজ। এভাবে যারা অভিযানে যেত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অ্যাকশনের আগেই ধরা পড়ত, কেউ কেউ ধরা পড়ত ভেতরে

গিয়ে অ্যাকশন চলাকালে। যারা বুদ্ধিমান, তারা কোনো কিছু ব্যবহার না করেই ফিরে আসত। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি গ্রেনেড নিয়ে দেশের ভেতরে এসে দু-একটি জায়গায় আঘাত করে পাকিস্তানি বাহিনীকে কতটুকুই বা বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হবে? তাই দেশের ভেতরে প্রথম দিকে যে গেরিলাদলগুলো পাঠানো হয়েছিল, তার ফলাফল খুব খারাপ হয়েছিল। কয়েকটি গ্রেনেড আর একটি পিস্তল দিয়ে প্রকৃত গেরিলাযুদ্ধের ধারেকাছে যাওয়াও সম্ভব হয়নি। সে জন্য জুন-জুলাই পর্যন্ত যারা দেশের অভ্যন্তরে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই আর ফিরে আসেনি। গেরিলাদলের কয়েকজন নিহত হলে বাকিরা পুনরায় যুদ্ধে যেতে সাহস হারিয়ে ফেলত।

সেক্টর সদর দপ্তর থেকে আমরা জানতে পারি যে দেশের ভেতরে পাঠানো গেরিলাদের অনেকেই তার গ্রেনেডটি প্রকৃত লক্ষ্যবস্তুতে ব্যবহার না করে ভয়ে যেখানে-সেখানে ছুড়েছে বা ফেলে দিয়েছে। গ্রেনেড নিয়ে অথবা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে গিয়ে ১০ জনের ৮ জনই শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। এভাবে অকার্যকর অভিযান বা দলের অধিকাংশ গেরিলার প্রাণহানির সংবাদে আমরা ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ি। গ্রেনেড দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করতে হলে শত্রুর বেশ কাছাকাছি, অর্থাৎ ২০-২৫ গজের মধ্যে পৌঁছাতে হয়। এ ছাড়া গ্রেনেড যথাযথভাবে নিশানায় ফেলার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। দুই-চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণে বা প্রশিক্ষণে দুই-একটা গ্রেনেড ছুড়েই এ ধরনের উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। পেশাগত সৈনিকদেরও এই গুণ অর্জনে বেশ সময় লাগে। অপর পক্ষে এ ধরনের স্বল্পপ্রশিক্ষিত গেরিলাদের জন্য পিস্তলও কার্যকর অস্ত্র ছিল না। পিস্তলও শত্রুর খুব কাছে গিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এই কারণে প্রথম দিকে গ্রেনেড ও পিস্তল নিয়ে অভিযানে পাঠানোর সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। এতে হিতে বিপরীত হয়েছিল। দুর্বল প্রশিক্ষণ এবং গ্রেনেড ও পিস্তল নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার আরেকটি নেতিবাচক দিক আমি লক্ষ করেছি। গেরিলারা তাদের অভিযানের সীমাবদ্ধতা ঢাকার জন্য পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে কার্যকর অভিযান পরিচালনার বদলে নিরীহ সাধারণ মানুষ, যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়নি বা নিরস্ত্র পাকিস্তানপন্থীদের অহেতুক হত্যা করা শুরু করে। এটিকেই তারা সামরিক অভিযান মনে করতে শুরু করে। গেরিলাযুদ্ধের এই ত্রুটি ও গেরিলাদের অহেতুক আত্মদান সম্পর্কে গেরিলাযোদ্ধা এ কাইয়ুম খানের (মুক্তিযুদ্ধকালে কমিশনপ্রাপ্ত এবং পরে মেজর) অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখ করলাম :

> শিবির এবং এর বাসিন্দাদের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ হতে থাকলাম, আমরা আবিষ্কার করলাম যে সদ্য প্রশিক্ষিত বিক্রুটদের ছোট ছোট দলে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষতি সাধনের জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। আমরা তাদের অনেকের সঙ্গে পরিচিত হই। তাদের বেশির ভাগই গ্রামের ছেলে, যারা পিস্তল ও গ্রেনেড বিষয়ে দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তাদের দলে তিন-চারজন সদস্য থাকত এবং তারা প্রত্যেকে দুটো করে গ্রেনেড বহন করত। দলপতির কাছে পিস্তল থাকত। তাদের দায়িত্ব থাকত বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানি শিবির খুঁজে বের করা এবং গ্রেনেড দিয়ে তাতে আক্রমণ পরিচালনা করা। যেইমাত্র তারা তাদের গ্রেনেড ব্যবহার করে ফেলত, তাদের এলাকা পরিত্যাগ করতে হতো। তারা আর কোনো ধরনের লড়াইয়ে জড়াত না। আমরা এ ধরনের শুরুর মুক্তিবাহিনী যোদ্ধাদের সম্পর্কে খুব কম জানি। তাদের বেশির ভাগই হয় মৃত্যুবরণ করত আর না হয় ধরা পড়ত এবং তাদের হত্যা করার আগে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হতো।
>
> *বিটার সুইট ভিক্টরি : আ ফ্রিডম ফাইটার্স টেল*
> এ কাইয়ুম খান, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৫৪-৫৫

মাঝেমধ্যে আমাদের কাছে সংবাদ আসত যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিছু নিম্নপদস্থ কমান্ডারের নির্দেশে কিছুসংখ্যক গেরিলা লুটপাটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় কমান্ডাররা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে গেরিলাদের সেখান থেকে সোনা, মূল্যবান বস্তু, বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে আসার আদেশ দিত। বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, কিছু গেরিলা তাদের কথায় স্বাধীনতাবিরোধী বা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা ব্যক্তিদের কাছ থেকে সরাসরি বা তাদের ব্যবসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থসম্পদ লুট করত। গেরিলারা এসব লুটপাটের অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর সিংহভাগ ভারতীয় কমান্ডারদের হস্তান্তর করত, আর বাকিটা নিজেরা রাখত। এমনকি আমাদের কাছে এ সংবাদও আসত যে গেরিলারা অভিযানের নামে বিভিন্ন জলাশয়ে গ্রেনেড দিয়ে মাছ মারছে। গেরিলাদের এসব অনৈতিক কাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। একদিকে পাকিস্তানিদের নির্যাতন, অপর দিকে গেরিলাদের পীড়ন তাদের বিভ্রান্ত করত। এ বিষয়ে মেজর খালেদ মোশাররফের নিচের মন্তব্যটি লক্ষণীয় :

> অভিযোগ পাওয়া গেছে যে ওই সেক্টরে (চট্টগ্রাম) অতীতের সাধারণ দুর্বলতা ছাড়াও সৈনিকদের দুর্নীতি এবং স্থানীয় উপজাতীয় জনসাধারণের প্রতি বৈরী আচরণ ছিল অবাধ। এগুলি মুক্তিবাহিনী এবং স্থানীয় জনসাধারণের নৈতিকতায় প্রভাব ফেলছে। এ ধরনের সাধারণ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে

চরমপন্থীরা তাদের অবস্থান সুসংহত করছে। এখনই যদি এগুলি প্রতিহত করা না হয়, তবে পরিস্থিতি ভবিষ্যতে খুব কঠিন হয়ে পড়তে পারে। অতীতে দুর্বল পরিচালনার ফলে মতভিন্নতাও দেখা দিয়েছিল।

সদর দপ্তর ২ নম্বর সেক্টর, পত্র নং বিডি/০০২২/জি, তারিখ ৯ আগস্ট ১৯৭১

গেরিলারা যেখানে-সেখানে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনী ওই সব এলাকা বা গ্রামে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং গেরিলা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার আর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ফলে পরবর্তী সময়ে কোনো গেরিলাদল সামান্য গ্রেনেড হাতে গ্রামে প্রবেশ করলেই গ্রামবাসীদের বাধার সম্মুখীন হয়। সেই সময় গেরিলাদের কার্যকলাপে গ্রামবাসী উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে থাকে। গ্রামবাসী প্রথম প্রথম মুক্তিবাহিনীকে যে আশ্রয় ও সাহায্য দিয়েছে, পরে তা কমতে থাকে। কিছু কিছু এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে জনমত গড়ে ওঠে এবং আত্মরক্ষার জন্য তারা বিপরীত দিকে চলে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় জুন-জুলাই মাসে গেরিলারা দেশের ভেতরে খুব বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এ অবস্থা আগস্টের প্রথম পর্যন্ত চলে। এই ঘটনা ঢালাওভাবে দেশের সব জায়গায় হয়েছে তা নয়, বরং কিছু জায়গায় গেরিলাযোদ্ধারা বীরত্বের পরিচয়ও দিয়েছে। যেসব জায়গায় গেরিলারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পেরেছে, সেসব জায়গায় আমরা স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য-সহানুভূতি পেয়েছি।

আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা গেরিলাদের প্রাথমিক দুর্বলতার এই বিষয়গুলো জানতেন। গেরিলাদের এভাবে প্রাণহানি ঘটুক বা চারিত্রিক স্খলন হোক সেটা তাঁরা চাইতেন না। বিভিন্ন সময়ে সেক্টর অধিনায়কদের কাছ থেকে আমি এ ব্যাপারে অনেক অভিযোগ পেয়েছি। গেরিলাদের সঠিকভাবে ব্যবহার না করার বিষয়ে আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা যা বলতেন আমি তা সমর্থন করেছি। ভারতীয় সেক্টর অধিনায়ক বা তাঁদের ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা অভিযানের জন্য গেরিলাদের ভেতরে পাঠাতেন। এই অভিযানগুলো সম্পর্কে আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা অনেক সময় জানতে পারতেন না। অভিযানের পর যখন আমরা খবরগুলো পেতাম, তখন বিশ্লেষণ করে দেখতাম যে অভিযানের কোনো প্রভাব শত্রুর ওপর পড়ছে না; বরং আমাদের জনসাধারণের মধ্যে গেরিলাযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে নেতিবাচক ধারণার জন্ম নিচ্ছে।

গেরিলাদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের অভিযানে নিয়োগের সমস্যা নিয়ে সেক্টর থেকে আমাদের যে সরকারি চিঠি পাঠানো হতো, তা নিজস্ব যোগাযোগব্যবস্থার অভাবে ভারতীয় সেক্টরের মাধ্যমে পাঠাতে হতো। ধারণা করা যায় যে কখনো কখনো ভারতীয়রা আমাদের সেক্টরের চিঠি সেন্সর করত। ফলে কিছু কিছু বিষয়ে ভারতীয় যোগাযোগব্যবস্থা এড়িয়ে আমাদের সেক্টর অধিনায়ক বা সাব-সেক্টর অধিনায়কেরা আধা সরকারি বা ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে প্রধান সেনাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। এখানে গেরিলা প্রশিক্ষণ এবং অভিযান বিষয়ে ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা সাব-সেক্টর থেকে প্রধান সেনাপতির কাছে পাঠানো ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর (বীর বিক্রম, পরে ব্রিগেডিয়ার) গোপনীয় আধা সরকারি চিঠি থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরলাম :

> গ. গত তিন মাসে এই সাব-সেক্টরকে চাকুলিয়ায় গেরিলা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে গণবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণের জন্য কোনো আসন বরাদ্দ করা হয়নি। এই কারণে ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক দীর্ঘ দিন ধরে এই শিবিরে আটকা পড়ে আছে এবং আবাসনের অভাবে নতুন কোনো ব্যক্তিকে ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। সত্যিকার অর্থে অভিযানের জন্য নামমাত্র গণবাহিনীর প্রশিক্ষিত ব্যক্তি মজুত আছে।
>
> ঘ. উপরন্তু যে সমস্ত তরুণ আগে চাকুলিয়া থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে, তাদের [গেরিলাদের] স্থানীয় [ভারতীয়] আর্মি কমান্ডাররা পরিচালনা করছেন, যেহেতু তাঁরা [ভারতীয়] তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ পাননি, তাঁরা এসব সৈনিককে আমার কাছে হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।
>
> জি কোম্পানি ৭ নম্বর সেক্টর, ডিওপত্র নং ১০২/১/XX/জিএস(এসডি)
> তারিখ ১২ আগস্ট ১৯৭১

জুন-জুলাই পর্যন্ত আমাদের নিজস্ব উৎস ও ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য এবং বাংলাদেশে গেরিলা তৎপরতার প্রভাব পর্যালোচনা করে বুঝতে পারি যে গেরিলাদের কাছ থেকে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল, তা তারা পূরণ করতে পারছে না। এসব সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে একটা হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে ওঠে। দেশের ভেতরের মানুষের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছিল, আবার দেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে আসা গেরিলাদের মধ্যেও হতাশা বিরাজ করছিল। তখন আমাদের মনে প্রকটভাবে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়—আমরা কী করছি, আমরা তো শত্রুকে কিছুই করতে পারছি না। বরং এসব করে দেশের মানুষকে আমরা আরও খেপিয়ে তুলছি।

এসব অসামরিক, হতাশাব্যঞ্জক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড গেরিলাদের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে। গেরিলাদের যুদ্ধের মনোবল কমে যেতে থাকে এবং তারা দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। পুরো গেরিলাযুদ্ধ হুমকির সম্মুখীন হয়। অনেক গেরিলা হতাশাগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করে। সামান্য অস্ত্র দিয়ে ভেতরে পাঠানো এবং কিছু কিছু জায়গায় লুটপাটের জন্য ভারতীয় বাহিনী সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল। গেরিলাদের যদি সত্যিকারভাবে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা যেত, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা একটি কার্যকর বাহিনী হতে পারত। কিন্তু ভারতীয়রা সেটা করতে পারেনি। গেরিলাদের যদি প্রথম থেকেই সরাসরি আমাদের নেতৃত্বে দেওয়া হতো, তাহলে গেরিলা অভিযানে তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতি হতো। গেরিলারা আমাদের নেতৃত্বে থাকলে আমরা যে তাদের খুব ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারতাম, তা-ও সঠিক নয়। বরং অভিযানে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যেত যদি বাংলাদেশ ও ভারতীয় সেনা অধিনায়কদের সমন্বয়ে যোদ্ধা নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও অভিযানের বিষয়ে যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতো। গেরিলাদের প্রথম দিকের ব্যর্থতা ঠেকানোর জন্য যৌথভাবে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল। এটা হয়নি বলেই আগে বর্ণিত সমস্যাগুলো মুক্তিযুদ্ধে প্রকট হয়ে উঠেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যাশিত সাফল্য না আসায় আমাদের নিয়মিত বাহিনীর সদস্যসহ অনেকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের জন্ম নেয়। বাংলাদেশের সেক্টর অধিনায়কেরা কিছুই জানেন না অথচ গেরিলারা ভেতরে যাচ্ছে এবং অসহায়ভাবে নিহত হচ্ছে। ফলে গেরিলাযুদ্ধ থিতিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সেক্টর অধিনায়ক, সামরিক কর্মকর্তা এবং সদর দপ্তরের আমরা সবাই নিরাশ, হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি এই ভেবে যে, কেন এরকম হবে। আমরা উপলব্ধি করলাম, এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না বা এভাবে চলা উচিত নয়। এর জন্য একটা সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। আমি নিজেও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে একাধিকবার গেরিলা তৎপরতা-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর আশু সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছি।

গেরিলাযোদ্ধাদের আমাদের নিয়ন্ত্রণে দেওয়ার বিষয়ে শুরু থেকেই ভারতীয় বাহিনীর আপত্তি ছিল। গেরিলাদের আমাদের অধীনে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে আমরা ভারতীয় বাহিনীকে খুব চাপ দিতে থাকি। গেরিলাদের অপরিকল্পিতভাবে ও স্বল্প অস্ত্রে সজ্জিত করে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ এবং ব্যাপক হারে গেরিলাযোদ্ধাদের মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়

বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় সরকারের কাছে জোরালোভাবে উত্থাপন করে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় যে গেরিলাযোদ্ধাদের বাংলাদেশি নেতৃত্বে না দিলে গেরিলা অভিযান সফল হবে না। গেরিলাযোদ্ধাদের ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রাখা, তাদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা যে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত, সে কথাও আমরা তাদের সামনে তুলে ধরি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছেও একাধিকবার এই বিষয়গুলো উত্থাপন করা হয়। এ বিষয়গুলো নিয়ে তিনি বেশ কয়েকবার আমাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, কর্নেল ওসমানী, আমিসহ বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলাম। সেসব সভায় গেরিলাযুদ্ধ ও যুদ্ধবিষয়ক সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছিল। অবশেষে অনেক আলোচনা আর দেনদরবার শেষে সেপ্টেম্বর মাসে গেরিলাযোদ্ধাদের আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের অধীনে দেওয়া হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে গেরিলাযোদ্ধারা আমাদের সেক্টরের নিয়ন্ত্রণে আসার পর সংশ্লিষ্ট সেক্টর অধিনায়কেরা গেরিলাদের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযানের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ ও এর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রদান করতেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ কাজ বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে কেন করা হলো না? আসলে গেরিলাযুদ্ধের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়। সদর দপ্তর থেকে সেক্টর অধিনায়কদের গেরিলাযুদ্ধের বিস্তারিত নির্দেশ প্রদান বাস্তবসম্মত ছিল না। সেক্টর অধিনায়কেরা যুদ্ধের মাঠে থাকেন। তাঁদের এলাকার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁরাই ভালো জানেন। কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে লক্ষ্যবস্তু ঠিক করা বা এর প্রকৃত অবস্থা সদর দপ্তরের জানা সম্ভব ছিল না। তাই গেরিলাযুদ্ধে অধিক কার্যকর ও সন্তোষজনক ফল লাভের জন্যই সেক্টর অধিনায়কদের ওপর অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

গেরিলাযুদ্ধ বিকেন্দ্রীকরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যোগাযোগ সরঞ্জামাদির অভাব। যুদ্ধের সময় সদর দপ্তর থেকে সেক্টর এবং এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরের মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত ছিল না। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে অবস্থানরত ভারতীয় বাহিনীর সেক্টরগুলোর সহায়তা নিতে হতো। আমাদের সদর দপ্তর থেকে মুক্তিবাহিনীর সেক্টরে কোনো সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা নিকটবর্তী ভারতীয় সেক্টরকে অনুরোধ করতাম। তারা তাদের বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে সংবাদটি নির্দিষ্ট সেক্টর বা আমাদের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিত। এভাবে সংবাদ পেতে দেরি হতো, ক্ষেত্রবিশেষে সংবাদটি

পথের মধ্যে হারিয়েও যেত। ফলে যখন যে কাজ করা প্রয়োজন, তখন হয়তো সে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। যুদ্ধের সময় আমাদের এসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য সেক্টর অধিনায়কদের অভিযান পরিচালনায় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা জানতেন তাঁদের কী করা উচিত। তাই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সংকটময় অবস্থায় সেক্টর অধিনায়কেরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও বিবেচনাবোধ দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারতেন।

প্রথম দিকে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে কিছু কিছু নির্দেশ দেওয়া হলেও পরে আমরা সদর দপ্তর থেকে সরাসরি নির্দেশ দিতাম না। সেক্টর অধিনায়কেরা তাঁদের এলাকায় অভিযানের পুরো পরিকল্পনা নিজেরাই করতেন। তবে কখনো কখনো সদর দপ্তর থেকে সেক্টরের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বা আন্ত-সেক্টর সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে দেওয়া হতো। জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সরকারের অধীনে এ যুদ্ধ পরিচালিত হলেও প্রকৃত অর্থে মাঠপর্যায়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন সামরিক ব্যক্তিরা। রাজনৈতিক নেতারা যুদ্ধের কোনো বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপ করেননি। আমার ধারণা, রাজনৈতিক নেতারা মাঠের অধিনায়কদের ওপর আস্থাশীল ছিলেন।

শুরুর দিকে প্রশিক্ষণ শেষে গেরিলারা যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার সময় খুবই স্বল্প পরিমাণে যুদ্ধসরঞ্জাম পেত। ফলে যুদ্ধের ফলাফল আশানুরূপ হতো না। শুরুতে স্বল্প পরিসরে অস্ত্র পাওয়ার কারণ কিছুটা আঁচ করা যায়। হাজার হাজার যুবককে দ্রুত অস্ত্র এবং লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে ভারতীয়দেরও হয়তো সময় লেগেছে। এ ছাড়া তাদের অন্য কোনো পরিকল্পনা বা সীমাবদ্ধতা থেকে থাকতে পারে যা আমরা জানতে পারিনি। কলকাতা, আগরতলাসহ বিভিন্ন সীমান্ত শহরে আমাদের শরণার্থীদের থাকার জন্য তারা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছে ভারতের সাধারণ মানুষও।

এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গোলন্দাজ ও সাঁজোয়াসহ পাঁচটি সামরিক ডিভিশন মোতায়েন করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার পর মে মাসের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ধীরগতিতে সারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা করে। অপর দিকে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়ত

বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে থাকি। যেকোনো যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে কার্যকর নেতৃত্ব ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রসম্ভার পাওয়ার ওপর। আগেই উল্লেখ করেছি যে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর তিন মাস পেরোনোর পরও ভারতীয় বাহিনী বা অন্য কোনো জায়গা থেকে প্রত্যাশিত অস্ত্রশস্ত্র এবং লজিস্টিক না পাওয়ায় যুদ্ধপরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। নিজস্ব বেতারযন্ত্র না থাকায় বাংলাদেশি সেক্টরগুলো সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সেক্টরের মাধ্যমে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। বেতারযন্ত্রের অভাবে যুদ্ধ চলাকালে সেক্টরগুলোর ওপর কেন্দ্রের কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়নি, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেক্টরগুলো কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এ ছাড়া সেক্টরগুলো নিজেদের মধ্যেও সমন্বয় করতে পারছিল না। মুক্তিবাহিনীর জন্য নতুন যোদ্ধা সংগ্রহ, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সেক্টর ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সেক্টরগুলোর যোগাযোগ, লেনদেন ইত্যাদি বিষয় স্বচ্ছ না থাকায় মাঝেমধ্যেই ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছিল। বাংলাদেশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেশের ভেতরে ও ভারতে বেশ কিছু সশস্ত্র দল বা বাহিনী গজিয়ে উঠতে থাকে এবং তাদের তৎপর হতে দেখা যায়। এসব বাহিনী সেক্টরগুলোর সঙ্গে তাদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কোনো সমন্বয় করত না। এদের অনেকে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশও অমান্য করতে থাকে। সব মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দল, সশস্ত্র বাহিনী, অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে অনিশ্চয়তা, শঙ্কা, অবিশ্বাস ইত্যাদি বাড়তে থাকে। সমন্বয় ও নীতিমালার অভাবে আন্ত-সেক্টর সম্পর্কের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা শুরু হয়। মোট কথা, যুদ্ধের প্রথম ৯০ দিন গত হয়ে যাওয়ার পরও আমরা নিজেদের গুছিয়ে উঠতে পারিনি। সবকিছুই কেমন খাপছাড়াভাবে চলছিল, অথচ কারোরই আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বাহিনীর জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের নীতিমালা, বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা ও নেতা নির্ধারণ, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ও অন্যান্য সমরসম্ভার সংগ্রহ, সর্বোপরি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে। এ ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে সেক্টর অধিনায়কদের নিয়ে একটি সম্মেলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিষয়টি জুন মাসের মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, সেক্টর অধিনায়ক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে কলকাতার ৮ থিয়েটার রোডে একটি সম্মেলন আয়োজন করা হবে। সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয় ১১ থেকে ১৫ জুলাই।

সম্মেলনে প্রায় সব সেক্টর অধিনায়ক, জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা এবং সেক্টর-সংশ্লিষ্ট বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম। সম্মেলনে সেক্টরের সীমানা নির্ধারণ, দায়িত্ব বণ্টন, নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী বা গেরিলাবাহিনী গঠন, অস্ত্র ও চিকিৎসাব্যবস্থা এবং আন্ত-সেক্টর যোগাযোগ-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ১১ জুলাই সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও যুদ্ধ পরিষদ বা ওয়ার কাউন্সিল গঠন নিয়ে একটি বিতর্কের ফলে ওই তারিখে সম্মেলন শুরু করা সম্ভব হয়নি। ১১ জুলাইয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথা আমি পরে উল্লেখ করব। ১২ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। ওই দিন মুক্তিবাহিনীর সকল সেক্টর অধিনায়ক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা ও শপথ গ্রহণ করেন। সম্মেলনে বাংলাদেশের ভৌগোলিক এলাকাকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিটি সেক্টরকে একটি ভৌগোলিক সীমানার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। সেক্টরকে রক্ষা করা, কার্যকর রাখা এবং পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সেক্টর অধিনায়কদের।

১০ নম্বর সেক্টর ছিল একটু ব্যতিক্রমী এবং এর কোনো ভৌগোলিক সীমানা ও অধিনায়ক নির্ধারণ করা হয়নি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একটি বিবেচনা ছিল এরকম যে বাংলাদেশের ভেতরে কোনো একটি জায়গা আমরা দখল করে নেব এবং সেটিকে আমাদের দখলে রেখে মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলব। মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন চালু থাকবে। আমরা যদি এ ধরনের মুক্তাঞ্চল গঠন করতে পারি, তবে সেখানে আমাদের সম্ভাব্য রাজধানী স্থাপন করব এবং সেটি ১০ নম্বর সেক্টরের তত্ত্বাবধানে থাকবে। এ ছাড়া মুক্তিবাহিনীর যেসব ইউনিট কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় সীমিত না থেকে দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা করবে, তারাও ১০ নম্বর সেক্টরের আওতায় থাকবে। যেমন, বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ হতো ডিমাপুরে (ভারতের নাগাল্যান্ড প্রদেশে)। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বিমানবাহিনী দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা করবে। এটি ১০ নম্বর সেক্টরের অধীনে থাকবে। নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ হতো মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী নদীর পাশে পলাশীর একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে, আর এর অভিযান চলত দেশজুড়ে। এটাও ১০ নম্বর সেক্টরের অধীনে থাকার কথা ছিল।

অর্থাৎ যেসব বিভাগ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে—যেমন সম্ভাব্য রাজধানী, সামরিক সদর দপ্তর, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, নৌ-কমান্ডো ইত্যাদি—সেগুলো ১০ নম্বর সেক্টরের অধীনে থাকবে। এগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে

কোথাও লিখিত না থাকলেও ১০ নম্বর সেক্টর সম্পর্কে আমরা এই ধারণাটিই পোষণ করতাম। অনেকগুলো কারণে এই মুক্তাঞ্চল বা 'লজমেন্ট এরিয়া' স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত ছিল না। প্রথমেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে এটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী হবে? আমরা যদি মুক্তাঞ্চল গঠন করি তাহলে পাকিস্তান তাদের বিরাট পদাতিক, গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া বাহিনী এবং বিমানবাহিনী নিয়ে এই মুক্তাঞ্চলকে আক্রমণ করবে। এ ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাংলাদেশের ছিল না। আর যদি ভারতকেই আমাদের সাহায্যের জন্য তার সেনা, বিমান আর নৌবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসতে হয়, তবে এটি সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধে রূপ নেবে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে ভারত এ ধরনের পরিস্থিতি কখনোই চাইবে না, উপরন্তু সে সময় ভারত এর জন্য প্রস্তুতও ছিল না। অন্যদিকে এর ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব রাজনৈতিক সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য বৃহত্তর পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্যে হারিয়ে যেত। মুক্তাঞ্চল রক্ষা করার মতো শক্তি, সম্পদ বা অর্থ আমাদের না থাকার কারণে এটি গঠন নিয়ে আলোচনা হলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

সেক্টর অধিনায়কদের সভায় যা আলোচনা হয়েছিল, তা পরে সভার কার্যবিবরণী এবং একাধিক নির্দেশিকা ও নীতিমালার সাহায্যে প্রচার করা হয়। সভায় অনেক বিষয় আলোচনা হলেও সবগুলোকে কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ২৭টি বিষয় কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (সদর দপ্তর বাংলাদেশ বাহিনী, পত্র নং ০০১০জি, তারিখ ৬ আগস্ট ১৯৭১)। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি:

- সেক্টরগুলোর সীমানা নির্ধারণ করা হয়। নির্দেশ দেওয়া হয় যে এক সেক্টর অপর সেক্টর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করবে না।
- অনেকগুলো কোম্পানি নিয়ে একটি সেক্টর গঠিত হবে। সেক্টরের এলাকা ও দায়িত্বের ভিত্তিতে সেক্টরের কোম্পানিসংখ্যা নির্ধারণ করা হবে।
- সেক্টরের দায়িত্ব ও অভিযান-পদ্ধতিগুলো সভায় নির্ধারণ করা হয়।
- মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা বিমান, নৌ, গোলন্দাজ, সিগন্যাল বাহিনীতে কাজ করেছে বা সেসব বিষয়ে পারদর্শী, তাদের তালিকা তৈরি করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এদের দ্বারা ওই সব বাহিনী গঠন করা যায়।
- ইয়ুথ ক্যাম্পের সঙ্গে বাংলাদেশ বাহিনীর কোনো সম্পৃক্ততা থাকবে না। ইয়ুথ ক্যাম্প সরকারের ভিন্ন সংস্থা পরিচালনা করবে।
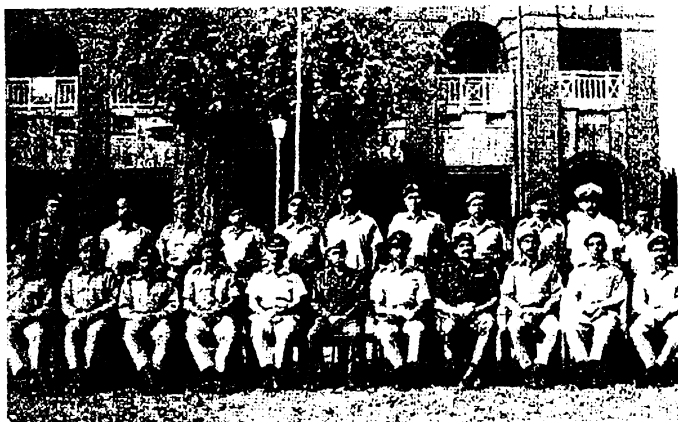
১৯৭১-এর জুলাই মাসে কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলন

- গণবাহিনী বা গেরিলাদের গঠন, কর্মপন্থা, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২৫ জুলাই গণবাহিনীর সংগঠন, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক, রণকৌশল, আত্তীকরণ-সম্বন্ধীয় ১০ পৃষ্ঠার পত্র জারি হয় (সদর দপ্তর, বাংলাদেশ বাহিনী, পত্র নং ০০০৯জি, তারিখ: ২৫ জুলাই ১৯৭১)। এই পত্রে প্রেরিত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাবলির অতিরিক্ত আরও কিছু সিদ্ধান্ত ২৭ ও ৩১ জুলাই পৃথক পত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।
- সদর দপ্তর ও সেক্টরের মধ্যে বেতার যোগাযোগ ভারতীয় সেক্টরের মাধ্যমে রক্ষা করা হবে। ভারতীয় সেক্টর সদর দপ্তর ও বাংলাদেশি সেক্টর সদর দপ্তর এক স্থানে না থাকলে তাদের মধ্যে বেতার যোগাযোগব্যবস্থা থাকবে।
- লজিস্টিকস ও প্রশাসনিক বিষয়গুলোর মধ্যে মুক্তিবাহিনীর বেতন, পোশাক, রেশন, চিকিৎসা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলনে অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলেও সেক্টর অধিনায়ক এবং জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তারা যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে নীতিগত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলন শুরুর আগেই বিভিন্ন সেক্টর অধিনায়ক ও সেনা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে একটা গুঞ্জন ওঠে যে তাঁরা যেভাবে যুদ্ধ চালাতে চান, কর্নেল ওসমানীকে প্রধান

সেনাপতি রেখে সেটা সম্ভব হবে না। যুদ্ধকে গতিশীল করার জন্য সেক্টর অধিনায়কেরা যুদ্ধ পরিষদ বা ওয়ার কাউন্সিল গঠন করার পক্ষে মত দেন। সম্মেলনে সেক্টর অধিনায়কদের পক্ষ থেকে সর্বসম্মতভাবে কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার দাবি ওঠে, শুধু খালেদ মোশাররফ এ বিষয়ে আপত্তি জানান। অধিকাংশ সেক্টর অধিনায়কের যুক্তি ছিল, কর্নেল ওসমানী অত্যন্ত প্রবীণ এবং গেরিলাযুদ্ধের রীতিনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ; এ ছাড়া মতামত গ্রহণ ও প্রদানের ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত অনমনীয়। সেক্টর অধিনায়কেরা তাঁকে দেশরক্ষামন্ত্রীর মতো একটা সম্মানজনক পদে রাখার পক্ষে মত দেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে আমাকে এই যুদ্ধ পরিষদের প্রধান করার প্রস্তাব করা হয়। মেজর খালেদ মোশাররফ এই মতামতের বিরোধিতা করেন। তিনি কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতির পদে রেখে সব সেক্টর অধিনায়ককে নিয়ে যুদ্ধ পরিষদ বা ওয়ার কাউন্সিল গঠন করে তাঁদের হাতে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করার পক্ষে মত দেন। যুদ্ধ পরিষদ বা ওয়ার কাউন্সিলের ধারণাটির সূত্রপাত করেছিলেন মেজর জিয়া এবং অধিকাংশ সেক্টর অধিনায়কের কাছে প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। কর্নেল ওসমানী বিষয়টি জানামাত্র প্রধান সেনাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা বলে আবেগের পরিচয় দেন ও রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেন।

মেজর জিয়াসহ অধিকাংশ সামরিক কর্মকর্তা যুদ্ধ পরিষদের প্রধান হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করায় আমি বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যাই। কর্নেল ওসমানীকে আমি কোনোভাবেই খাটো করতে চাইনি। সত্যিকার অর্থে সেই সময় আমি বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কোনো চিন্তাও করিনি। আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল, যেকোনো মূল্যে যুদ্ধ শেষ করে স্বাধীনতা অর্জন করা। যুদ্ধ পরিষদ গঠন করার ব্যাপারে জিয়াউর রহমান ও খালেদ মোশাররফের অবস্থান ছিল বিপরীতমুখী। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ বিশ্বাস থেকেই এটা করেছিলেন। মেজর জিয়াসহ বেশির ভাগ সেক্টর অধিনায়কই চেয়েছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধে গতিশীলতার জন্য আমাকে প্রধান করে একটা যুদ্ধ পরিষদ গঠন করা হোক। এ ব্যাপারে তাঁরা বেশ সোচ্চার ছিলেন। বিপরীতে খালেদ মোশাররফও সোচ্চার ছিলেন কর্নেল ওসমানীর পক্ষে। কর্নেল ওসমানী নিজেও যুদ্ধ পরিষদের ধারণাকে সমর্থন করেননি। তাজউদ্দীন সাহেবও আমাকে যুদ্ধ কাউন্সিলের প্রধান করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি পরে আমাকে জানিয়েছিলেন

যে সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য আমাকে প্রধান করার বিষয়ে বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, বিমানবাহিনীর লোক কীভাবে যুদ্ধ কাউন্সিলের প্রধান হবেন? সেনাবাহিনীর প্রধান ছাড়া আর কোনো যোগ্য ব্যক্তি যুদ্ধের প্রধান অথবা গেরিলা প্রধান অথবা যুদ্ধ কাউন্সিলের প্রধান হতে পারবেন না, বিষয়টি আমার কাছে খুব গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। পদাতিক বা সামরিক বাহিনীর না হয়েও নিয়মিত বাহিনী অথবা গেরিলাযুদ্ধের প্রধান হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আছে। যেমন ইংল্যান্ডে প্রতিবছর তিন বাহিনীর সমন্বয়ে যে কাউন্সিল গঠিত হয় সেখানে পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধানগণ কাউন্সিলের প্রধান হয়ে থাকেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে জেনারেল গিয়াব সামরিক বাহিনীর সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও গেরিলাযুদ্ধের প্রধান হয়েছিলেন। ওই সময় এই ঘটনা সেনাবাহিনীর উচ্চস্তরে একটি অসন্তোষের সৃষ্টি করলেও তা মাঠপর্যায়ে যুদ্ধের ওপর প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলেনি।

সেক্টর অধিনায়ক ও অন্য সামরিক কর্মকর্তাদের প্রস্তাবিত যুদ্ধ পরিষদের ধারণায় কর্নেল ওসমানী ক্ষুব্ধ হয়ে সম্মেলনের প্রথম দিনে মৌখিকভাবে পদত্যাগ করার কথা বলেন। যুদ্ধ চলাকালে তিনি অবশ্য বেশ কয়েকবার পদত্যাগের হুমকি দেন, যদিও লিখিতভাবে তিনি কখনো পদত্যাগপত্র দেননি। কর্নেল ওসমানীর পদত্যাগের হুমকিতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয়েছিল, যুদ্ধের সংকটময় অবস্থায় মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদত্যাগ করলে মুক্তিযুদ্ধের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তাজউদ্দীন আহমদ কর্নেল ওসমানীকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পদত্যাগ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হন। এভাবেই সম্মেলনের প্রথম দিনটি যুদ্ধ পরিষদ বিতর্ক, প্রধান সেনাপতির পদত্যাগ, মান-অভিমান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চলে যায়। ফলে ১১ জুলাই সেক্টর অধিনায়কেরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি। প্রকৃত অর্থে সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১২ জুলাই। সেদিন সকালে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সম্মেলনে একটি আবেগময় বক্তৃতা দেন। এ বক্তৃতায় তিনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান জানান। যুদ্ধ পরিষদ বিষয়টি পরে সম্মেলনে আর আলোচিত হয়নি। কর্নেল ওসমানীও প্রধান সেনাপতির পদ থেকে আর পদত্যাগ করেননি।

তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণের পর সভার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং বাকি সময় সম্মেলন ঠিকমতো চলে। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত

হয় যে গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যখন পাকিস্তানি বাহিনীকে দুর্বল করে ফেলব এবং দেশ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে, তখন সম্মুখসমরের প্রয়োজন হতে পারে। সেই সময়ে শত্রুকে মোকাবিলা করার জন্য ব্রিগেডের প্রয়োজন হবে। এই ব্রিগেডগুলো শুধু সম্মুখসমরের জন্যই নয়, বরং এগুলোর ওপর ভিত্তি করে স্বাধীন দেশের নতুন সেনাবাহিনী গড়ে উঠবে। তাই এই সম্মেলনের শেষের দিকে কর্নেল ওসমানী ঠিক করলেন যে গেরিলাযুদ্ধের পাশাপাশি প্রথাগত যুদ্ধের জন্য ব্রিগেড গঠন করা হবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় গেরিলাযুদ্ধের মতো একটি প্রতিষ্ঠিত কৌশলকে পাশ কাটিয়ে কর্নেল ওসমানীর ব্রিগেড গঠন করার সিদ্ধান্তটি সুবিবেচনাপ্রসূত বা বাস্তবসম্মত ছিল না। একটি শক্তিশালী ব্রিগেড গঠন করার জন্য অনেক দক্ষ সেনা, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ এবং প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের সেই সময়ে ব্রিগেড গঠনের মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল, অস্ত্র ও রসদ ছিল না। ভারতও মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করতে পারছিল না। আমাদের স্বল্প সম্পদ ও লোকবল দিয়ে ব্রিগেড গঠন কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। আমাদের উচিত ছিল গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুকে দুর্বল করার পর অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। জুলাইয়ের সম্মেলনেই মেজর জিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রথম ব্রিগেড বা 'জেড ফোর্স' গঠন করে তাঁকে এই ফোর্সের কমান্ডার করা হয়। জেড ফোর্স নামটি জিয়াউর রহমানের নামের আদ্যক্ষর 'জেড' থেকে নেওয়া। সাধারণত ব্রিগেডের এ ধরনের নাম হয় না, বরং নম্বর হয়। কিন্তু ওসমানী সাহেব জেড ফোর্স নাম দিয়ে এটিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে আসেন। তাঁর এই পদক্ষেপ আমার পছন্দ হয়নি। তবে এ ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করিনি।

তেলিয়াপাড়ার সভায় কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করার সিদ্ধান্ত জুলাইয়ের সম্মেলনেও বহাল রাখা হয়। সম্মেলনে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আবদুর রবকে চিফ অব স্টাফ বা প্রধান সেনাপতির মুখ্য সহকারী নির্বাচন করা হয়। চিফ অব স্টাফের কাজ হচ্ছে সেনাবাহিনীর অভিযান, প্রশিক্ষণ, প্রশাসনসহ সব বিষয়ে প্রধান সেনাপতিকে পরামর্শ দেওয়া এবং প্রধান সেনাপতি গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা। জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকেই কর্নেল ওসমানীর নির্দেশে আমি মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। জুলাই মাসের সম্মেলনে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়। একজন চাকুরিরত জ্যেষ্ঠ সামরিক

কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাকে এভাবে চিফ অব স্টাফ নিয়োগ দেওয়াটা সঠিক ছিল বলে আমি মনে করি না। এটি সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠিত চর্চার ব্যতিক্রম ছিল। আমি কর্নেল ওসমানীকে বলেছিলাম, 'স্যার, পদমর্যাদায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুর রব আমার কনিষ্ঠ, তবু তাকে স্যালুট বা সম্মান প্রদর্শনে আমার কোনো সমস্যা নেই। আমি সবকিছু ফেলে পদ ও পদবির জন্য এখানে আসিনি। আমি দেশের জন্য যুদ্ধ করতে এসেছি।'

কলকাতার থিয়েটার রোডে আমি তাজউদ্দীন সাহেবের পাশের রুমে থাকতাম। বারান্দায় দেখলে অনেক সময় আমাকে তিনি ডেকে নিয়ে রুমে বসাতেন; যুদ্ধের নানা বিষয় ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাজউদ্দীন সাহেব নিজেই একদিন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন, 'খন্দকার সাহেব, আমি আপনাকে চিফ অব আর্মি স্টাফ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তা করতে পারিনি, কারণ আমাকে বলা হয় যে এ বিষয়ে সেনাসদস্যদের কয়েকজন বিরোধিতা করতে পারে।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুর রব খুব ভদ্র ও সুন্দর মনের মানুষ ছিলেন। তিনি আমার কনিষ্ঠ পদবির ছিলেন। শুধু আওয়ামী লীগের এমএনএ হওয়ার কারণে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে উচ্চপদ দেওয়া হয়। রব সাহেব নিজে তাঁর দুর্বলতা স্বীকার করে আমার কাছে বলেছিলেন যে তিনি এই সব যুদ্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ নন এবং কোনো অভিযানও পরিচালনা করেননি। তিনি খোলামেলাভাবেই আমাকে এই সব কথা বলেছিলেন। কর্নেল রব সাপ্লাই কোরে (আর্মি সার্ভিসেস কোর) দীর্ঘদিন কাজ করেন, তাই অপারেশনাল কোনো বিষয়ে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। রব সাহেব যুদ্ধের শুরু থেকেই আগরতলায় অবস্থান করছিলেন। চিফ অব স্টাফ হিসেবে তাঁকে আমি কখনো থিয়েটার রোডে দায়িত্ব পালন করতে দেখিনি। সদর দপ্তরে না থাকায় প্রধান সেনাপতিকে তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কোনো পরামর্শ দেওয়ার সুযোগই পাননি। চিফ অব স্টাফের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়েও তাঁকে কেন সার্বক্ষণিকভাবে আগরতলায় রাখা হয়েছিল, তা-ও আমার বোধগম্য হয়নি। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশ বাহিনীর চিফ অব স্টাফের সব দায়িত্ব যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত আমাকেই পালন করতে হয়।

আমি একজন মোটামুটি অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসেবেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার আগেও আমি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। যুদ্ধে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে বোমা ফেলেছি, মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ করেছি।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমি যুদ্ধের ময়দানে ছিলাম। যুদ্ধের সময় বৈমানিকদের দুই ঘণ্টা পরপর ককপিটে বসে থাকতে হয়। শত্রুবিমান এলে সে যেন দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধবিমান নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। এভাবে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমানের ককপিটে বসে কাটিয়েছি। তাছাড়া বিমানবাহিনীতে যে প্রশিক্ষণ হয় তা প্রকৃত যুদ্ধের মতো। যেমন, প্রশিক্ষণকালে যুদ্ধের সব সরঞ্জামসহ বিমান নিয়ে উড্ডয়ন করতাম। এরপর লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে আক্রমণ করতাম। ফিরে আসার পর অভিযানের সবদিক পর্যবেক্ষণ মনিটরে নিরীক্ষা করা হতো। সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছি কি না অথবা লক্ষ্যবস্তু থেকে কত দূরত্বে আঘাত হেনেছি—এসব পর্যবেক্ষণ করে দেখা হতো। দিনের পর দিন আমাদের এই ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে হতো। যুদ্ধের সময় ওই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করা হতো। যুদ্ধ যেকোনো সময় সংঘটিত হতে পারে, তখন আর প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় থাকে না। তাই সামগ্রিকভাবে বৈমানিকের প্রশিক্ষণ যুদ্ধের সমতুল্য ছিল। এ ছাড়া সমগ্র পাকিস্তানে বাঙালিদের মধ্যে মাত্র দুজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন ছিল। একজন আমি এবং অন্যজন পাকিস্তানে অবস্থানরত এম জি তাওয়াব।

মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল ওসমানী ও চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ রব সেনা কর্মকর্তা হলেও দুজনই ছিলেন রাজনৈতিক তথা আওয়ামী লীগের নেতা ও এমএনএ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে তাঁদের অধীন আমার দায়িত্ব পালনে কোনো অসুবিধা বা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়নি। তবে যুদ্ধ চলাকালে আমার কাজে যতখানি স্বাধীনতা থাকা দরকার ছিল, কর্নেল ওসমানী ঠিক ততটা স্বাধীনতা শুধু আমাকে নয়, অনেককেই দিতেন না। যেমন, আমি হয়তো কোনো সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড পরিদর্শনে গিয়েছি, পরিদর্শন শেষ করার আগেই তিনি চলে আসার জন্য টেলিগ্রাম পাঠাতেন। আমি যে কিছু দেখব, যোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলব, তাদের সুবিধা-অসুবিধা বোঝার চেষ্টা করব, সে সুযোগ পেতাম না। আবার হয়তো বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ দেখতে ডিমাপুরে গেছি বা তাদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ বিমানে ফ্লাই করছি, ঠিক এই সময় তিনি সংবাদ পাঠাতেন, 'তোমার জরুরি প্রয়োজন, তুমি ইমিডিয়েটলি চলে আসো।' ফেরত এসে দেখতাম বিশেষ কোনো কাজ নেই। এভাবে আমার বা আমাদের কাজ বাধাগ্রস্ত হতো।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডের সদর দপ্তর ছিল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। আমার জানামতে, কর্নেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধান

সেনাপতি হিসেবে ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়েছিলেন মাত্র একবার। আমাকে কিন্তু বেশ কয়েকবার সেখানে যেতে হয়েছে। ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন, তাই তাঁরা আলোচনার জন্য সেখানে আমাকে ডেকে নিতেন। তাজউদ্দীন সাহেবও ফোর্ট উইলিয়ামে যাওয়া ও ভারতীয়দের সঙ্গে সমন্বয় বিষয়ে আমাকেই বলতেন। তাজউদ্দীন সাহেবের পরামর্শে বা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আহ্বানে আলোচনার জন্য হয়তো আমি রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় কর্নেল ওসমানী বলতেন, 'তুমি যেয়ো না। তোমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।' তিনি নিজেও গেলেন না বা যেতে চাইলেন না, আবার আমাকেও যেতে দিলেন না। তিনি প্রায় পুরোটা সময়ই থিয়েটার রোডে তাঁর অফিসঘরের ভেতর বসে থাকতেন। ফলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সমন্বয় সাধনে যথেষ্ট বেগ পেতে হতো। যুদ্ধের পুরোটা সময়ই এ ধরনের সমস্যা হয়েছে। আমার ধারণা, তিনি কিছুটা আস্থাহীনতায় ভুগতেন অথবা তাঁর পদ, পদবি ও জ্যেষ্ঠতা বিষয়ে তিনি অতিরিক্ত সচেতন ছিলেন।

আমার অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার ওপর আস্থা রেখে বলতে পারি যে যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ বাহিনীর সঠিক নেতৃত্ব নির্ধারণে সক্ষম হয়নি। প্রথমত, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল এমন একজনকে যাঁর গেরিলাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে কিংবা একজন কমবয়সী সেনা কর্মকর্তাকে যিনি গেরিলাযুদ্ধের জন্য পেশাগতভাবে উপযুক্ত। সরকার তা না করে সশস্ত্র বাহিনীতে একটি রাজনৈতিক নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়। কর্নেল ওসমানী ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ রব দুজনই ছিলেন বয়স্ক এবং গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনার মতো যোগ্যতা ও মানসিকতা তাঁদের ছিল না। এঁদের সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া মোটেই সমীচীন হয়নি। এটাও একটা কারণ, যার জন্য সেক্টর অধিনায়কেরা বাংলাদেশ বাহিনী সদর দপ্তর বা কর্নেল ওসমানীর ওপর খুব একটা আস্থা রাখতে পারতেন না। যুদ্ধরত একটি বাহিনী যদি প্রথম থেকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব না পায়, তাহলে যুদ্ধের ময়দানে সুফল পাওয়া দুরূহ হয়ে যায়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র ছিল না। কখনো এটি গেরিলাযুদ্ধের রূপ নিয়েছে, কখনো আবার রূপ নিয়েছে প্রথাগত যুদ্ধের। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল যে আমরা কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করি। প্রাথমিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে কোনো

রাজনৈতিক নির্দেশনা ছিল না। খুব উচ্চপর্যায়ের ছিল না মুক্তিযোদ্ধাদের প্রণোদনাও। আমাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ নির্ভর করত অন্যের ওপর। যুদ্ধের জন্য যে ধরনের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল আমাদের তা ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের একটি মূলধারা থাকলেও অনেকগুলো উপধারা বা বাহিনী ছিল, যারা সব সময় একে অপরের সম্পূরক না হয়ে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার পরও বলব, দেশের আপামর জনগণের ইচ্ছা, সক্রিয় সহযোগিতা আর অকাতরে প্রাণদান মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্তভাবে সফল করে তুলেছে।

এদিকে সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও মেজর খালেদ মোশাররফ কলকাতায় থেকে যান। তিনি ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন এবং তাঁর সেক্টর এলাকাটি তুলনামূলকভাবে বেশ বড় ছিল। বড় হওয়ার কারণে তাঁর এলাকায় কর্মকাণ্ডও অনেক বেশি হতো। সেখানে সেক্টর অধিনায়ক হিসেবে তাঁর উপস্থিতির খুব প্রয়োজন ছিল। আমি এ ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে কথা বলি এবং তাঁকে জানাই যে খালেদ মোশাররফের দ্রুত তাঁর সেক্টর এলাকায় যাওয়া উচিত। খালেদ মোশাররফ সেই সময় দুই-তিন সপ্তাহ কলকাতায় থেকে যান এবং তাঁর নামে অপর একটি ব্রিগেড গঠনের চেষ্টা চালাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত কর্নেল ওসমানী ২ নম্বর সেক্টরেও একটি ব্রিগেড গঠনে সম্মত হন, যার নাম দেওয়া হয় 'কে ফোর্স'। কর্নেল ওসমানী একই সঙ্গে উপলব্ধি করেন যে খালেদ মোশাররফের নামে কে ফোর্স গঠন করলে মেজর কে এম সফিউল্লাহ বিষয়টিকে সহজভাবে নেবেন না। কারণ, মেজর সফিউল্লাহ খালেদ মোশাররফের চেয়ে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাই সফিউল্লাহর নামেও একটি ব্রিগেড অর্থাৎ 'এস ফোর্স' গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। ব্রিগেড দুটো গঠনের বিষয়ে সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলনে কোনো আলোচনা হয়নি বা হওয়ার সুযোগ ছিল না। এ সিদ্ধান্তগুলো সম্মেলনের পর কর্নেল ওসমানী নিজেই নিয়েছিলেন। ব্রিগেডগুলোর নামকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্তও ছিল কর্নেল ওসমানীর।

সদর দপ্তরে যোগ দেওয়ার পর আমাকে প্রধানত বাংলাদেশ বাহিনীর অপারেশন এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তা ছাড়া মুক্তিবাহিনীর রিক্রুটমেন্ট, প্রশিক্ষণ শেষে তাদের বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো ও তাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করার বিষয়টিও আমাকে দেখতে হতো। চিকিৎসা ও ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর কখনো মিত্রবাহিনীর সম্পদ থেকে কখনো নিজস্ব সম্পদ

থেকে ব্যবস্থা নিত। আমি এসবের মূল সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতাম। প্রশিক্ষণের বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে প্রশিক্ষণ কাদের দেওয়া হবে, কতজনকে দেওয়া হবে, কখন থেকে দেওয়া হবে, সেটা ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক নেতৃত্বই এ সিদ্ধান্ত নিতেন। প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। আমরা সেখানে খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারতাম না। মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযানের ব্যাপারেও বেশ কিছু দুর্বলতা ছিল। যুদ্ধ করতে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার দরকার হয় এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। প্রথম দিকের অভিযানগুলো ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকায় খুব একটা ভালো ফল পাওয়া যায়নি। পরে আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা কিছুটা তৎপর হলেও সদর দপ্তরে সার্বিক কোনো যুদ্ধ পরিকল্পনা না থাকায় এসব তৎপরতা থেকে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। লক্ষ করতাম যে সরকার ও বাংলাদেশ বাহিনীর মধ্যে, বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরের অভ্যন্তরে, বাংলাদেশ বাহিনী ও সেক্টরের মধ্যে বা সেক্টরগুলোর নিজেদের মধ্যে সমন্বিত সিদ্ধান্ত কমই নেওয়া হতো। সেক্টরগুলোর সঙ্গে সদর দপ্তরের কোনো যোগাযোগ ছিল না। কোনো বেতারযন্ত্র বা সে রকম যোগাযোগব্যবস্থা চালু ছিল না। যুদ্ধে কী ধরনের অগ্রগতি হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না মন্ত্রিপরিষদেরও।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে আমি হয়তো কারও নিন্দা করছি। প্রকৃত অর্থে আমার লেখায় কিছুটা সমালোচনাসূচক কথা এসেই যাচ্ছে। কিন্তু আমি কাউকে শুধু নিন্দা করার স্বার্থে নিন্দা করছি না। আমি যা-ই বলছি তা সত্য ও বাস্তব। জুলাইয়ের সম্মেলনের পর খালেদ মোশাররফের চাপে অথবা কর্নেল ওসমানীর দুর্বলতার কারণে দুটি ব্রিগেড গঠন করা হলো। তাঁরা উপলব্ধি করলেন না যে লোকবল নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই, কী দিয়ে ব্রিগেডগুলো গঠিত হবে? সেই সময় ব্রিগেড গঠনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। এ কথা কর্নেল ওসমানীকে বলতে আমি দ্বিধা করিনি। জেড ফোর্স, এস ফোর্স ও কে ফোর্স গঠন করে যুদ্ধে লোকবলের অপচয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এসব ব্রিগেড যুদ্ধে তেমন একটা ব্যবহৃত হয়নি। ব্রিগেড গঠনের ফলে ভালো যোদ্ধা ও ভারী অস্ত্রগুলো সেক্টর থেকে চলে গেলে সেক্টরে জনবল ও অস্ত্রের ঘাটতি পড়ে যায় আর গেরিলাযুদ্ধের গতিও সাংঘাতিকভাবে কমে যায়। সেক্টর থেকে প্রশিক্ষিত সৈনিকদের ব্রিগেডগুলোতে বদলি করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, তা সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তৈরি পজিশন পেপারে উল্লেখ করা হয় এভাবে :

> প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ মে, জুন ও জুলাই মাসের একাংশে সেক্টরের সৈনিকেরা যুক্তিসংগতভাবে ভালোমতো সক্রিয় ছিল। যাহোক, ব্রিগেড গঠনের জন্য সেক্টরের সবচেয়ে ভালো ইপিআর, মুজাহিদ ও আনসারদের নিয়ে যাওয়ায় সেক্টরগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাদের কার্যকারিতা কমে গেছে। সেক্টর এখন যে পরিমাণে অভিযান পরিচালনা করছে তা আগের থেকে অনেক কম এবং ফলপ্রসূও হচ্ছে স্বল্প মাত্রায়।

অস্ত্র ও দক্ষ সেনাবাহিনীর অভাবে আমাদের যুদ্ধ যেখানে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল, তখন আমরা ব্রিগেড গঠন করে কী করব? আমাদের সব কটি ব্রিগেড মিলে প্রশিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং অভিজ্ঞ পাকিস্তানি বাহিনীকে কতটুকু প্রতিরোধ করতে পারত? এই ব্রিগেড গঠনের সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য ছিল অন্তর্ঘাততুল্য। আমি তখন কর্নেল ওসমানীকে বলেছি, 'স্যার, আমি আপনার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ব্রিগেড গঠন করলে আমাদের যুদ্ধাস্ত্র ও লোকবলের অপচয় হবে। তা ছাড়া স্বল্প সময়ে একটি কার্যকর ব্রিগেড গঠন করা শুধু অসম্ভবই নয়, অবাস্তবও। পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনীর কয়েকজন সেপাই নিয়ে আপনি কত দিন প্রশিক্ষণ করবেন? কত দিনে আপনি ওদের সম্মুখযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করবেন? স্মরণ রাখা উচিত, আমরা একটি দক্ষ ও আধুনিক অস্ত্রসংবলিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছি।'

একটা ব্রিগেড গঠন করতে যেরকম যুদ্ধসামগ্রী, দক্ষ সৈন্য, প্রশিক্ষণ এবং সময় লাগে আমাদের তা ছিল না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, বাংলাদেশ যদি এই প্রক্রিয়ায় ধীরগতিতে সৈন্য জোগাড় করে সেনাবাহিনী গঠন করে এবং তারপর যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করে, তবে ভারত হয়তো মাসের পর মাস অপেক্ষা না-ও করতে পারে। কর্নেল ওসমানীর সিদ্ধান্তে আমার বিরোধিতার জন্য তিনি ভাবতেন যে আমি বোধ হয় ভারতীয়দের পক্ষে কথা বলছি। আসলে তা মোটেই সঠিক ছিল না। আমি বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে আমরা এখানে খেলা করতে বা সময় অপচয় করতে আসিনি। আমরা এসেছি আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা সমাধান করতে এবং সেটা করতে হবে যতটা সম্ভব কম সময়ে। ব্রিগেড গঠন ও প্রথাগত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিষয়টি যে সঠিক ছিল না তা অক্টোবর মাসের অপারেশন প্লানে মূল্যায়ন করা হয়:

> এই যুদ্ধে আমরা মুখোমুখি হয়েছি এমন এক শত্রুর, যারা খুব ভালোভাবে প্রশিক্ষিত, সুসজ্জিত ও শক্তিধর। প্রথাগত যুদ্ধে শত্রুকে ধ্বংস করতে

আমাদের ১৫ ডিভিশন সৈন্যের প্রয়োজন হবে। এটা অবাস্তব এবং অধিক বিবেচনার দরকার নেই। তাই, প্রাথমিকভাবে অপ্রচলিত যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধের রণনীতি হওয়া প্রয়োজন। এই কারণে গেরিলা অভিযানকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণত গেরিলা অভিযান শুরু হয় স্বল্পসংখ্যক একনিষ্ঠ, নিবেদিত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। স্পষ্ট কারণে আমাদের স্বল্প সময়ের মধ্যে এই যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে। তাই আমাদের ক্ষেত্রে, গেরিলা আর নেতৃত্ব আমাদের বরণ করে নিতে হবে।

বিটার সুইট ভিক্টরি: আ ফ্রিডম ফাইটার্স টেল
এ কাইয়ুম খান, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ২৪৩

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যখন বিদ্রোহ করে দেশ ছেড়ে আসে, তখন তাদের জনবল অনেক কম ছিল। অনেকে আসতে পারেনি, অনেকে হতাহত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সময় প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের জনবল ছিল প্রায় ৩০০ আর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের জনবল ছিল ৩৫০। অন্য তিনটি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থা এর চেয়ে খুব ভালো ছিল না। এ ছাড়া ব্যাটালিয়নগুলো তাদের ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলোও সঙ্গে আনতে পারেনি। তখন ব্যাটালিয়নগুলোর যে সামরিক শক্তি ছিল, তা দিয়ে তিনটি ব্রিগেড তো দূরের কথা, একটি ব্রিগেডও গঠন করা সম্ভব ছিল না। একটি ব্রিগেড গঠন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হয় প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা, সৈনিক ও অন্যান্য জনবলের। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব থাকলে নতুন জনবলকে প্রশিক্ষিত করতে হবে। আর এর জন্য সময় লাগে। লোকবলের অভাবে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য দিয়ে নতুন ব্রিগেডগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন ব্রিগেডের এই এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের মধ্যে সেনাবাহিনীর সৈন্যরা ছাড়া আনসার, মুজাহিদ, ইপিআর, সিভিল ডিফেন্স ও পুলিশের লোকও ছিল। বিভিন্ন বাহিনী থেকে বিভিন্ন মানের সৈনিকেরা প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে একই পর্যায় বা স্তরের ছিল না বলে ব্রিগেডগুলো তাদের অভিযানে কার্যকর ফল লাভ করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে এই অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের মূল্য দিতে হয়েছে। যে সৈনিকদের নিয়ে ব্রিগেড গঠন করা হয়, তারা ব্রিগেড গঠনের আগে সেক্টর পরিচালিত গেরিলাযুদ্ধে নেতৃত্ব দিত বা অংশ নিত। তারা গেরিলাযুদ্ধ থেকে চলে আসার পর গেরিলাযুদ্ধ স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেক্টর থেকে চলে আসার আগে এসব প্রশিক্ষিত সৈনিক গেরিলাযুদ্ধে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। সেক্টর থেকে তাদের এভাবে সরিয়ে ব্রিগেড গঠন করার ফলে

আমরা গেরিলাযুদ্ধে পিছিয়ে পড়ি এবং গেরিলাযুদ্ধে আমাদের সাফল্য ব্যাহত হয়। 'এস' ও 'কে' ফোর্স গঠনের জন্য তিনটি নতুন পদাতিক ইউনিট যথা নবম, দশম ও একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হয়। এই তিনটি ব্যাটালিয়ন গঠনের জন্য যে সরকারি আদেশ প্রকাশ করা হয়েছিল, সেখানে এই ইউনিটগুলোর জনবল কীভাবে সংগ্রহ করা হবে তা উল্লেখ করা হয়। আমি আদেশের সেই অংশটি তুলে ধরলাম। এটি পাঠ করলে কারও বুঝতে অসুবিধা হবে না যে এই ফোর্সগুলো সৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধের কতটুকু লাভ বা ক্ষতি হয়েছিল।

> সৈনিকের সংস্থান
>
> জেসিও এবং এনসিও (সম্ভাবনাময় এনসিওসহ)
>
> দ্বিতীয় ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল এবং ১ থেকে ৩ নম্বর সেক্টরের সৈনিকদের মধ্য থেকে (১ নম্বর সেক্টর থেকে সবচেয়ে কম) জেসিও এবং এনসিওর চাহিদা পূরণ করতে হবে। সংগ্রহের ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ বর্তমান পদে অধিষ্ঠিতদের মধ্য থেকে এবং গঠিতব্য ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের সঙ্গে আলোচনা করে পদের জন্য যোগ্যদের মধ্য থেকে বাকি শতকরা ৭০ ভাগ নির্বাচিত করতে হবে।
>
> সেপাই
>
> ২৫% সৈনিক গ্রহণ করতে হবে দ্বিতীয় ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রশিক্ষিত সৈনিকদের মধ্য থেকে। এতে সমানুপাতিক হারে প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞরাও থাকবে। বাড়তি ৭৫% পূরণ করা হবে প্রশিক্ষিত নবীন সৈনিক দ্বারা, যাদের অতি শীঘ্রই ভর্তি করা হবে (নিচের উপ-অনুচ্ছেদ জি লক্ষ করুন [এখানে উল্লেখ করা হয়নি]) গঠিতব্য ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের সঙ্গে আলোচনা করে [নবীন সৈনিক] নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

বাংলাদেশ বাহিনী সদর দপ্তর, পত্র নং ০০০২জি, তারিখ ২৩ আগস্ট ১৯৭১

ব্রিগেডগুলো মুক্তিযুদ্ধকালে প্রথাগত যুদ্ধ করেনি, যদিও তাদের সৃষ্টি হয়েছিল সে কারণেই। ব্রিগেডগুলোতে নতুন ও পুরোনো ইউনিট ছিল আটটি। এগুলোর বেশির ভাগই ইউনিট হিসেবে যুদ্ধ করেনি। যে দু-তিনটি ইউনিট যুদ্ধ করেছিল, তাদের সাফল্যও খুব একটা উল্লেখযোগ্য ছিল না। বরং প্রথাগত যুদ্ধ করতে গিয়ে তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথাগত যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ায় আমাদের কী ক্ষতি হয়েছিল, তার একটি বর্ণনা দিলাম।

৩১ জুলাই জেড ফোর্স প্রথম বর্তমান জামালপুর জেলার কামালপুর বিওপি আক্রমণ করে। আক্রমণে অংশ নেয় জেড ফোর্সের অধীন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল

রেজিমেন্ট। এই আক্রমণে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সফল হয়নি। উল্টো তাদের বহু সৈনিক শহীদ হয়। ওসমানী সাহেব যুদ্ধের ফলাফলে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হন। তিনি জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়াকে ব্রিগেড থেকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে শান্ত করি। মনে করলাম যে আমাদের সেনা সংগঠনটি ছোট হলেও বাংলাদেশের ভেতরে এর একটি ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। এখনই যদি আমরা এই ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বকে অপসারণ করতে শুরু করি তাহলে আমাদের ভেতর ভুল-বোঝাবুঝি ও হতাশার সৃষ্টি হবে। দেশের মানুষ ভাবতে আরম্ভ করবে যে এরা কী যুদ্ধ করবে? এরা তো নিজেদের মধ্যে রেষারেষি শুরু করেছে। এ ছাড়া ব্রিগেড গঠন ও প্রথাগত বা কনভেনশনাল লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ তো কর্নেল ওসমানীরই পরিকল্পনা ছিল। মেজর জিয়া তো শুধু সেটি কার্যকর করতে গিয়েছিলেন। ব্যর্থতার দায়ভার তো কর্নেল ওসমানীকেও নিতে হবে। যাহোক, পরে মেজর জিয়াকে সতর্ক করে দেওয়া ছাড়া তিনি আর কোনো পদক্ষেপ নেননি।

কামালপুর বিওপি ছিল শত্রুর একটি শক্ত ঘাঁটি। সেখানে এক কোম্পানির অধিক সৈন্য সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা নিয়ে অবস্থান করছিল। এ ছাড়া তাদের সহযোগিতা দেওয়ার জন্য বকশীগঞ্জে আরও সৈন্য ছিল। এ ধরনের অবস্থানে শত্রুকে আক্রমণ করতে হলে একই মানের তিন গুণ সৈন্যের দরকার ছিল। আমরা তা না করে পুনর্গঠিত প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করলাম। ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হলো। আমরা সেখানে শত্রুর কী ক্ষতি করতে পারলাম তা জানি না। কিন্তু আমাদের তো ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেল। ১১ নম্বর সেক্টরকে নিয়ে মেজর তাহেরও এই কামালপুর বিওপি আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারেননি। তিনিও ব্যর্থ হন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হওয়ার পর কামালপুর দখল করতে ভারতীয় বাহিনীকেও বেশ বেগ পেতে হয়। এ ধরনের কনভেনশনাল যুদ্ধ আমাদের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। দৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষায় থাকা শক্তিশালী শত্রু অবস্থান গেরিলাযুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে সঠিক নয়। আমরা তা ভুলে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি। কামালপুর ছাড়াও নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে ব্রিগেডের ইউনিটগুলো বেশ কয়েকটি আক্রমণ রচনা করেছে। দু-একটি ছাড়া কোনোটাতেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত ব্রিগেডগুলো যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি।

আমি ওসমানী সাহেবকে কয়েকবার অনুরোধ করেছিলাম যেন প্রথাগত যুদ্ধে আমরা না জড়াই, বরং আমরা ব্রিগেড যুদ্ধ ভুলে গিয়ে গেরিলাযুদ্ধের পদ্ধতিতে ফিরে আসি। মুক্তিযোদ্ধারা আগে যুদ্ধ করতে শিখুক। শত্রুকে চারদিক থেকে ছোট ছোট চোরাগোপ্তা আক্রমণের সাহায্যে নাজেহাল করতে থাকুক। সারা শরীর থেকে এভাবে রক্তক্ষরণের পর যখন শত্রু দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন তাকে সরাসরি আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলা হবে। সেই পর্যায়ে আমরা ব্রিগেড যুদ্ধের কথা ভাবব। তিনি রাজি হলেন না।

প্রথাগত যুদ্ধে ব্রিগেডগুলোর অংশগ্রহণ বিষয়ে খোদ ব্রিগেড বা ফোর্স অধিনায়কেরা সম্মত ছিলেন না। বিদ্যমান পরিস্থিতি প্রথাগত যুদ্ধের অনুকূল নয় বলে মত দিয়েছেন তাঁরা নিজেরাও। ভারতীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রথাগত যুদ্ধের জন্য লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হলে জেড ফোর্সের অধিনায়ক ভিন্নমত পোষণ করেন এবং এই ব্যাখ্যাটি উপস্থাপন করেন :

> ৫. আমাদেরটাসহ যেকোনো মুক্তিযুদ্ধের তিনটি স্তর থাকে, প্রথম স্তরে সংঘাতের শুরু, দ্বিতীয় স্তরে ভারসাম্য আনা এবং তৃতীয় স্তরে আক্রমণে যাওয়া। আমরা এখনো প্রথম স্তরের সংঘাত শেষ করতে পারিনি। এই স্তর তখনই সম্পন্ন হবে যখন আমাদের ঘাঁটির তৎপরতা যথেষ্ট কার্যকর হবে, ঘাঁটির সেনারা পরিপক্ব ও আত্মবিশ্বাসী হবে এবং যখন ঘাঁটির সেনাদের কর্মকাণ্ড ও চলাচলের ওপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। দুর্ভাগ্যজনক যে এই মুহূর্তে ঘাঁটির তৎপরতা অপর্যাপ্ত এবং আরও কিছু বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে। সাধারণত নিয়মিত ইউনিট ও ফর্মেশনসহ প্রথাগত পদ্ধতিতে নিয়মসিদ্ধ যুদ্ধ শুরু হয় দ্বিতীয় স্তরের শেষে অথবা তৃতীয় স্তরে। যাহোক, আমাদের সময়ের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে আমরা সর্বোচ্চ প্রথম স্তর সমাপ্তির পর প্রচলিত যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারি।
>
> ৬. বাস্তবতা এই যে আমরা কেবল প্রথম স্তরের কর্মতৎপরতা শুরু করেছি এবং আমরা নিশ্চিত নই যে এই ব্রিগেড নিয়ে আক্রমণ শুরুর সময় ঘাঁটির সেনাদের প্রস্তুত করতে সক্ষম হব কি না, যদিও আমরা তা চাচ্ছি। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ব্রিগেডের প্রচলিত যুদ্ধ শুরু করাটা প্রায় আত্মঘাতী হবে।

জেড ফোর্স, পত্র নং ১০৩/১/জি, তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

জুলাই-আগস্ট মাসে গেরিলাযুদ্ধের গতি কমে যায়, বলা যেতে পারে যে প্রায় স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে গেরিলাযুদ্ধের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও কার্যকর পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমি কর্নেল ওসমানীর অনুমতি নিয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করি। পরিকল্পনাটিতে উল্লেখ ছিল যে আমাদের লোকবল,

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব আছে, তাই ব্রিগেড গঠন করে খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে না। বরঞ্চ আমরা যদি গেরিলাযুদ্ধ করি, তাহলে ভালো ফল লাভ করতে পারব। আমার এই পরিকল্পনার কথা ওসমানী সাহেব মন দিয়ে শোনেন এবং বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন। তত দিনে উনি নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিগেডগুলো থেকে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। মাস দুয়েক পর, অর্থাৎ অক্টোবরের শেষের দিকে বাধ্য হয়ে ব্রিগেডগুলোকে প্রথাগত যুদ্ধের বদলে গেরিলাযুদ্ধের পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার জন্য নতুন 'সামরিক পরিকল্পনা' গ্রহণ করতে হয়; সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, 'এখন থেকে ব্রিগেডের সৈন্যরা সাধারণ গেরিলাদের মতো যুদ্ধ করবে।' এই সিদ্ধান্ত চিঠিতে উল্লেখ করে আমার স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই চিঠিতে ব্রিগেডকে বিলুপ্ত না করলেও তাদের যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা বাতিল করে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলাযুদ্ধে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্রিগেডের নতুন ভূমিকা বা গেরিলাযুদ্ধ বিষয়ে সিদ্ধান্তটি ছিল নিম্নরূপ :

> ব্রিগেডসমূহ
>
> যেহেতু বর্তমানে ব্রিগেড ও ব্যাটালিয়নের উপযোগিতা খুব সীমিত, তাই এসব নিয়মিত সৈনিক কোম্পানি ও প্লাটুন গ্রুপে বিন্যস্ত গেরিলা অভিযানের মূল অংশ হিসেবে কাজ করবে। এই সমস্ত নিয়মিত ইউনিট অবশ্যই বেতার যোগাযোগের আওতায় থাকবে, যাতে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পুনরায় একত্র করা সম্ভব হয়। বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে গেরিলা তৎপরতারও সমন্বয় সাধন করা হবে।

বিটার সুইট ভিক্টরি : আ ফ্রিডম ফাইটার্স টেল
এ কাইয়ুম খান, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ২৪৫

সরকার বা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ব্রিগেড গঠন বা এর প্রভাব বিষয়ে খুব একটা ভূমিকা রাখেননি। তাজউদ্দীন সাহেব হয়তো কর্নেল ওসমানীকে অসন্তুষ্ট করতে চাননি বা ব্রিগেড গঠনে মুক্তিযুদ্ধে কী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তা বুঝতে পারেননি। তাই ব্রিগেড গঠন বিষয়ে তিনি কোনো হস্তক্ষেপ করেননি। ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে গেরিলাযুদ্ধের আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তখন আমাদের ব্রিগেডগুলো মিত্রবাহিনীর অধীনে চূড়ান্ত যুদ্ধে যোগ দেয়।

অভিজ্ঞতা থেকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের সঠিক ধারণা ছিল না। যুদ্ধ চলাকালে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুদ্ধ বিষয়ে একজনের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন, তিনি কর্নেল ওসমানী। যুদ্ধের শুরুতেই কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ

করা হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধ বিষয়ে পূর্ব ধারণা থাকলেও তাঁর চিন্তাধারা গেরিলাযুদ্ধের জন্য সহায়ক ছিল না। অথচ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রধানত গেরিলাযুদ্ধ-নির্ভর। গেরিলাযোদ্ধারা জনগণের মধ্যে মিশে থেকে যুদ্ধ করবে, তিনি এই ধারণার প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। মাঠপর্যায়ের কমান্ডাররা গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন এবং তাঁদের কাছে এর কোনো বিকল্পও ছিল না। তাঁরা জানতেন যে প্রথাগত যুদ্ধ করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। ফলে কর্নেল ওসমানী না চাইলেও বা অপছন্দ করলেও কমান্ডাররা তাঁদের মতো করেই গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যান। এতে কর্নেল ওসমানী মাঠপর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। যুদ্ধ চলাকালে তিনি মূলত প্রশাসন বিষয়ে বেশি নজরদারি করতেন। যেমন, অমুককে ওই স্থান থেকে বদলি করা, এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে কাউকে নিযুক্ত করা, কারও পদোন্নতি বা পদভ্রংশ করা, বিভিন্ন নীতিমালা তৈরি করা ইত্যাদি। তিনি যুদ্ধের কলাকৌশল নিয়ে বিশেষ কোনো নির্দেশ দিতেন না। প্রধান সেনাপতি হলেই যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে তা ঠিক নয়। তবে তিনি যুদ্ধে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ প্রদান করতে পারতেন এবং এগুলোর প্রভাব লক্ষ করতে পারতেন, যা তিনি খুব একটা করেননি। যুদ্ধ মূলত সেক্টর অধিনায়কদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। কর্নেল ওসমানী যুদ্ধের সময় সরাসরি কমান্ড না দিয়ে একদিক দিয়ে ভালোই করেছিলেন। আমার মনে হয়, তিনি তা করলে তাঁর এবং সেক্টর অধিনায়কদের মধ্যে সম্পর্কের সংকট দেখা দিত।

যাহোক, সম্ভবত আগস্ট মাসের শেষের দিকে তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে দিল্লিতে ডি পি ধরের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। ডি পি ধরের বাসায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আগেই বলেছি, যুদ্ধ করার সময় আমাদের যেসব অস্ত্র, সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ প্রয়োজন ছিল, তা ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছিল না। এতে যুদ্ধ ও যোদ্ধাদের মধ্যে হতাশার ভাব চলে আসে। বিষয়টি ডি পি ধরকে জানালাম। উত্তরে তিনি বলেন, 'আমাদের (ভারতীয়দের) কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে। তোমাদের যেরকম সাহায্য দরকার, তেমনি আমাদের দিকেও কিছু প্রস্তুতির দরকার রয়েছে।' খুব বন্ধুসুলভ পরিবেশে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। ডি পি ধরের কাছে আমাদের সমস্যা ও দাবিগুলো আমি খুব যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরি। আমি বলেছি, 'আপনারা সাহায্য করছেন। আমরা এর জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনারা আমাদের অনুভূতিটা বিবেচনায় নেবেন না।' ডি পি ধর আমার সব

কথা শুনে বলেছিলেন, 'আপনি সবকিছু বেশ ভালোভাবেই তুলে ধরেছেন।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আপনাকে দেখে মনে হয় না যে আপনি প্রয়োজনে এই রকম শক্ত অবস্থান নিতে পারেন।' এইভাবেই আমাদের ভেতর আলোচনা চলেছিল। আলোচনার শেষে ডি পি ধর একটি কথা বলেছিলেন, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমরা এই যুদ্ধে আপনাদের জয়লাভের জন্য আমাদের সামর্থ্যে যা কিছু আছে, তার সবটুকু ব্যবহার করছি এবং করব। আপনারা আমাদের কাছ থেকে সব রকম সহায়তা পাবেন।'

তাজউদ্দীন আহমদ ও ভারতীয় কর্মকর্তারা যুদ্ধসম্পর্কিত আলোচনায় কর্নেল ওসমানীর চেয়ে আমাকে বেশি ডাকতেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা এবং মেজর জেনারেল জ্যাকব বিভিন্ন সময় আমার সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলতেন বা আলোচনা করতেন। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে যখন লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার মিটিং হতো তখন হয় কর্নেল ওসমানী আমাকে সঙ্গে নিতেন, নয়তো তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে সঙ্গে থাকতে বলতেন, আর না হয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে আসতে বলত। ফলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার সঙ্গে প্রায় প্রতিটি মিটিংয়ে আমিও উপস্থিত থাকতাম। এসব মিটিংয়ে প্রধানত যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, যুদ্ধের কৌশল, যুদ্ধের পরিকল্পনা ও অস্ত্র প্রদানের পরিমাণ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে মতানৈক্য হতো। অনেক সময়ই তাঁরা আমাদের সমস্যা বা চাহিদা উপলব্ধি করতে পারতেন না। তবে আমাদের মধ্যে কখনো অপ্রীতিকর কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। আমরা উভয়েই প্রয়োজনে ছাড় দিয়ে একটা সমাধানে পৌঁছে যেতাম।

আগেই উল্লেখ করেছি যে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযান ও লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করত। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের হলে পূর্বাঞ্চল কমান্ড অভিযানের তালিকা তৈরি করত আর আঞ্চলিক পর্যায়ের হলে ভারতীয় সেক্টর সদর দপ্তর থেকে তা নির্ধারণ করা হতো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তরে মুক্তিবাহিনীর অভিযান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ডিরেক্টর অব অপারেশনস মেজর জেনারেল বি এন সরকার। লক্ষ্যবস্তুগুলো জেনারেল সরকারের কার্যালয় থেকে ঠিক করা হলেও মাঝেমধ্যে আমাদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন। এ পরামর্শ কিন্তু যুদ্ধের কৌশলগত ছিল না। তিনি আসলে দেশের অভ্যন্তরের কোনো জায়গা বা নদী বা স্থানীয় মানুষজনের মনোভাব সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাইতেন। সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পেলে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে আমাদের সম্পৃক্ততা কিছুটা বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে কয়েকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও পাটকল ছিল। জুলাই মাসের মধ্যে পরিস্থিতি পাকিস্তান সরকারের আংশিক নিয়ন্ত্রণে যাওয়ায় কিছু কিছু পাটকল চালু হয় এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি শুরু হয়। এ সময়ে জেনারেল বি এন সরকার অভিযান বিষয়ে একটি আলোচনা সভায় এই বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র ও পাটকলগুলো গেরিলাদের মাধ্যমে ধ্বংস করার প্রস্তাব করেন। তিনি পরিকল্পনা দেন যে গেরিলারা বোমা মেরে এগুলো অকেজো করে দেবে। আলোচনায় আমি উল্লেখ করি যে দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখন এসব শিল্পকারখানা তো আমাদেরই হবে। এগুলো এভাবে ধ্বংস করলে চূড়ান্তভাবে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। তাই এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছিলাম না। ওই সভায় ৮ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর এম এ মঞ্জুর (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভীষণভাবে আমার মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, এগুলো অত্যন্ত অসামরিক কথা। তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো আঘাত করে পাকিস্তানিদের দুর্বল করার পক্ষে মত দেন। আমি বলেছি, গুরুত্বপূর্ণ কোনো অর্থনৈতিক কেন্দ্র বা কোনো কৌশলগত স্থাপনা বা যোগাযোগকেন্দ্র যেমন হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, ভৈরব সেতু, আদমজী পাটকল ইত্যাদিতে আক্রমণ করতে হলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে। যেসব স্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে বা যা ধ্বংস হলে দেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, সেসব স্থাপনায় আক্রমণ করার জন্য রাজনৈতিক অনুমোদন থাকা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পাটকলে আর আক্রমণ করা হয়নি। পরিবর্তে এমন কিছু জায়গাকে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেখানে গেরিলা বা মুক্তিযোদ্ধাদের যাওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল। জেনারেল সরকার বাঙালি ছিলেন, তাই বাংলাদেশের যুদ্ধকে তিনি নিজের যুদ্ধ মনে করতেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হতো। বিভিন্ন সময় যুদ্ধের কৌশল ও লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের জন্য জেনারেল সরকার আমাকে এবং কলকাতার কাছাকাছি ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর মঞ্জুরকে ডাকতেন।

আগস্ট মাসে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইউএসআরআর নামে কোনো দেশ নেই। বর্তমান রাশিয়া ও পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি দেশ নিয়ে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এর মূল কর্তৃত্ব ছিল রাশিয়ার) মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে ভারত তখনকার অন্যতম এই বৃহৎ শক্তির কাছ থেকে সামরিক সহায়তা পাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয়। উপরন্তু ভারত কোনো শত্রুরাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে এই

চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। উল্লেখ্য, চীনের সঙ্গে ভারতের আগে থেকেই একটা বৈরী সম্পর্ক ছিল। ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করে ভারতের অনেক ক্ষতি সাধন করে। এদিকে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাই ভারত যদি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সহায়তা করে, তাহলে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা থেকে যায়। এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করে। চুক্তির আওতায় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে ব্যাপক অস্ত্র পেতে আরম্ভ করে। এ সময় ভারতও আমাদের প্রচুর অস্ত্র দিতে শুরু করে। অস্ত্র পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ায় আমরাও বেশিসংখ্যক গেরিলাকে প্রশিক্ষণে পাঠাতে শুরু করি। মে মাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি মাসে মাত্র ৫ হাজার গেরিলা প্রশিক্ষণ পাচ্ছিল। ভারত-সোভিয়েত চুক্তির পর এ সংখ্যা বেড়ে প্রতি মাসে ২০ হাজারে উন্নীত করা হয়। এতে যুদ্ধের গতিও ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। তবে এসবই হয় সেপ্টেম্বর মাসের পর এবং এর সুফল পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয় অক্টোবরের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

সোভিয়েত-ভারত চুক্তির ফলে আমরা যখন প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পেতে শুরু করি ঠিক তখনই পূর্বে গঠিত তিনটি ব্রিগেড (জেড, এস ও কে ফোর্স) থেকে অধিকসংখ্যক প্রশিক্ষিত যোদ্ধা এসে আমাদের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী গেরিলাযুদ্ধে যোগদান করে। ভারত থেকে পাওয়া অস্ত্র নিয়ে আমাদের প্রশিক্ষিত গেরিলারা ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলাদেশে ঢুকতে শুরু করে। আমাদের যুদ্ধের গতি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এ আক্রমণের ফলে যৌথ বাহিনীর জন্য যুদ্ধজয় একটা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

রণাঙ্গনে পাকিস্তান বড় ধরনের চাপে পড়ে যায় এবং বাধ্য হয় যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করতে। সে জন্য পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভারতের সামরিক স্থাপনাগুলোতে আক্রমণ শুরু করে। যাতে করে জাতিসংঘের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ বিরতি করে একটি সমঝোতায় পৌঁছুতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানের এ উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

মুজিব বাহিনী

অস্থায়ী সরকার গঠনের আগে, এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ বাহিনী বা মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়। অস্থায়ী সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক কাঠামো সরকার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনী সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধের সব কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরেও কিছু বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে তৎপর ছিল। এদের বেশির ভাগই ছিল স্থানীয় পর্যায়ের এবং তাদের অভিযানের এলাকা ছিল সীমিত। তারা কিছুটা স্বাধীনভাবে তাদের অভিযান পরিচালনা করলেও স্থানীয় সেক্টর সদর দপ্তরের সঙ্গে সব সময় সমঝোতা করে চলত। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবে তারা সরকারের বিপক্ষেও ছিল না। মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে আরও দুটি বাহিনী ছিল, যারা তুলনামূলকভাবে জনবল ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে বড় ছিল। এ দুটির মধ্যে প্রথমটি ছিল টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী, যারা কাদের সিদ্দিকী মাধ্যমে পৃথকভাবে পরিচালিত হলেও সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখত। দ্বিতীয়টি ছিল মুজিব বাহিনী, যারা সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী সরকার ও বাংলাদেশ বাহিনী থেকে স্বতন্ত্র ছিল। প্রায়শই তারা অস্থায়ী সরকার ও মুক্তিবাহিনীকে অবজ্ঞা করত এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করত। মুজিব বাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

শুরু থেকেই মুজিব বাহিনী ও এর কর্মকাণ্ড নিয়ে বহু বিতর্ক ছিল। অস্থায়ী সরকারের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বা দ্বন্দ্ব হয়তো মুজিব বাহিনী গঠনে অনুপ্রাণিত করেছিল। রাজনৈতিকভাবে তাজউদ্দীন সাহেব অস্থায়ী সরকারের সব

মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সমর্থন পাননি। অস্থায়ী সরকার গঠনকালে একপ্রকার চেষ্টা চলছিল তাজউদ্দীন সাহেবকে যেন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া না হয়। কারণ হিসেবে বলা হতো যে তিনি বঙ্গবন্ধুর অনুগত নন। তাজউদ্দীনের বিরোধীরা এমন কাউকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল, যাকে সামনে রেখে তারাই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। তাজউদ্দীনের ব্যক্তিত্ব ও সততার কারণে বিরোধীরা সুবিধা করতে পারছিল না। এটা খুবই দুঃখজনক যে যখন আমরা স্বাধীন নই এবং অন্য দেশের ভূখণ্ডে বসে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি, যখন আমরা জানি না আমাদের ভবিষ্যৎ কী, যখন আমাদের সবচেয়ে বেশি ঐক্যের প্রয়োজন তখনই কিনা আমরা নানা দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুক্তিবাহিনী ও এর সেক্টরগুলো অস্থায়ী সরকারের নির্দেশনায় পরিচালিত হলেও স্থানীয় ও অন্য বাহিনীগুলো তাদের নিজস্ব নিয়মে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাত। এটা হতে পেরেছিল মূলত অস্থায়ী সরকারের প্রথম দিকের একটি সিদ্ধান্ত থেকে। সিদ্ধান্তটি ছিল, আওয়ামী লীগ বা তাদের মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে মুক্তিবাহিনীতে নেওয়া হবে না। অপর দিকে মুক্তিবাহিনীর ওপর ভারতীয়দের প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণও অন্যদের আলাদা বাহিনী গঠনে উৎসাহিত করে। কর্নেল ওসমানী চেয়েছিলেন যুদ্ধরত সব বাহিনী মুক্তিবাহিনীর অধীনে যুদ্ধ করবে। কিন্তু তা হয়নি। ছোট ছোট বাহিনীগুলো তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মুক্তিবাহিনীর সেক্টর অধিনায়কদের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করত। কিন্তু মুজিব বাহিনীর বিষয়টি ছিল একেবারেই ভিন্ন। যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্বে অস্থায়ী সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের প্রচ্ছন্ন প্রভাবও হয়তো ছিল। এ বাহিনীর গঠন নিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া ছিল—যেহেতু আমরা দেশ স্বাধীন করতে এসেছি, তাই এখানে আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ বা দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। আমাদের সবার লক্ষ্য থাকা উচিত ঐকমত্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ করা। তবে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মুজিব বাহিনীর ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার যে আশা আমরা করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি।

মুজিব বাহিনীর গঠনপ্রণালি আলাদা ছিল। এ বাহিনীর সমন্বয়কারী ও প্রশিক্ষক ছিলেন 'র'-র কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বিভাগের মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান। তিনি এস এস উবান নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় মুজিব বাহিনীকে প্রশিক্ষিত করা হয়। মেজর জেনারেল

উবানের বক্তব্য অনুযায়ী মুজিব বাহিনী নামটি তিনিই চালু করেন, যদিও নামটি উপরস্থ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয়নি। তারা বলেছিল যে এতে বিভ্রান্তি ও ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। কিন্তু মুজিব বাহিনীর সদস্যরা বাহিনীর নাম পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। এ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত বিতর্ক চলতে থাকে এবং এর কোনো সুরাহা হয়নি। ফলে মুক্তিযুদ্ধকালে ব্যক্তির নামভিত্তিক অনেক বাহিনীর মতো মুজিব বাহিনীও সেভাবেই পরিচিত থাকে। মুজিব বাহিনীকে কোথাও কোথাও বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা বিএলএফ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। মুজিব বাহিনীর সরকারি কোনো নাম না থাকলেও এই বাহিনীকে স্যাম'স বয় নামেও কোথাও কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে। জেনারেল উবানের বর্ণনা অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ নাকি আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে বলেছিলেন যে মুজিব বাহিনীকে তিনি (জেনারেল মানেকশ) গঠন করেছেন তাঁর সেনাবাহিনীর হয়ে বিশেষ কিছু অভিযান পরিচালনার জন্য।

সম্ভবত জুন মাসে আমি মুজিব বাহিনী সম্পর্কে প্রথম শুনতে পাই। কর্নেল ওসমানীর অফিসে বিভিন্ন ধরনের লোকের যাওয়া-আসা ছিল। তাদের কাছ থেকেই জানতে পারি যে প্রধান সেনাপতি বা সি-ইন-সির স্পেশাল ফোর্স বা বিশেষ বাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠিত হতে যাচ্ছে। আমার ধারণা, কর্নেল ওসমানীকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যাতে তিনি এতে সমর্থন দেন। বিষয়টি নিয়ে আমি কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে কথা বলি। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না দিলেও তাঁর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি যে একটা বিশেষ বাহিনী হতে যাচ্ছে, যা সি-ইন-সির স্পেশাল ফোর্স নামে অভিহিত হবে। এই বাহিনী গঠনে তাঁর যে সম্মতি আছে, সেটাও আমি বুঝতে পারলাম। সি-ইন-সির স্পেশাল ফোর্স যে পরে মুজিব বাহিনীতে পরিণত হবে, কর্নেল ওসমানী সম্ভবত তা বুঝতে পারেননি। তাই সি-ইন-সির স্পেশাল ফোর্স গঠনের শুরুতে কর্নেল ওসমানীর কাছ থেকে কোনো আপত্তির কথা শুনিনি, বরং আচার-আচরণ ও মৌনতায় মনে হতো যে এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সম্মতি আছে। জুন মাসের পর বেশ কিছুদিন এ সম্পর্কে আর কোনো আলাপ-আলোচনা শোনা যায়নি।

মুজিব বাহিনী গঠনের বিষয়টি দীর্ঘদিন পর্যন্ত অনেকেরই অজানা ছিল। কারণ সংগঠনটি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে গঠন করা হয় এবং এর সদস্যদের গোপন জায়গায় রাখা হয়। গোপনীয়তার জন্যই তখন এই বাহিনী সম্পর্কে বেশি কিছু জানা সম্ভব হয়নি। মুজিব বাহিনী গঠন সম্পর্কে

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম সাহেব বা অন্য কেউ জানতেন কি না জানি না, তবে তাজউদ্দীন সাহেব এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। কর্নেল ওসমানীও যে কিছু জানতেন না সে বিষয়ে আমি শতভাগ নিশ্চিত। তবে সি-ইন-সির স্পেশাল ফোর্স গঠন বিষয়ে কর্নেল ওসমানীর আগ্রহ লক্ষ করেছিলাম। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদের মন্তব্য ছিল, দেরাদুনের একটি বিশেষ ঘাঁটিতে এরা স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং বাংলাদেশ বাহিনী বা মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বের বাইরে স্বতন্ত্র নেতৃত্বের অধীনে থেকে এরা সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিরোধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে।

মুজিব বাহিনীকে খুব গোপনে প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হতো। অভিযানের জন্যও গোপনীয়তার সঙ্গে তাদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হতো। ফলে, এই বাহিনীর কার্যক্রম বা এদের উপস্থিতি আমরা অনেক পরে জানতে পারি, তা-ও পুরোপুরি নয়। ভারতীয় আর্মিও মনে করত যে মুজিব বাহিনীকে বাংলাদেশ বাহিনী থেকে গোপন ও আলাদা রাখা উচিত। তাই গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ভারত আর্মিও তাদের সহযোগিতা করে। এটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, ভারতীয়রাই তো মুজিব বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তবে জেনারেল উবানের বর্ণনা অনুযায়ী পূর্বাঞ্চল কমান্ডার জেনারেল অরোরা মুজিব বাহিনীকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রচণ্ড চাপ দিয়েছিলেন।

ক্রমশ অল্প অল্প করে আমরা বিভিন্ন সেক্টর থেকে মুজিব বাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারি। ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বাহিনীর সংখ্যা প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল চার হাজার। কিন্তু পরে জেনেছি যে এই সংখ্যা ৯ থেকে ১২ হাজার। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করার ফলে আমি সঠিক সংখ্যাটি বলতে পারব না। জেনারেল উবানের হিসাবে মুজিব বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে জেনারেল উবান তাঁর বইয়ে লিখেছেন :

> আমরা প্রায় ১০ হাজার মুজিব বাহিনী নেতাকে গেরিলাযুদ্ধের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলি এবং কথা ছিল যে তারা পালাক্রমে বাংলাদেশে অবস্থিত তাদের সংগঠনের লাখো জনকে প্রশিক্ষণ দেবে।
>
> *ফ্যান্টমস অব চিটাগাং : দ্য 'ফিফথ আর্মি' ইন বাংলাদেশ*
> মেজর জেনারেল এস এস উবান (অব.)
> এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (ভারত), পৃ. ৪০

মুজিব বাহিনী অত্যাধুনিক অস্ত্রগুলো ভারতীয়দের কাছ থেকে পেয়েছিল। ভারতীয়রা তাদের যাতায়াতের জন্য পরিবহন এবং সম্মানীও দিত। মুজিব

বাহিনী খুব পরিকল্পিত ও সংগঠিত ছিল, যা অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দেখা যায়নি। পরে শুনেছি তাদের উন্নতমানের অস্ত্র দেওয়ার বিষয়টি ভারত সরকারের অনুমতি নিয়েই করা হয়েছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি ছাড়া অধিক পরিমাণে উন্নত ধরনের অস্ত্র পাওয়া সম্ভবও ছিল না।

বিভিন্ন এলাকা থেকে যেসব ছেলেকে মুজিব বাহিনীতে ভর্তি করা হতো, সে সম্পর্কে কাউকে কোনো কিছু জানতে দেওয়া হতো না। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ভারতীয়রা এই কাজটি করত। উইং কমান্ডার (অব.) এস আর মীর্জা যুব শিবিরের মহাপরিচালক ছিলেন, তবু তিনি মুজিব বাহিনী সম্পর্কে কিছু জানতেন না বা নির্বাচন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁকে যুক্ত রাখা হয়নি। 'র'-র সরাসরি তত্ত্বাবধানে মুজিব বাহিনী দেরাদুনে প্রশিক্ষণ নিত। এ বাহিনীর সদস্যদের বড় অংশই শিক্ষিত ছিল ও সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছিল। মুজিব বাহিনীতে গ্রামের ছেলে ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কোনো শ্রমজীবী মানুষকেও এই বাহিনীতে দেখা যায়নি। বলা হতো, এই বাহিনীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ যেন বামপন্থীদের হাতে চলে না যায়, তা নিশ্চিত করা। আর সে জন্যই কোনো গরিব, মজদুর, চাষি বা সাধারণ ঘরের মানুষকে এই বাহিনীতে নেওয়া হয়নি। অপর দিকে গেরিলা বা গণবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের ৮০ ভাগই ছিল বিভিন্ন শ্রমজীবী শ্রেণি, বিশেষত কৃষক পরিবার থেকে আসা তরুণ। আমি মুজিব বাহিনীর বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে

ভারতের দেরাদুনে এস এস উবানের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ

কথা বলেছি। তারা সবাই বেশ ভালো, শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারের। আমার মনে হয়েছে, যুব শিবিরে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগেই ওই ছেলেদের বাছাই করা হয়েছিল। এমপিএ এবং এমএনএরা বিভিন্ন যুব শিবির, শরণার্থী শিবিরসহ অন্যান্য নানা শিবিরে যাতায়াত করত। তারা বা তাদের কেউ কেউ মুজিব বাহিনীর জন্য সদস্য বাছাই করত, যা তারা কোনো দিন বলত না। মুজিব বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আলাদা, যা তারা খুব গোপনভাবে পালন করত। তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু না জানানোর ফলে আমার মনে হয়েছিল যে এদের একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল আর তা হচ্ছে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যেন তাদের রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভিন্নমত কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি বা কোনো মাধ্যম দিয়ে আগে থেকেই বঙ্গবন্ধুর একটা যোগাযোগ হয়েছিল বলেই মনে হয়। এ কথা এ জন্য বলছি যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হওয়া ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগেই মুজিব বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র পেতে শুরু করে। জুলাই মাস থেকে মুজিব বাহিনী প্রশিক্ষণ শেষে সীমান্ত এলাকায় বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করে। তবে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসার পর এদের মধ্যে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। বরং তারা বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে প্রশিক্ষণ-ফেরত গেরিলাদের অথবা যুব শিবিরে যেসব যুবক আসত তাদের প্রশিক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত করার আগেই সেখান থেকে বাছাই করে মুজিব বাহিনীর জন্য নির্বাচন করত বা নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করত।

জেনারেল উবান শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা তৎপরতার বিরুদ্ধে পাল্টা গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোর (কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স) বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ ছাড়া প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের কীভাবে প্রশিক্ষিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বা নিজেদের অধীনে রেখে তাদের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে ও দমিয়ে রাখতে হয়, সে বিষয়েও একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। এই উবানই ছিলেন মুজিব বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণের মূল ব্যক্তি। মুজিব বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনারেল উবানও কিছু বলতে চাননি। যে কারণে এই বাহিনী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়নি। তবে জেনারেল উবানের মতে, মুজিব বাহিনীর সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যকে একমাত্র বিবেচনা হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। তিনি মনে করতেন যে মুক্তিবাহিনীতে বিভিন্ন দল ও মতের

ব্যক্তিরা যোগ দিয়েছে এবং তাদের অনেকেই শেখ মুজিবের প্রতি অনুগত নয়, কিন্তু মুজিব বাহিনীর সদস্যরা শেখ মুজিবের প্রতি শতভাগ অনুগত ছিল। তার মতে, তারা কখনো শেখ মুজিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। বাস্তবে যদিও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে মুজিব বাহিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় সারির নেতাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের বেশি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং জাসদ নামে একটি উগ্র রাজনৈতিক দল গঠন করে। শেখ মুজিব বেঁচে থাকা অবস্থায় জাসদ দেশে অনেক ধ্বংসাত্মক কাজ করে। তাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের শেখ মুজিব বা দেশের প্রতি আনুগত্য সন্দেহাতীত ছিল না। এই বাহিনী মূলত গঠিত হয়েছিল স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক বাহিনীর প্রয়োজন বিবেচনা করে। স্বাধীনতার পর জেনারেল উবান পুনরায় বাংলাদেশে আসেন অপর একটি রাজনৈতিক বাহিনী বা রক্ষীবাহিনী গঠনের জন্য। মুজিব বাহিনীর বেশ কিছু সদস্য নতুন গঠিত রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেয়।

জেনারেল উবান বলেন, মুজিব বাহিনীর সদস্যদের মূলত দলনেতা ও প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। কথা ছিল ভারতে প্রশিক্ষণ নেওয়া মুজিব বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ শেষে দেশের ভেতরে গিয়ে নতুন নতুন তরুণকে প্রশিক্ষণ দেবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষিত ১০ হাজার তরুণ দেশের ভেতরে নতুন নতুন তরুণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে লাখো যোদ্ধার বিরাট বাহিনী গঠন করবে। এরপর এই বাহিনী শেখ মুজিবের প্রতি অনুগত থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে। জেনারেল উবানের এই পরিকল্পনা কোনো কাজে আসেনি। মুক্তিযুদ্ধে বিভ্রান্তি ও ভেদাভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া মুজিব বাহিনী সামরিক ক্ষেত্রে খুব বেশি সফলতা দেখাতে পারেনি। তবে যুদ্ধের শেষ প্রান্তে জেনারেল উবান পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের (পাকিস্তানিদের) অনুগত বিদ্রোহী মিজো বাহিনীকে উৎখাত করার জন্য একটি অভিযান পরিচালনা করেন। উবানের বাহিনী অক্টোবর মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে বরকল ও সুবলং হয়ে রাঙামাটিতে এসে এই অপারেশনের সমাপ্তি টানে। ভারতীয় এসএসএফ (স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) এবং মুজিব বাহিনীর একটা অংশ এই অপারেশনে যোগ দিয়েছিল।

মুজিব বাহিনী যুদ্ধে কতখানি অবদান রেখেছে বা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেছে তা বলা মুশকিল। এ বাহিনীর বেশির ভাগ সদস্যকে যুদ্ধের ময়দানে দেখা যায়নি। মুজিব বাহিনীর হাতেগোনা কয়েকজন সদস্যের যুদ্ধে অংশগ্রহণের

কথা জানা যায়। যুদ্ধে তাদের কিছু সদস্য আহত বা নিহতও হয়। তবে তারা কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছে সেই পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

মুজিব বাহিনীর সদস্যদের দেশের ভেতরে পাঠানোর সময় তাদের বিশেষভাবে বাছাই করে পাঠানো হতো। দেশের ভেতরে তারা কোথায় যাচ্ছে, কী কাজে যাচ্ছে, এটা সাধারণত কাউকে বলা হতো না। একমাত্র তাদেরই বলা হতো যাদের ভেতরে পাঠানো হতো। এ বিষয়ে জেনারেল উবান কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখতেন। যুদ্ধের সময় তাদের কর্মকাণ্ড দেশের স্বাধীনতার পক্ষে যতটা না প্রবল ছিল, তার থেকে বেশি ছিল অন্য কিছুর জন্য। তাজউদ্দীন সাহেব মুজিব বাহিনী বিষয়ে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। অন্য নেতাদের দেখে মনে হতো যে তাঁরা এ বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না, তাঁরা মুজিব বাহিনীর কর্মকাণ্ডের সমর্থন বা বিরোধিতা কোনোটাই করেননি। আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয়দের কেউ এ বাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ না করার একটা বড় কারণ মুজিব বাহিনীর প্রধান চার নেতা—শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ—যাঁরা আওয়ামী লীগের তরুণ ও যুব প্রজন্মের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। এ ছাড়া এঁরা শেখ মুজিবের আস্থাভাজন অনুসারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

চলমান মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে মুজিব বাহিনী যতটা আগ্রহী ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী বা তৎপর ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের করণীয় বা ভূমিকা নিয়ে। তাদের হাবভাবে মনে হতো যে স্বাধীনতার পরে দেশে যে সরকার গঠিত হবে, সেই সরকারের নিরাপত্তা দেওয়াই তাদের মূল উদ্দেশ্য, যাতে বামপন্থীরা নতুন সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করতে না পারে। সে জন্য বাহিনীটি যাতে সংগঠিত থাকে এবং যুদ্ধোত্তর নতুন সরকারের পক্ষে কাজ করতে পারে সেই দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। তাই তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ঝুঁকি নিত না। তা ছাড়া এদের ধারণা ছিল বা তাদের বলা হয়েছিল যে ভারত একদিন বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবে। তখন এরা স্বাধীন দেশের মূল সেনাবাহিনীর পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে পুষ্ট অপর একটি বাহিনী গঠন করবে। সেই বাহিনীকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য একটি রাজনৈতিক পট তৈরি করার পরিকল্পনাও তাদের ছিল বলে আমার মনে হয়েছে।

মুজিব বাহিনীর প্রধান নেতারা শুরু থেকেই অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধী ছিলেন এবং তাঁদের কার্যকলাপ যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। মুজিব বাহিনী বলত, অস্থায়ী সরকার অবৈধ, বঙ্গবন্ধুর অনুমোদন

না নিয়েই এটা গঠন করা হয়েছে এবং অবিলম্বে তা ভেঙে দেওয়া উচিত। এই মর্মে তারা রাজনৈতিক প্রচারণাও শুরু করে। এতে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা সন্তুষ্ট ছিল না। মুজিব বাহিনীর এসব কর্মকাণ্ড আমার কানেও আসত। যুদ্ধের সময় যেখানে আমরা দেশকে স্বাধীন করতে এসেছি, সেখানে আমাদের নিজেদের মধ্যে এই রকম সম্পর্ক মোটেই কাম্য ছিল না। জেনারেল উবান জানতেন যে মুজিব বাহিনীর মূল নেতারা অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার করে না এবং তাদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথাও বলে না। মুজিব বাহিনীর নেতারা তাজউদ্দীন সাহেবকে কমিউনিস্টদের প্রতিনিধি মনে করতেন। তাঁরা জেনারেল উবানকে বলতেন যে ডি পি ধরের ইন্ধনে তাজউদ্দীন সাহেব আওয়ামী লীগ ছাড়াও কমিউনিস্টদেরও মুক্তিবাহিনীতে গ্রহণ করছেন। মেজর জেনারেল উবান নিজেও তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে অস্থায়ী সরকারের নেতৃবৃন্দ, কর্নেল ওসমানী এবং মাঠপর্যায়ের সেনা কর্মকর্তারা মুজিব বাহিনীর গঠনকে মেনে নেয়নি। তিনি লিখেছেন :

> বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার মানেই মূলত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকেই বোঝাত, যিনি মুজিব বাহিনীর নেতাদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতেন না এবং তাদের সকল অভিযোগ তুচ্ছভাবে দেখতেন।

ফ্যান্টমস অব চিটাগাং : দ্য 'ফিফথ আর্মি' ইন বাংলাদেশ
মেজর জেনারেল এস এস উবান (অব.)
এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (ভারত), পৃ. ৩১

আমার সঙ্গে প্রথম যে দুজন মুজিব বাহিনী সদস্যের সাক্ষাৎ হয়, তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন খসরু ও মন্টু নামে। এঁদের কাউকে আমি চিনতাম না, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মুজিব বাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দেন। তাঁরা বলেন যে তাঁদের কাছে অস্ত্র আছে, তাঁরা তা বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে যেতে চান। তাঁরা জানতে চান যে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীকে বিষয়টি জানাবেন কি না। একপর্যায়ে আমি তাঁরা কোথা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন জানতে চাই। তাঁরা দুজন বেশ অন্যরকম একটা হাসি দিয়ে আমাকে জানান যে তাঁরা ভারতের ভেতর থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। আমি আবারও জিজ্ঞেস করি, কোন স্থানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? উত্তর প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে তাঁরা বলেন যে সেটা জানাতে অসুবিধা আছে। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করি যে তাঁরা আমাদের সেক্টরের অধীনে থাকবেন কি না। তাঁরা হেসে এর কোনো জবাব দেননি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমার একটু খারাপ লাগল এই ভেবে যে আমি মুক্তিযুদ্ধের অভিযানগুলো সমন্বয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আর মুজিব বাহিনীকে কোথায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আর কোথায় কীভাবে তারা অভিযান

পরিচালনা করবে, সেটা আমার কাছেও গোপন রাখা হয়েছে। পরে বিষয়টি আমি কর্নেল ওসমানীকেও বলেছি।

এর কিছুদিন পর বিভিন্ন সেক্টর অধিনায়কের কাছ থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করে যে তাদের সেক্টরে কিছু সশস্ত্র তরুণ নেতা এসেছে, যারা নিজেদের মুজিব বাহিনীর সদস্য হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে এবং তারা সেক্টরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের নিজেদের দলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা প্রচার করছে যে সেক্টর অধিনায়কেরা কেউ না, তারাই সব। সেক্টর এলাকায় মুজিব বাহিনী সদস্যদের বিতর্কিত কার্যক্রম নিয়ে তাদের সঙ্গে সেক্টর অধিনায়কদের সংঘাত বা বিরোধ সৃষ্টি হয়। এসব বিরোধ ও দ্বন্দ্ব মাঝেমধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষের রূপ নেয়। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে সেক্টর অধিনায়ক ছাড়াও সাব-সেক্টর অধিনায়ক, এমনকি সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকেও অভিযোগ আসতে শুরু করে। দুই বাহিনীর মধ্যে বিভেদের কারণে আমাদের সেক্টর অধিনায়ক ও অন্যদের মধ্যে যে ক্ষোভের জন্ম নেয় তা ছিল যুদ্ধের শেষ অবধি। তারা অভিযোগ করত যে মুজিব বাহিনীর অনেক সদস্যই তাদের (মুজিব বাহিনীর) হয়ে কাজ করার জন্য সেক্টরের গেরিলাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করত। মুজিব বাহিনীর সদস্যরা জোর করে সেক্টরের গেরিলাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, কোনো কোনো জায়গায় তারা সফলও হয়। মুজিব বাহিনীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ পাওয়া যায় যে আমাদের গেরিলাযোদ্ধাদের যে লক্ষ্যবস্তুতে পাঠানো হতো মুজিব বাহিনীর সদস্যরা সেই লক্ষ্য থেকে তাদের বিচ্যুত করে অন্য লক্ষ্যে নিয়ে যেত। মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিব বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে এ ধরনের বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার ফলে উভয় বাহিনীর মধ্যে কোথাও কোথাও গোলাগুলিও হয়েছে। এ ধরনের মারামারি, দ্বন্দ্ব মুক্তিযুদ্ধে বিভাজনের সৃষ্টি করে। সেই সময় মুজিব বাহিনী প্রচার চালাচ্ছিল যে তারাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মনোনীত আসল মুক্তিযোদ্ধা। তাজউদ্দীন আহমদ চক্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে যাতে দেশদ্রোহের অভিযোগে পাকিস্তানিরা মৃত্যুদণ্ড দেয়, সেই জন্যই তাজউদ্দীন সরকার গঠনের ব্যবস্থা করেছেন।

সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের এসব নালিশের বিষয়ে আমি অবগত ছিলাম। এরকম প্রথম নালিশ আসে আগস্ট মাসের দিকে। এ সময় মুজিব বাহিনী নিয়ে নানা মহল থেকে আরও জোরেশোরে কথা উঠতে শুরু করে। সেক্টর অধিনায়কেরা এদের সম্পর্কে সরকারের কাছে প্রশ্ন করে। তারা অভিযোগ করে যে এমন অবস্থা চললে যুদ্ধ চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে। কর্নেল

ওসমানীর কাছে বিভিন্ন সেক্টর থেকে এমন অভিযোগ একের পর এক আসতে থাকে। জাতির একটি ক্রান্তিকালে তাদের এই ধরনের আচরণ দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। সব অভিযোগই যে লিখিত আকারে আসত তা নয়, মৌখিকভাবেও জানানো হতো। ওই সময় আমাদের সব রকমের দাপ্তরিক সুবিধা ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং সেই কাঠামো সচল রাখার জন্য যে লোকবল ও অন্যান্য সহযোগিতার প্রয়োজন, সব ক্ষেত্রে তা পাওয়াও সম্ভব ছিল না। তাই এ ধরনের সব ঘটনা যা সেক্টর এলাকা, সীমান্ত, এমনকি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ঘটেছিল, তার বিবরণ আমাদের কাছে পৌঁছাত না। এর অংশবিশেষ আমরা বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে পরে জানতে পারি। পাঠকের অবগতির জন্য বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট ৩ ও ৪-এ এ ধরনের ঘটনা নিয়ে দুটি চিঠি যুক্ত করা হলো।

এই সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল ওসমানী এই বাহিনীর ওপর ক্রমশ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের গোচরীভূত করেন এবং মন্ত্রিপরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করেন। মন্ত্রিপরিষদ সভাতেও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং সে আলোচনা ছিল বেশ উত্তপ্ত। মন্ত্রিসভার সব সদস্য এ বাহিনীর কর্মকাণ্ড ও দায়িত্ব নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। আমি যতটুকু জানি, এ বিষয়ে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে ভারতীয় সরকারকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত হয়। এই বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েও মন্ত্রিসভা ভারত সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চায়। প্রশ্ন করা হয় যে বাংলাদেশ সরকারকে না জানিয়ে কেনই বা এমন একটা বাহিনী গড়ে তোলা হলো। মন্ত্রিসভায় যদিও আলোচনা হয়েছিল যে মুজিব বাহিনীর বাংলাদেশ সরকারের আওতায় এবং কেন্দ্রীয় ও একক নেতৃত্বের অধীনে থাকা উচিত, কিন্তু আমার মনে হয়নি মন্ত্রিসভার সব সদস্য এ বিষয়ে অন্তরে একমত পোষণ করেছেন। আমার মনে হয়েছিল যে তাঁদের মধ্যে কোথায় যেন একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। আমার এ কথাও মনে হয়েছিল যে মন্ত্রিসভার কেউ কেউ মুজিব বাহিনীর বিষয়ে আগে থেকেই জানতেন। এ সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু সে সময় তাঁদের কথাবার্তায় এমনই মনে হয়েছিল।

কর্নেল ওসমানী বলেছিলেন, মুজিব বাহিনীর এই সব কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বারবার প্রশ্ন করেছিলেন যে সমস্ত বাহিনী, অর্থাৎ নিয়মিত বাহিনীসহ গেরিলা ও মুজিব বাহিনী কেন কেন্দ্রীয় সামরিক নেতৃত্বের আওতায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকবে না? তিনি চেয়েছিলেন, সব বাহিনী বাংলাদেশ বাহিনীর একক নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মন্ত্রিসভায় বিষয়টি আলোচনার পর বাংলাদেশ

সরকারের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে উল্লেখ ছিল যে সব গেরিলাবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী বাংলাদেশ বাহিনীর অধীন থাকবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এর কোনো প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্রে পড়েনি এবং সত্যিকারভাবে মুজিব বাহিনী কখনোই বাংলাদেশ বাহিনীর অধীনে আসেনি।

সেক্টর অধিনায়ক এবং অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া তথ্য দেখে মনে হয়েছে মুজিব বাহিনী চলমান মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে যতটা না আগ্রহী, তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী বা তৎপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের করণীয় বা ভূমিকা নিয়ে। স্বাধীনতা-উত্তর দেশে তাদের যে একটা সামরিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা থাকবে, সে বিষয়টি আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই লক্ষ্য বা ভূমিকা সম্পর্কে তখন স্পষ্ট করে কিছু জানতে পারিনি। আমার ধারণা, মুজিব বাহিনীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিরাই শুধু জানতেন, নিচের দিকের সদস্যরা এই বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত না।

মুজিব বাহিনী সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব অনেকটা ধোঁয়াটে ছিল। তাদের মনোভাব আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারিনি। মুজিব বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও এদের কারণে সৃষ্ট অসুবিধা সম্পর্কে ভারত সরকারকে অবহিত করা হলেও তারা এমন কিছু করেনি যাতে এই বিশেষ বাহিনীর কর্মকাণ্ড হ্রাস পায় বা যাতে এ বাহিনী নিয়ন্ত্রণে আসে। যুদ্ধের ময়দানে মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর দ্বন্দ্বের সংবাদে তাজউদ্দীন সাহেব সতর্ক হন। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে কথা বলার জন্য তিনি দিল্লিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাজউদ্দীন সাহেব তাঁকে বলেন যে মুক্তিযুদ্ধে একটি বাহিনী হবে। যদি দুটি বাহিনী থাকে এবং তাদের যদি দুটি উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে যুদ্ধ বাধাগ্রস্ত হবে। তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে মুজিব বাহিনীর কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করেন।

আমার ধারণা, মুজিব বাহিনী গঠন বিষয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন এবং নিশ্চিতভাবেই তাঁর সম্মতিতেই বাহিনীটি গঠিত হয়েছে। তাঁর মতামতের বাইরে এই বাহিনী গঠন অসম্ভব ছিল। মুজিব বাহিনীর প্রধান জেনারেল উবান তো ভারত সরকারের বাইরের কেউ ছিলেন না। আমি শুনেছি, শ্রীমতী গান্ধী তাজউদ্দীন সাহেবকে জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি দেখবেন। আমি যত দূর জানতে পেরেছি, আশ্বাস দেওয়া ছাড়া ভারত সরকার এ বিষয়ে তেমন কিছু আর করেনি। আমার মনে হয়েছে, তারাও চেয়েছে যে মুজিব বাহিনী সক্রিয় থাকুক এবং তাদের ওপর ন্যস্ত কাজ চালিয়ে

যাক। আমার আরও মনে হয়েছে, সেই সময় ভারতে যে নকশাল আন্দোলন চলছিল তা ক্রমশ বেশ জোরদার হয়ে উঠছিল। ফলে গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ যদি বামপন্থী হয়ে যায় বা নকশাল আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে, তাহলে ভারত সরকার মুজিব বাহিনীকে নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করবে। তা ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও যদি বামপন্থীদের হাতে চলে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়, তাহলে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে। যে কারণে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি, যাতে মুজিব বাহিনীকে নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধানে আসা যায়। আরও একটি কারণ মুজিব বাহিনী গঠনে ভারত সরকারকে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে, তা হচ্ছে তাজউদ্দীন আহমদের ওপর ভারতীয়দের একটি সার্বক্ষণিক চাপ বজায় রাখা। মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব পুরোপুরিভাবে তাজউদ্দীন-বিরোধী ছিল। তারা কখনোই তাজউদ্দীন সাহেবকে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। তাই ভারতীয়রা মুজিব বাহিনীকে তাজউদ্দীন সাহেবের বিকল্প বা সমান্তরাল হিসেবে সৃষ্টি করে থাকতে পারে। আসলে মুজিব বাহিনী বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশ বাহিনীর আওতায় আসুক, এটা কৌশলগত কারণেই ভারত সরকার চায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থক ছাড়া আর কাউকে যুদ্ধে নেওয়া হবে না। এই প্রতিবন্ধকতার জন্য ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা প্রাথমিকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। আগস্ট মাসে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর ডি পি ধর আমার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ-কর্মীদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এর পর মুক্তিবাহিনীতে তাদের নেওয়া শুরু হয়। ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির কিছু নেতা-কর্মী প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়, কিন্তু তাদের কোনো একক কমান্ড ছিল না। এতে তাদের মধ্যে একটা হতাশার সৃষ্টি হয়। তখন আমি নিজে একটা পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করি যাতে মুজিব বাহিনী, ছাত্র ইউনিয়ন এবং অন্য গেরিলারা ঐক্যবদ্ধভাবে অপারেশন করতে পারে। এর জন্য আমি মুজিব বাহিনীর তোফায়েল আহমেদ এবং ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নুরুল ইসলামের সঙ্গে কয়েকটা বৈঠক করেছি।

তোফায়েল আহমেদ মুখে মুখে সম্মতি জানালেও কার্যক্ষেত্রে তার এই উত্তরের প্রতিফলন খুব একটা দেখতাম না। তবে নুরুল ইসলামের উৎসাহ ছিল। আমি কয়েকটা বৈঠক করার পর উপলব্ধি করি যে এখানে জোর খাটিয়ে কিছু করবার উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত আমার চেষ্টায় কোনো ফল হয়নি। অক্টোবরের দিকে ডি পি ধর মুজিব বাহিনী এবং অন্য সব গেরিলার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। জেনারেল বি এন সরকারও এ বিষয়ে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত মুজিব বাহিনী পৃথকভাবেই তৎপর ছিল।

ভারত সরকারের জ্ঞাতসারে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে আসার আগেই তারা (মুজিব বাহিনী) ভারতে ঢোকে এবং প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। তা না হলে ভারতে এসে তাদের যে অবস্থায় দেখেছি, সেই অবস্থায় থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ থেকে বোঝা যায়, মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব বেশ আগেই ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পন্ন করেছিল এবং হানাদার বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই তারা সীমান্ত পেরিয়ে পূর্বনির্ধারিত ব্যক্তির কাছে বা স্থানে পৌঁছে যায়। ভারতও তাদের জন্য দ্রুত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্রের বন্দোবস্ত করে। মুজিব বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে যেসব কর্মকাণ্ড করেছিল তা মুক্তিযুদ্ধকে কোনো গরিমা এনে দেয়নি বরং কলুষিত করেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই মুজিব বাহিনীর কিছু সদস্যই লুটপাটে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারা বঙ্গবন্ধু সরকারকে সহযোগিতা করা তো দূরের কথা বরং তাদের কর্মকাণ্ড সরকারকে ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন করে দেয়। মুজিব বাহিনী সৃষ্টির যে মূল লক্ষ্য ছিল, অর্থাৎ নতুন সরকারকে শক্তিশালী করা, তা মাঠে মারা যায়। তারা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্যের রূপ নেয়। কিছুদিন পর তো তারা সরাসরি অবস্থান নেয় সরকার তথা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধেই।

নৌ-কমান্ডো

মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জলপথে হানাদার বাহিনীর যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম স্থানান্তর এবং পাকিস্তান থেকে খাদ্যসামগ্রী ও সেনাসদস্যদের পরিবহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য নৌ-কমান্ডো গঠন করা হয়। এ ছাড়া যুদ্ধের শুরু থেকে পাকিস্তানি সামরিক সরকার দাবি করে আসছিল যে দেশের পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে না। তার জবাবে বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে একটি বড় ধরনের অভিযান চালিয়ে অনেকগুলো জাহাজ ডুবিয়ে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া দরকার ছিল যে বাংলাদেশে যুদ্ধ চলছে। নৌ-কমান্ডোরা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন নদী ও সমুদ্রবন্দরকে অকার্যকর করার জন্য অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করে। তাদের অভিযানগুলোর প্রায় সবগুলোই খুব সফল হয় এবং পাকিস্তান বাহিনীকে নদীপথ ব্যবহারে খুব বেকায়দায় ফেলে দেয়।

নৌ-কমান্ডো বাহিনী গড়ে উঠেছে মূলত পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে লুকিয়ে আসা আটজন বাঙালি সাবমেরিনারকে কেন্দ্র করে। ১৩ মে নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠন করা হয়। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ ও অভিযান পরিচালিত হতো। গোপনীয়তার প্রয়োজনে নৌ-কমান্ডোদের সংবাদ মাত্র পাঁচ-ছয়জন ব্যক্তির মধ্যে সীমিত থাকত। আমি তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। সফলতার বিচারে মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোদের অবদান অনেক বেশি। তারা সংখ্যায় ছিল মাত্র ৫০০ জনের কাছাকাছি। অথচ আগস্ট মাস থেকে পরিচালিত তাদের অভিযানগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের নৌপথ প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নৌ-কমান্ডোদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও অভিযানের পুরোটাই ভারতীয়রা এককভাবে করেছে। তবে এই বাহিনীর

সফলতার জন্য যা যা সাহায্য ও সহযোগিতা করা সম্ভব ছিল, তা আমরা করেছি। মুক্তিযুদ্ধে এই নৌ-কমান্ডোদের অবদান বিশেষ স্বীকৃতির দাবি রাখে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানপক্ষ ত্যাগ করে ফ্রান্স থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া কয়েকজন সাবমেরিনারের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। এদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারি যে কীভাবে তারা ফ্রান্স থেকে লুকিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠন করেছে। আমার নিজের সম্পৃক্ততা এবং নৌ-কমান্ডোদের কাছ থেকে তাদের বর্ণনার ভিত্তিতে এই বাহিনীর শুরু ও প্রথম একটি অভিযানের বর্ণনা দিলাম।

১৯৭০-৭১ সালে পাকিস্তান ফ্রান্স থেকে একটি সাবমেরিন ক্রয় করে। সাবমেরিনটির নাম ছিল ম্যানগ্রো। এটি ১৯৭০ সালের ৫ আগস্ট ফ্রান্সে কমিশন হয়। সাবমেরিনটি মার্চ মাসে ফ্রান্সের তুলোঁ বন্দরে অবস্থান করছিল। সাবমেরিন ম্যানগ্রোতে পাকিস্তান নৌবাহিনীর মোট ৫৭ জন নাবিক প্রশিক্ষণরত ছিল, যার মধ্যে বাঙালি ছিল ১৩ জন। ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চে প্রশিক্ষণ শেষ করে ১ এপ্রিল সাবমেরিনটি পাকিস্তানের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল।

বিদেশি গণমাধ্যম ২৫ মার্চ রাতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শুরু হওয়া হত্যাযজ্ঞের সংবাদ গুরুত্বসহকারে প্রচার করে। এই সংবাদ শুনে তুলোঁতে অবস্থানরত বাঙালি নাবিকেরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তানে ফেরত আসার বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। তারা বিদেশি গণমাধ্যমের সাহায্যে জানতে পারে, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক জনসাধারণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ শুরু করেছে। অপর দিকে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সাধারণ জনগণ সীমানা অতিক্রম করে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। ২৬ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনে তাদের মধ্যে ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিছু একটা করার কথা চিন্তা করে। প্রথমে তারা সাবমেরিনটি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে তারা আলোচনার মাধ্যমে এই পরিকল্পনা পরিবর্তন করে জাহাজ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের পেছনে দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, ফ্রান্সের মাটিতে পাকিস্তানি জাহাজ ধ্বংস করলে বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের বিপক্ষে যাবে, উপরন্তু জাহাজ ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক ও অন্যান্য সরঞ্জাম এত অল্প সময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আর যদি সাবমেরিনটি ধ্বংস করেই ফেলে, তবে তাদের বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা নির্ঘাত ধরা

পড়বে এবং বিচারে তাদের ফাঁসি হবে। দ্বিতীয়ত, লুকিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তারা পাকিস্তানকে নাজেহাল করতে পারবে।

সাবমেরিনে প্রশিক্ষণরত ১৩ জন বাঙালি নাবিকের মধ্যে ৯ জন গাজী মো. রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানপক্ষ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাকি ৪ জন সাবমেরিনারের পরিবার পাকিস্তানে থাকায় তারা পাকিস্তানপক্ষ ত্যাগ করতে রাজি হয়নি। কিন্তু তারা প্রতিজ্ঞা করে, পাকিস্তান পক্ষত্যাগী দলটির গন্তব্য কোথায় তা তারা কিছুতেই ফাঁস করবে না। ৯ জন নাবিকের মধ্যে আবদুল মান্নান পথ ভুল করে লন্ডনে চলে যায়। বাকি ৮ জন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্পেনের মাদ্রিদ থেকে বিমানে রোম হয়ে ভারতে এসে উপস্থিত হয়। পাকিস্তান নৌবাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৮ জন দুঃসাহসী সাবমেরিনার হলো: ক. গাজী মো. রহমতউল্লাহ (বীর প্রতীক, পরে লেফটেন্যান্ট), চিফ রেডিও আর্টিফিসার; খ. সৈয়দ মো. মোশাররফ হোসেন, ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার; গ. আমিন উল্লাহ শেখ (বীর বিক্রম), ইলেকট্রিক আর্টিফিসার; ঘ. বদিউল আলম (বীর উত্তম), ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল; ঙ. আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (বীর উত্তম, পরে কমোডর), রেডিও অপারেটর; চ. আহসানউল্লাহ (বীর প্রতীক), ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল; ছ. আবদুর রকিব মিয়া (বীর বিক্রম, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ), ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক; এবং জ. আবিদুর রহমান (বীর বিক্রম), স্টুয়ার্ড। এই দলটিই ছিল বিদেশে অবস্থানরত পাকিস্তান সামরিক বাহিনী থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রথম এবং বড় আকারের একটি সামরিক দল। এই সাবমেরিনারদের সহযোগিতায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় নৌবাহিনীর সমরবিদেরা একটি নৌ-কমান্ডো দল গঠন করে। নৌ-কমান্ডোরা মুক্তিযুদ্ধে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নৌপথকে পাকিস্তানিদের জন্য অনিরাপদ করে তোলে। ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা এই ৮ জন বাঙালি নাবিককে ঘিরে প্রায় ৪০০ জনের নৌ-কমান্ডো দল গঠন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

সাবমেরিনাররা মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য ফ্রান্স থেকে ভারত পর্যন্ত চলে আসার যে লোমহর্ষ বর্ণনা আমাকে দেয়, তা সত্যই শিহরণ জাগানোর মতো। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ম্যানগ্রোতে প্রশিক্ষণরত বাঙালি নাবিকেরা বিবিসির সংবাদে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যার কথা জানতে পারে। সংবাদ শোনার পর বাঙালি

নাবিকদের চোখেমুখে উদ্বেগ আর প্রতিশোধের দাবানল দানা বাঁধে। এ সময় সাবমেরিনে অবস্থানরত অবাঙালি নাবিকেরা বাঙালিদের সান্ত্বনাসূচক বক্তব্য দেয়, যা বাঙালি নাবিকদের কাছে আরও বিরক্তিকর মনে হয়। এর পর বাঙালি নাবিকেরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে। পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করে তারা। একাধিক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে তারা মতবিনিময় করে এবং একে অপরের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করে। বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তুলোঁ ঘাঁটি থেকে যেকোনো উপায়ে লুকিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। প্রথমেই তাদের ফ্রান্স ত্যাগ করে অন্য কোনো দেশে পাড়ি জমাতে হবে। এরপর সুবিধামতো সময়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে পৌঁছাবে। এ সিদ্ধান্তের কথা পাকিস্তানিরা যাতে বুঝতে না পারে সে জন্য তারা যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করত এবং কাজকর্ম ও আচার-আচরণে স্বতঃস্ফূর্ততা বজায় রাখত।

২৭ মার্চ বিকেল পাঁচটায় নিত্যদিনকার কর্তব্য শেষে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ৯ জন বাঙালি নাবিক পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য গোপনে মিলিত হয়। সাবমেরিনটি তুলোঁ ঘাঁটি ত্যাগ করার দুদিন আগেই বাঙালি নাবিকেরা তাদের সব মালপত্র নেভাল মেস থেকে সাবমেরিনে উঠিয়ে দেয়। বাঙালি নাবিকদের প্রতি পাকিস্তানিদের আস্থা দৃঢ় করা ও বাঙালি নাবিকদের পলায়নের পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহ যেন না হয়, তার জন্যই তারা এই কাজটি করে। নাবিকদের পাসপোর্ট ও কিছু অর্থ জাহাজের একটি লকারে গচ্ছিত ছিল। আবদুর রকিব মিয়া ও আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী জাহাজের কি-বক্স থেকে লকারের চাবি নিয়ে অর্থ ও পাসপোর্টগুলো নিজেদের সংগ্রহে নিয়ে নেয়। কাজটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হলেও তারা সাহসের সঙ্গে তা সম্পন্ন করে। তারা জানত, এই কাজে ধরা পড়লে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার স্বপ্ন পূরণ হবে না, তার পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তাদের এতটা উদ্বুদ্ধ করে যে মৃত্যুর আশঙ্কাও তাদের এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পরদিন অন্য কারণ দেখিয়ে বদিউল আলম ও আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী জাহাজ থেকে ছুটি নেয়। আসল উদ্দেশ্য বিমানের টিকিট কেনা। পরে নিরাপত্তার অভাব হতে পারে বিবেচনা করে বিমানের পরিবর্তে তারা রেলপথে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সন্ধ্যায় আবার মিলিত হয় তারা। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয়, সাবমেরিন ম্যানগ্রো ফ্রান্স থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগের দিন, অর্থাৎ ৩১ মার্চ রাত এগারোটার ট্রেনে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশে তারা তুলোঁ থেকে যাত্রা

করবে। ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় ৯ জন বাঙালি নাবিক কেনাকাটার কথা বলে একজন একজন করে সাবমেরিন ত্যাগ করে। ঘাঁটি ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে বাঙালি নাবিকেরা তাদের সিদ্ধান্তের কথা তুলোঁতে অবস্থানরত কিছু আফ্রিকান বন্ধুর কাছে প্রকাশ করলে তারা বাঙালি নাবিকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকান নাবিক-বন্ধুদের সহায়তায় প্রত্যেকে ছোট একটি ব্যাগ বন্দরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। বাঙালি নাবিকেরা বিভিন্ন পথ ধরে তুলোঁ শহরের পূর্বনির্ধারিত একটি স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হয়। সেখান থেকে ভিন্ন ভিন্ন যানবাহনে চড়ে বিচ্ছিন্নভাবে তুলোঁ থেকে এক শ কিলোমিটার দূরে ফ্রান্সের অপর শহর মারশেঁ এসে পৌঁছায়। মারশেঁতে বাঙালি নাবিকদের পৌঁছে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুরা ফিরে যায়।

রাত এগারোটার দিকে মারশেঁ রেলস্টেশনে পৌঁছার পর নৌসেনাদের প্রত্যেকের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তুলোঁ ঘাঁটি থেকে পলায়ন খুব ঝুঁকিপূর্ণ হলেও তারা এতে সফল হয়েছে। পরবর্তী গন্তব্য সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরের উদ্দেশে যাত্রার আগে তারা লক্ষ করে যে তাদের দলের সাবমেরিনার আবদুল মান্নান মারশেঁ পৌঁছায়নি। তার অনুপস্থিতি নিয়ে সবার মধ্যে একটা উদ্বেগের জন্ম নেয়। মান্নান ধরা পড়েছে না অন্য কোনো সমস্যা হয়েছে তারা বুঝতে পারছিল না। এ ধরনের সংকটময় মুহূর্তে কারও জন্য অপেক্ষা করা বা কারও খোঁজ নেওয়ার মতো সময় তাদের ছিল না।

রাত এগারোটায় ট্রেন। সময় নেই বললেই চলে। ট্রেন ছাড়ার হুইসেল বেজে ওঠে। ৮ জন বাঙালি নাবিক ট্রেনের কামরায় চড়ে বসে। দেখতে দেখতে ট্রেন ছেড়ে দেয়।

জেনেভা শহর তুলোঁর নিকটতম সীমান্ত শহর। ১ এপ্রিল সকাল আটটায় তারা জেনেভা শহরসংলগ্ন সীমান্তে এসে পৌঁছায়। গাড়ি থেকে নেমে সীমান্ত পার হয়ে জেনেভা শহরে প্রবেশ করতে হয়। বাঙালি নাবিকদের কাছে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ছিল, কিন্তু সুইজারল্যান্ডে প্রবেশের ভিসা না থাকায় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাদের জেনেভায় ঢুকতে বাধা দেয়। কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন রকম যুক্তি উপস্থাপন করে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে তারা বোঝাতে চেষ্টা করে যে তারা সাময়িকভাবে জেনেভায় ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। নৌবাহিনীর শিক্ষানবিশ হওয়াতে তাদের ভিসা দেওয়া হয়নি। এসব যুক্তিতে কোনো কাজ হলো না। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রবেশের অনুমতি দিল না। এদিকে তারা সত্য কথা, অর্থাৎ সাবমেরিন ছেড়ে পালিয়ে আসার কথাও বলতে পারছিল না। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বাঙালি নাবিকদের চেকপোস্ট-

সংলগ্ন একটি কামরায় আটকে রাখে। এর মধ্যে আবার তাদের পাসপোর্টগুলোও ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে। এ সময় তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। জেনেভা পুলিশ যদি কোনোভাবে তাদের বক্তব্যে সন্দেহ করে এবং পালানোর বিষয়টি টের পায় অথবা কোনো কিছু না ভেবে স্বাভাবিক নিয়মেই সুইজারল্যান্ড বা ফ্রান্সে পাকিস্তান দূতাবাসকে অবহিত করে, তাহলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পরিকল্পনাই যে কেবল ব্যর্থ হবে তা নয়, তাদের জীবনও বিপন্ন হয়ে উঠবে। দুশ্চিন্তায় তারা চারদিকে অন্ধকার দেখতে থাকে। সবাই বিচলিত হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কাটানোর পর একজন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা পাসপোর্টগুলো নাবিকদের ফিরিয়ে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জানায় যে তাদের পুনরায় ফ্রান্সে ফিরে যেতে হবে; কারণ, ভিসা ছাড়া কাউকেই জেনেভায় ঢুকতে দেওয়া হয় না। এই মুহূর্তে পুলিশের কাছে তাদের পরিচয় প্রকাশ হওয়ার চেয়ে ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে তারা ভেতরে ভেতরে খুব আনন্দিত হয়।

১ এপ্রিল বিকেল পাঁচটায় পলাতক দলটি ফ্রান্সের প্যারিস শহরে ফিরে আসে। প্যারিসে এসে তারা গোপনে পাকিস্তান দূতাবাসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে সাবমেরিনটিকে বিদায় জানাতে দূতাবাসের সবাই তুলোঁ গেছে। নাবিকেরা নিশ্চিত হলো যে ম্যানগ্রো তুলোঁ বন্দর ত্যাগ করছে। এ সময় তারা ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা ভাবে যে বেশি সময় প্যারিসে থাকা নিরাপদ নয়। তাই তারা ফ্রান্সের অপর শহর লিয়নে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। লিয়ন ফ্রান্সের একটি বড় শহর। শহরে লোকসংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বেশি। তারা ধরে নেয় যে এখানে আত্মগোপন করা তাদের জন্য সহজ হবে। পরদিন তারা লিয়নের উদ্দেশে যাত্রা করে।

সাবমেরিন তুলোঁ ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার আগেই বাঙালি নাবিকদের পলায়নের বিষয়টি পাকিস্তানি কর্মকর্তারা জানতে পারে। কিন্তু তারা তাদের যাত্রা বিলম্বিত করেনি। পাকিস্তানিদের শঙ্কা হয় যে বিষয়টি জানাজানি হলে ফরাসি কর্তৃপক্ষ সাবমেরিন হস্তান্তর বা বন্দর ত্যাগে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই পাকিস্তানি দূতাবাসের কর্মকর্তারা বিষয়টি গোপন রাখে। ১ এপ্রিল ম্যানগ্রো তুলোঁ ঘাঁটি ছেড়ে স্পেনের একটি বন্দরে পৌঁছালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ৯ জন বাঙালি নাবিকের পলায়নের ঘটনা ফ্রান্স কর্তৃপক্ষকে জানায়। ৯ জন বাঙালি নাবিকের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও স্পেনের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পলাতক বাঙালি নাবিকদের খুঁজে বের করার

জন্য জোর তৎপরতা চালায়। পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্তান দূতাবাসের লোকজনও হন্যে হয়ে জাহাজ ত্যাগকারী বাঙালি নৌসেনাদের খুঁজতে থাকে।

নাবিকেরা এক দিন এক রাত পর লিয়ন শহরে এসে পৌঁছায়। তিনটি হোটেলে ৮ জন সাবমেরিনার ভারতীয় ভ্রমণকারী পরিচয় দিয়ে কামরা ভাড়া নেয়। পুলিশ তাদের খুঁজছে এই সংবাদ জানতে পেরে তারা পরবর্তী কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা শুরু করে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। প্রত্যেক হোটেলে তখন ফরাসি গোয়েন্দাদের তল্লাশি শুরু হয়ে গিয়েছে। হোটেলমালিক সন্দেহের বশে নৌসেনাদের পরিচয়পত্র দেখাতে বলে। তারা পরিচয়পত্র দেখাতে না পারায় হোটেলমালিক তাদের হোটেল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। এই হোটেল ছেড়ে অন্য হোটেল খোঁজার সময়ও হোটেলমালিকেরা তাদের পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও ভিসা দেখতে চায়।

কোথাও তারা আশ্রয় পায় না। তারা খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ে। নাবিকেরা বুঝতে পারে যে ফ্রান্সে থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর লিয়ন শহরতলিতে এক মহিলার মালিকানাধীন দুটি অখ্যাত হোটেলে তারা অবস্থান নেয়। নাবিকদলটি হোটেল কর্তৃপক্ষকে তাদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য অনুরোধ করে। আর এ জন্য হোটেলের ভাড়া হিসেবে তাদের অনেক বেশি টাকা দিতে হয়। তারা দিনের বেলায় হোটেলে থাকত আর রাতের বেলায় তিন-চার ভাগে বিভক্ত হয়ে ফ্রান্স থেকে অন্য দেশে যাওয়ার পথ খুঁজতে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করত। গোয়েন্দা বিভাগের হাতে সবাই যেন একসঙ্গে ধরা না পড়ে সে জন্য তিন-চার ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা শহরে ঘুরে বেড়াত।

গাজী মো. রহমতউল্লাহ লিয়নের এক টুরিস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে স্পেন সরকার তিন মাসের জন্য কেবল পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসা ছাড়া স্পেনে প্রবেশের একটি ঘোষণা দিয়েছে। নোটিশটিতে লেখা ছিল, 'শুধু পাকিস্তানিরা তিন মাসের জন্য ভিসা ছাড়া স্পেনে প্রবেশ করতে পারবে'। সে হোটেলে ফিরে এসে বিষয়টি দলের অন্যদের অবহিত করে। হোটেলে ফেরার সময় সে স্পেনের একটি পর্যটক গাইড এবং একটি ম্যাপ কিনে নিয়ে আসে। তার এই সংবাদ বাঙালি নাবিকদের কিছুটা স্বস্তি দেয়। তারা সময় নষ্ট না করে স্পেনের উদ্দেশে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পরের দিন সকালে তারা স্পেনের সীমান্তে পোর্টবো রেলস্টেশনে এসে পৌঁছায়। এখানকার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে পাকিস্তানি পাসপোর্ট দেখাতেই তারা নাবিকদের কোনো বাধা না দিয়ে স্পেনে ঢোকার অনুমতি দেয়।

নাবিকেরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরের কম পরিচিত একটি হোটেলে আশ্রয় নেয়, যাতে তাদের অবস্থান সম্পর্কে কেউ জানতে না পারে। পোর্টবো থেকে তারা বার্সেলোনা যাওয়ার উদ্দেশে রেলস্টেশনে আসে। সেখান থেকে প্রায় একই সময়ে দুটি ট্রেন বার্সেলোনার উদ্দেশে রওনা হয়। নাবিকেরা ভুলবশত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই ট্রেনে উঠে বসে এবং বার্সেলোনার উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। তারা বার্সিলোনা শহরে পৃথক পৃথক সময়ে এসে পৌঁছায়। একে তো অন্য দেশ, তার ওপর ভাষার সমস্যা, অপর দিকে আবার ধরা পড়ারও ভয়। বার্সেলোনা এসে তারা হোটেলের সন্ধান করতে গিয়ে বুঝতে পারে যে এই শহরটিও তাদের জন্য নিরাপদ নয়। বহু স্থানে ঘোরাঘুরি করে পৃথক হয়ে যাওয়া দল দুটি বিভিন্ন হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে। দুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর নাবিকেরা একে অন্যের সন্ধান পায় এবং এক হোটেলে একত্র হয়। হোটেলটিতে স্পেনের পুলিশ ও পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মকর্তারা খুঁজতে এলে হোটেলমালিক তাদের জানায় যে নাবিকেরা হোটেলে রাত্রিযাপন করে সকালে চলে গেছে। তল্লাশির খবর নাবিকেরা জানার পরপরই তারা দ্রুত মাদ্রিদে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পরদিন তারা মাদ্রিদে এসে পৌঁছায়। গাজী মো. রহমতউল্লাহ এবং সৈয়দ মো. মোশাররফ হোসেন ভারতীয় দূতাবাসে যায়। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অনুপস্থিত থাকায় নাবিকেরা চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মি. বেদির সঙ্গে দেখা করে। নাবিকেরা মি. বেদিকে তাদের পরিচয় ও পাকিস্তানপক্ষ ত্যাগের কথা জানায়। তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে মি. বেদির সহযোগিতা কামনা করে। মি. বেদি উত্তরে বলেন, 'আমরা তো অনেক আগেই আপনাদের সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করেছিলাম। আপনারা ইচ্ছা করলে প্যারিসেই ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় নিতে পারতেন।' তার এমন কথা শুনে নাবিকেরা আবেগে কোনো কথা বলতে পারছিল না। আসলে মি. বেদির কাছ থেকে ইতিবাচক ও বন্ধুসুলভ আচরণে তারা অবাক না হয়ে পারেনি। একটি অনিশ্চিত যাত্রার পথ এত সহজে সমাধান হয়ে যাবে, তারা তা কল্পনাও করতে পারেনি। দূতাবাসের কর্মকর্তারা ইতিবাচক সমর্থন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা হোটেলে ফিরে এসে দলের অন্যদের নিয়ে বিকেলে পুনরায় দূতাবাসে যায়।

বাঙালি নাবিকদের ডুবোজাহাজ ম্যানগ্রো থেকে পলায়নের সংবাদ ইউরোপীয় বেতার মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার ইউরোপে অবস্থিত সব ভারতীয় দূতাবাসে গোপন তারবার্তার মাধ্যমে জানিয়ে দেয় যে পলাতক সাবমেরিনারদের সন্ধান পাওয়ামাত্রই যেন তাদের

রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের মাদ্রিদ দূতাবাসেও এই বার্তা পৌঁছে যায়। মি. বেদি নাবিকদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন এবং প্রত্যেককে ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে পৃথক পৃথক আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর কাছ থেকে পরবর্তী কোনো সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি নাবিকদের হোটেলের অভ্যন্তরেই আত্মগোপন করে থাকতে বলেন। স্প্যানিশ পুলিশ ও গোয়েন্দা এবং পাকিস্তান দূতাবাসের লোকেরা তাদের যে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ কথাও মি. বেদি তাদের জানিয়ে দেন। দূতাবাসের কাজ সম্পন্ন করে নৌসেনাদল পুনরায় হোটেলে ফিরে আসে। ভারত সরকার বাঙালি নাবিকদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে রাজি হওয়ায় ভারতীয় পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য তারা পাকিস্তানি পাসপোর্টগুলো ভারতীয় দূতাবাসের কাছে সমর্পণ করে। মাদ্রিদ ত্যাগ করার আগে তাদের আরও দুই-একদিন একই হোটেলে থাকতে হয়।

বিদ্রোহী নাবিক দলটিকে বিমানে তুলে দেওয়ার পরপরই ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধিরা মাদ্রিদ বিমানবন্দরে একটি সাংবাদ সম্মেলন করেন। সম্মেলনে তাঁরা পাকিস্তানপক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি নাবিকদের ভারত সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার কথা প্রথমবারের মতো প্রকাশ করেন। সাংবাদিকদের তাঁরা এ খবরও জানিয়ে দেন যে বিদ্রোহীরা বিমানে করে ভারতের উদ্দেশে রোমের পথে রওনা হয়ে গিয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই সংবাদটি বিবিসি বিশেষ বুলেটিনের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেয়। খবরটি শোনার পর রোমের গণমাধ্যম-কর্মী ও পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মকর্তারা তৎপর হয়ে ওঠে। বিদ্রোহী নাবিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য সাংবাদিকেরা রোম বিমানবন্দরে আসে। আর বিদ্রোহী নাবিকদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পাকিস্তানি দূতাবাসের কর্মীরাও উপস্থিত হয় বিমানবন্দরে। অন্যদিকে নাবিকদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আসেন ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তারা। রোম বিমানবন্দরে সৃষ্টি হয় নাটকীয় পরিবেশের।

রোমে অবতরণের পরপরই বিদেশি সাংবাদিকেরা নাবিকদের ঘিরে ধরে। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে একজন বিদ্রোহী নাবিক সত্য প্রকাশ করে। সে বলে, 'আমরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যই ভারত হয়ে বাংলাদেশে যাব। মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করব।' এ সময় সেখানে উপস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মকর্তারা পাকিস্তানি নাগরিক দাবি করে নাবিকদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে একরকম জোর করে গাড়িতে ওঠানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের ত্বরিত হস্তক্ষেপে তারা

বিমানবন্দর-সংলগ্ন একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দূতাবাসের অনুরোধে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য কড়া পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করে। পাকিস্তানি দূতাবাস ইতালি সরকারকে জানায় যে ভারতীয় দূতাবাসের লোকেরা কয়েকজন পাকিস্তানিকে জোর করে ভারতে নিয়ে যাচ্ছে; তারা এসব নাবিককে উদ্ধার করে পাকিস্তানি দূতাবাসে হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় দূতাবাসের লোকজন অতি দ্রুত সুইস এয়ারলাইনসের টিকিট সংগ্রহ করে ৮ জন নাবিককে পুলিশের প্রহরায় বিমানে তুলে জেনেভার পথে রওনা করিয়ে দেয়। সুইস এয়ারলাইনসের বিমানটি জেনেভা হয়ে বোম্বে যাচ্ছিল।

জেনেভা বিমানবন্দরে নামার পর সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসের লোকেরা নাবিকদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে নিয়ে যায়। এর আগে পলাতক নাবিকেরা জেনেভা প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এবারের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। তখন তাদের পরিচয় ছিল পাকিস্তানি নাগরিক এবং মনে ছিল ধরা পড়ার আশঙ্কা। এবার এসেছে বাঙালি পরিচয় নিয়ে এবং তাদের ভেতর কোনো সংশয় ছিল না। যদিও অনিবার্য কারণে তাদের সঙ্গে ভারতীয় পাসপোর্ট ছিল। এখানে নাবিকদের নিরাপত্তার ত্রুটি না থাকলেও অল্পক্ষণেই কয়েকজন পাকিস্তানি কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের ফিরিয়ে নিতে সম্ভাব্য সব রকম উদ্যোগ নেয়। পাকিস্তানিদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ নাবিকেরা বাংলাদেশে ফেরত আসার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। সুইস বিমানে ওঠার সময় ভারতীয় কর্মকর্তারা নাবিকদের সতর্ক করে বলে যে পাকিস্তানিরা তাদের গতিরোধ করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। সুতরাং লাউঞ্জ থেকে বিমানে ওঠা পর্যন্ত তারা যেন অপরিচিত কারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলে। তাদের দুজন দুজন করে চারটি দলে বিভক্ত হয়ে বিমানে ওঠার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিদ্রোহী নাবিকদলটি সব বাধা এবং পাকিস্তানিদের অনুরোধ ও প্রলোভন উপেক্ষা করে বিমানে যার যার আসনে গিয়ে বসে পড়ে। বিমানটি মুহূর্তেই উড্ডয়ন করে। এখন তাদের সামনে শুধু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার স্বপ্ন।

৮ এপ্রিল বিমানটি বোম্বের মাটি স্পর্শ করার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী নাবিকদলটির তুলোঁ নৌঘাঁটি থেকে অনিশ্চিত যাত্রাপথের অবসান হয়। ৮ জন বাঙালি নাবিকের পাকিস্তানপক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সংবাদ সারা বিশ্বে প্রচারিত হওয়ায় বিষয়টি পাকিস্তান সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। এই দলের সদস্যদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার বিরাট অঙ্কের

পুরস্কারের ঘোষণা দিলেও তা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহী নাবিকদের অবর্তমানে সামরিক আদালতে বিচার করে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়।

৮ এপ্রিল বিকেলে আটজন নাবিক বোম্বে থেকে নয়াদিল্লিতে এসে পৌঁছায়। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে তাদের দিল্লির হোটেল রণজিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। হোটেল রণজিতেই বিদ্রোহী নাবিকদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার মি. শর্মার সঙ্গে। মি. শর্মা ভারতীয় নৌবাহিনীর একজন দক্ষ এবং বিচক্ষণ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও কৌশলী। তিনি ৮ জন নাবিকের থাকা-খাওয়াসহ সব রকম সুযোগ-সুবিধার নির্দেশ দেন। এখানে ভারতীয় সামরিক ও নৌবাহিনীর গোয়েন্দা কর্মকর্তারা নাবিকদের বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। দিল্লিতে আমাকেসহ পাকিস্তান বিমানবাহিনীর অন্য সদস্যদের পাকিস্তানপক্ষ ত্যাগ করার কারণ এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ভারতীয় গোয়েন্দারা যেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, ঠিক একই পদ্ধতিতে পালিয়ে আসা নাবিকদেরও ভারতীয় গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করে। ভারতীয় গোয়েন্দারা নৌসেনাদের কাছ থেকে পাকিস্তানপক্ষ ত্যাগের কারণ ও লক্ষ্যের কথা জানতে চায়। তারা যুদ্ধপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কী করতে চায়, এ কথাও জেনে নেয়। জিজ্ঞাসাবাদে ভারতীয় গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয় যে বাঙালি নাবিকেরা গুপ্তচরবৃত্তি কিংবা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে ভারতে আসেনি। তারা যে তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার ব্রত এবং অদম্য সাহস বুকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্যই সংকল্পবদ্ধ, জিজ্ঞাসাবাদের পর এ ব্যাপারে ভারতীয়দের আর সন্দেহ থাকে না।

নৌবাহিনীর ৮ জন সদস্যের ভারতে এসে পৌঁছানো এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর চিন্তা শুরু হয় যে কীভাবে এদের ব্যবহার করা যায়। নাবিকদের মনোবল, একাগ্রতা ও দেশের প্রতি অদম্য ভালোবাসা দেখে ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার মি. শর্মা একটি নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য গাজী মো. রহমতউল্লাহকে নির্দেশ দেন। ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এস এম নন্দা, গোয়েন্দা কর্মকর্তা রায় চৌধুরী এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানী কমান্ডার শর্মার কমান্ডো বাহিনী তৈরির পরিকল্পনায় উৎসাহ দেখান।

বিদ্রোহী নাবিকদলটির সঙ্গে আরও কিছুসংখ্যক মুক্তিসেনা নিয়ে নৌ-কমান্ডো গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে চাকরিরত আরও আটজন বাঙালি সদস্য পালিয়ে এসে নৌ-কমান্ডো দলে

যোগ দেয়। নৌ-কমান্ডো গঠনের পরিকল্পনা ভারতীয়রা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কার্যকর করে। প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশিদের মধ্যে বিষয়টি শুধু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, কর্নেল ওসমানী জানতেন। পরবর্তী সময়ে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আহমেদ রেজা ও আমি জানতাম। সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা নৌ-কমান্ডো গঠন করে জ্বালানিবাহী পাকিস্তানি নৌজাহাজ আক্রমণ করব এবং জাহাজে ধারণকৃত জ্বালানি তেল ধ্বংস করে দেব। এতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চলাচল বাধাগ্রস্ত হবে। এটা ছিল আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তু। পরবর্তী সময়ে নৌ-কমান্ডোদের জন্য আরও অনেক লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল। নৌ-কমান্ডোদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির গঠনের আগে, এই ৮ জন সাবমেরিনারকে দিল্লিসংলগ্ন যমুনা নদীতে দুই সপ্তাহের ডুবুরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদের পলাশীতে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী একটি জনশূন্য দুর্গম এলাকায় নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। জায়গাটি ছিল ঘন জঙ্গল আর সাপের রাজ্য। সাপের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য নৌ-কমান্ডোরা ক্যাম্পের চারপাশে নালার মতো গর্ত করে এতে কাঁটাযুক্ত গাছের ডালপালা ফেলে রাখত। এতে সাপের উপদ্রব কিছুটা কমে আসে। ক্যাম্পের আশপাশে কোনো লোকালয় ছিল না। নৌ-কমান্ডো ট্রেনিং ক্যাম্পের সাংকেতিক নাম ছিল সি-২-সি। ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার এম এন সামন্ত নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ এবং অভিযানের সমন্বয়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ক্যাম্পের সার্বক্ষণিক পরিচালক ছিলেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার জি মার্টিস। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজা নৌ-কমান্ডো শিবিরে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কিছুদিনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার ছিল না। কারণ ক্যাম্পের চারপাশ জঙ্গলে ঘেরা। আমি নৌ-কমান্ডোদের কর্মতৎপরতা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে কমান্ডার এম এন সামন্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম এবং নিয়মিতভাবে কমান্ডোদের খোঁজখবর নিতাম।

নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক। প্রথমে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো দীর্ঘ সময় সাঁতার কাটার। এরপর তাদের দীর্ঘ সময় পানির নিচে ডুবে থাকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তাদের প্রতিদিনই এ ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে হতো। এরপর কয়েক দিন কেবল ফিনস পায়ে সাঁতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পরবর্তী ধাপে প্রত্যেক কমান্ডোকে শরীরের সঙ্গে গামছা দিয়ে চার-পাঁচ কেজি ওজনের মাটির ঢিবি বা ইট বেঁধে সাঁতার কাটতে

মুর্শিদাবাদের পলাশীতে প্রশিক্ষণরত বাংলাদেশি নৌ-কমান্ডো

হতো। সাঁতার কাটার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে পানির নিচে বিস্ফোরক স্থাপন ও বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তা তাদের শেখানো হতো। বিস্ফোরক প্রশিক্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ প্রশিক্ষণ। পানির ভেতর কোনো বিস্ফোরণ ঘটলে ৫০০ গজের মধ্যে অবস্থানরত যেকোনো প্রাণীর (মাছ, মানুষ, জলজন্তু ইত্যাদি) ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড ফেটে যেতে পারে। তাই কমান্ডো দলের এই প্রশিক্ষণ চলত অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ও যত্নসহকারে। বিস্ফোরক ব্যবহারের যথাযথ বিধিবিধান রপ্ত করতে না পারলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এর

ব্যবহার রপ্ত করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। নৌ-কমান্ডোদের অস্ত্র চালানো, গ্রেনেড ও বিস্ফোরক চার্জ করা সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রথম দিকে প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন যুব শিবির থেকে ২০০ জনের মতো প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়। তারপর ক্রমশ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তিন ব্যাচে মোট ৪৯৯ জন সাঁতারুকে নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া দলটিতে আগে থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৮ জন সাবমেরিনার এবং ৮ জন বাঙালি নাবিক ছিল। ফলে নৌ-কমান্ডোদের মোট সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৫১৫ জনে।

১৩ মে শপথবাক্য পাঠের মাধ্যমে নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। নৌ-কমান্ডোদের বেশির ভাগ ছিল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এদের বেশির ভাগ এসেছিল ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, মাদারীপুর, বরিশাল ও চাঁদপুর অঞ্চল থেকে। এরা আগে থেকেই সাঁতারে দক্ষ ও অসমসাহসী ছিল। নৌ-কমান্ডোদের বিশেষ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ২০-২৫ মাইল সাঁতার কাটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোরা যে বিস্ফোরক বা মাইন ব্যবহার করত, তার নাম ছিল লিমপেট মাইন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য যুগোস্লাভিয়া মাইনগুলো তৈরি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মাইনগুলো অব্যবহৃত ছিল। নৌ-কমান্ডোদের ব্যবহারের জন্য ভারত এ ধরনের দুই হাজার মাইন কেনে যুগোস্লাভিয়া থেকে। প্রতিটি মাইনের মূল্য ছিল এক হাজার দুই শ ইউএস ডলার। পানির নিচে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা মাইনগুলোর কাঠামোগত কিছুটা পরিবর্তন করেন। যেমনটি করা হয়েছিল ভারত থেকে প্রাপ্ত বেসামরিক বিমানগুলোকে সামরিক বিমানে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে। মাইনগুলোর প্রতিটির ওজন ছিল পাঁচ কেজি। নৌ-কমান্ডোরা একটি বা দুটি মাইন পৃথক পৃথকভাবে গামছার সাহায্যে পেট অথবা বুকের সঙ্গে বেঁধে অন্ধকারের মধ্যে সাঁতার কেটে শত্রু-জাহাজের গায়ে অথবা যেকোনো লোহার কাঠামোর সঙ্গে স্থাপন করার কৌশল রপ্ত করে।

নৌ-অভিযানের সময় কমান্ডোদের সঙ্গে অস্ত্র বলতে থাকত একটি করে ছোরা বা বড় চাকু। এটা তাদের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত হতো না। বরং এটা অভিযানের অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা হতো। জাহাজের একটি অংশ যেহেতু পানির নিচে থাকত, তাই এই অংশে অনেক শেওলা জমে যেত। মাইন লাগানোর আগে জাহাজের গায়ে জমে থাকা শেওলা পরিষ্কার করার জন্য ধারালো চাকু বা ছোরার প্রয়োজন পড়ত। মাইন লাগানোর পর

সেফটিপিন খুলে নৌ-কমান্ডোরা দ্রুত স্থান ত্যাগ করত। নৌ-কমান্ডোদের হিসাব করে মাইন দেওয়া হতো। মাইন দেওয়ার সময় বলে দেওয়া হতো যে সেফটিপিন খুলে নিয়ে আসার জন্য। এতে প্রমাণিত হতো যে কমান্ডো সত্যি সত্যি মাইনটি ব্যবহার করেছে। ফলে সব নৌ-কমান্ডো সেফটিপিনটি নিয়ে আসার বিষয়ে সতর্ক থাকত। নৌ-কমান্ডো জানত যে অভিযানে বিভিন্নভাবে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। যেমন, জাহাজে মাইন লাগাতে গিয়ে শত্রুর হাতে ধরা পড়া, মাইনের বিস্ফোরণের আওতায় পড়ে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্ষতিসাধন হওয়া, ঘূর্ণমান প্রবল স্রোতের তোড়ে ছিটকে পড়া কিংবা জলে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণে মৃত্যু হওয়া। এসব কারণে তাদের অভিযান পরিচালনায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো।

অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে নৌ-কমান্ডোদের অভিযানের পরিকল্পনা করা হতো। অভিযানকারীদের লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পথকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হতো এবং একেকটি অংশের জন্য একজন করে পথপ্রদর্শক থাকত। এই পথপ্রদর্শকেরা জানত না যে অভিযানকারীদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল কোথায়। পরবর্তী গন্তব্যের জন্য ভিন্ন একজন পথপ্রদর্শক থাকত। সে জানত না অভিযানকারীরা কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে অথবা পূর্ববর্তী পথপ্রদর্শক কে ছিল। সর্বোচ্চ সতর্কতার ফলে শত্রু ও অন্য কারও পক্ষে অভিযানকারীদের লক্ষ্যবস্তু এবং গতিপথ জানা সম্ভব হতো না। এভাবে খুব গোপনে নৌ-কমান্ডোরা অভিযান পরিচালনা করত।

নৌ-কমান্ডোদের আক্রমণ শুরু হয় ১৫ আগস্ট। প্রথম অভিযানে পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে বিভিন্ন নদী ও সমুদ্রবন্দরে একযোগে অভিযান চালানো হয়েছিল। প্রথম অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন জ্যাকপট'। পলাশীতে নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ চলাকালে অপারেশন জ্যাকপটের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। অপারেশন জ্যাকপটের পরিকল্পনা এবং কার্যকরের দায়িত্ব ছিল ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিংয়ের ওপর। মধ্য জুলাই থেকে বাংলাদেশের নদীবন্দরের অবস্থা, শত্রুসৈন্যের অবস্থান ও শক্তি, বন্দরে পৌঁছানোর সম্ভাব্য নিরাপদ পথ, আশ্রয়স্থল, নদী ও সমুদ্রবন্দরের টাইডাল চার্ট, মানচিত্র, সাংকেতিক নির্দেশনা, কমান্ডোদের চলাচল ও নিরাপত্তার জন্য সাহায্যকারী দল এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা হয়। সব বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার পর অপারেশনের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারিত হয় ১৪ আগস্ট। এই দিন ছিল পাকিস্তানের জাতীয় দিবস। পাকিস্তানি প্রশাসন স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, ফলে নৌঘাঁটিগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা কিছুটা শিথিল থাকবে।

বিষয়টি অন্যভাবেও চিন্তা করা যেতে পারে, অর্থাৎ পাকিস্তানি বাহিনী ১৪ আগস্টে আক্রমণের আশঙ্কা বিবেচনা করে কঠোর নিরাপত্তাও নিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিলও তা-ই। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে সম্ভাব্য গেরিলা আক্রমণের আশঙ্কায় পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, স্থান ও বন্দরগুলোতে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং নদীপথে টহল জোরদার করা হয়। তাই এদিন অপারেশন চালানো ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করে অপারেশনের তারিখ পরিবর্তন করে ১৫ আগস্ট নির্ধারণ করা হয়। এই পরিবর্তন করা হয়েছিল একেবারে শেষ মুহূর্তে, যখন কমান্ডোরা সবাই লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে ১৬ আগস্ট আক্রমণ চালানো হয়।

অপারেশন জ্যাকপটে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৬০ জন নৌ-কমান্ডোকে ছয়টি দলে বিভক্ত করা হয়। ক. প্রথম দল গঠিত হয় চট্টগ্রাম বন্দর আক্রমণের জন্য, যার সদস্য ছিল ৬০ জন। খ. দ্বিতীয় দল গঠিত হয় চাঁদপুর বন্দর আক্রমণের জন্য, যার সদস্যসংখ্যা ছিল ২০; গ. তৃতীয় দল গঠিত হয় নারায়ণগঞ্জ বন্দর অভিযানের জন্য, যার সদস্য ছিল ১২ জন; ঘ. চতুর্থ দল গঠিত হয় মংলা বন্দর আক্রমণের জন্য, যার সদস্য ছিল ৪৮ জন; ঙ. পঞ্চম দল গঠিত হয় দাউদকান্দি ফেরিঘাট আক্রমণের জন্য, যার সদস্যসংখ্যা ছিল ৮; এবং চ. ষষ্ঠ দল গঠিত হয় হিরণ পয়েন্ট আক্রমণের জন্য, যার সদস্য ছিল ১২ জন।

অপারেশন জ্যাকপটের গোপন ও টেকনিক্যাল বিষয়গুলো অবহিত করার জন্য প্রতিটি দলের দলপতিকে বিশেষ বিমানযোগে দিল্লিতে নেওয়া হয়। দলপতিদের চূড়ান্ত পরিকল্পনা অবহিত করার পর ১ আগস্ট তাদের একইভাবে বিশেষ বিমানযোগে কলকাতা হয়ে পলাশীতে ফেরত নিয়ে আসা হয়। ১ আগস্ট শেষরাত থেকে কমান্ডো দলগুলো নিজ নিজ অপারেশন এলাকার উদ্দেশে পলাশী ক্যাম্প ত্যাগ করতে থাকে।

অপারেশন জ্যাকপট কার্যকর করতে নৌ-কমান্ডোরা ভারতীয় সীমান্তরেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশের পর কোন দল কোন পথে যাবে, যাত্রাপথে কোথায় কোথায় অবস্থান নেবে, কোথায় কাদের সঙ্গে মিলিত হবে এবং অপারেশনের সময় নিকটবর্তী কোন নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান নেবে তা সব সদস্যকে সবিস্তারে জানিয়ে দেওয়া হয়। অপারেশনের সময় কিংবা আগে-পরে কেউ হারিয়ে গেলে অথবা দলছুট হয়ে পড়লে সে ক্ষেত্রে কী করণীয় এবং সর্বোপরি অপারেশন শেষে ফিরতি যাত্রায় কীভাবে কোন পথ

ধরে পলাশী পর্যন্ত আসতে হবে, তা-ও সুনির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়। অভিযানের সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় পথপ্রদর্শক ও সহায়কশক্তি হিসেবে নৌ-কমান্ডোদের প্রতিটি দলের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন গেরিলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংগীত বা গানের মাধ্যমে অভিযানের সিগন্যাল পাওয়ার জন্য প্রতিটি কমান্ডো দলের দলনেতাকে একটি করে ছোট রেডিও বা ট্রানজিস্টার দেওয়া হয়। শুধু দলনেতাকে জানানো হয় যে নির্ধারিত রেডিও স্টেশন থেকে কমান্ডো আক্রমণের আগে সাংকেতিক দুটি গান বাজানো হবে। গানগুলো নির্দিষ্ট দিনে আকাশবাণী কলকাতা 'খ' কেন্দ্রের সকালবেলার অধিবেশনে বাজানো হবে। এই গানকে দলনেতা আক্রমণের নির্দেশ বা গানটি যথাসময়ে বাজানো না হলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকার বার্তা হিসেবে গণ্য করবে। প্রথম গানটি ছিল পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান/ তার বদলে আমি চাইনি কোনো দান'। এই গানের মর্মার্থ ছিল যে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন সম্পন্ন করার সব প্রস্তুতি নিতে হবে, আর দ্বিতীয় গানটি শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। দ্বিতীয় গানটি ছিল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি/ ওরে, তোরা সব উলুধ্বনি কর।' এর অর্থ ছিল যে এখন থেকে ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টার্গেটে আঘাত হানতে হবে। তবে প্রথম গানটি বাজানোর ২৪ ঘণ্টা পর যদি দ্বিতীয় গানটি বাজানো না হয়, তাহলে কমান্ডোরা অভিযানে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে দ্বিতীয় গানটি শোনার জন্য অপেক্ষা করবে।

নৌ-কমান্ডোরা অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। বিশেষ করে, চট্টগ্রাম বন্দরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দরে ১৫ আগস্ট রাতে ১০টি লক্ষ্যবস্তু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস বা পানিতে নিমজ্জিত হয়। ওই রাতে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রায় ৫৫ হাজার টন দ্রব্যসামগ্রীসহ কয়েকটি জাহাজ প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয় এবং চারদিকে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে। নৌ-কমান্ডো দলের চট্টগ্রাম বন্দর আক্রমণের কিছু কথা প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে উল্লেখ করছি।

২ আগস্ট দুপুরে চট্টগ্রাম বন্দর আক্রমণের জন্য তৈরি দলটি সামরিক বাহিনীর দুটি ট্রাকে পলাশী প্রশিক্ষণ ঘাঁটি ত্যাগ করে। দলে মোট কমান্ডো ছিল ৬০ জন। এদের কমান্ডার ছিলেন সাবমেরিনার আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী। রাত নয়টার দিকে ট্রাকগুলো ব্যারাকপুর সেনানিবাসে এসে

পৌঁছায়। কমান্ডো দলটি এখানে রাত্রি যাপন করে। পরের দিন ভোরবেলা সামরিক বাহিনীর ডাকোটা বিমানে তাদের নিয়ে আসা হয় ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায়। এখানে এক গভীর জঙ্গলের ভেতরে গোপন বিমানঘাঁটিতে তাদের বিমান থেকে নামানো হয়। তখনো তারা জানে না যে তাদের গন্তব্য কোথায়। এখানে তাদের অভ্যর্থনা জানান ভারতীয় অফিসার মেজর রায়। আগরতলা শহর থেকে পাঁচ-সাত মাইল উত্তরে শালবন এলাকায় আগে থেকেই তাঁবু খাটিয়ে তারকাঁটার বেড়া দিয়ে 'নিউ ক্যাম্প' নামের একটি ট্রানজিট শিবির তৈরি করা হয়, যার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল বিএসএফ।

নিউ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল চট্টগ্রাম, দাউদকান্দি, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুর অভিযানের জন্য মনোনীত নৌ-কমান্ডোদের জন্য। এ ক্যাম্পের কাছাকাছি দূরত্বেই একটি বিএসএফ ক্যাম্প ছিল। ২ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ট্রানজিট ক্যাম্পও ছিল সেখানে। বাংলাদেশে নৌ-অভিযান শুরু হওয়ার পর পরবর্তী সময়ে নিউ ক্যাম্প নৌ-কমান্ডোদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়। কমান্ডো অভিযান শেষে ফিরতি পথেও তারা এই ক্যাম্পে একত্র হতো। এখানেই তারা অপারেশনের সাফল্য-ব্যর্থতা যাচাই করত। অপারেশনে কোনো সহযোদ্ধা শহীদ হয়েছে কি না, কিংবা দলের সবাই ভারতে ফিরে আসতে পেরেছে কি না, তা যাচাইয়ের নিরাপদ কেন্দ্র ছিল নিউ ক্যাম্প। প্রথম দিকে কমান্ডোরা অপারেশন শেষে নিউ ক্যাম্প হয়ে পলাশীতে ফিরে এলেও পরবর্তী সময়ে কমান্ডোরা নিউ ক্যাম্প কিংবা পলাশীতে ফিরে আসত না। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জলসীমায় নিরবচ্ছিন্নভাবে অভিযান চালাত, তাই তাদের আর ভারতে যেতে হতো না। নিউ ক্যাম্পের অধিনায়ক ছিলেন ২ নম্বর সেক্টরের মেজর এ টি এম হায়দার (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।

৬ আগস্ট অপারেশন জ্যাকপটের দায়িত্বে থাকা ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং কমান্ডো দলগুলোকে বিদায় জানাতে নিউ ক্যাম্পে আসেন এবং অপারেশনের ব্রিফিং দেন। নিউ ক্যাম্পে দলগুলোকে চূড়ান্ত পরিকল্পনা জানানো হয়। দুদিন পর্যন্ত নিউ ক্যাম্পে কমান্ডোদের সব রকম প্ল্যানিং, ব্রিফিং, সমন্বয়, নদীগুলোর গতিপথ ও ম্যাপ, জোয়ার-ভাটার সময়, স্রোতের গতি এবং আরও অসংখ্য তথ্য অবহিত করা হয়। তা ছাড়া যাত্রাপথে কোথায় কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, কিংবা লক্ষ্যবস্তুতে প্রহরীরা কোথায় কীভাবে পাহারার ব্যবস্থা করেছে, তা-ও জানিয়ে দেওয়া হয়।

আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম বন্দর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল পাকিস্তান নৌবাহিনীর চারটি গানবোটসহ বেশ কয়েকটি টহল নৌযান। বন্দরে শতাধিক কর্মকর্তা, ২ হাজার নাবিক ও ক্রু কর্মরত ছিল। বন্দরের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য পূর্ব ও পশ্চিমাংশে নিয়োজিত করা হয় ৯৭ পদাতিক ব্রিগেডের ১ কোম্পানি সৈন্য।

এই অভিযানের সার্বিক গোপনীয়তা এবং পরিকল্পনা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের তৎকালীন বাঙালি সচিব মিসবাহ উদ্দিন খানের মাধ্যমে বাংলাদেশের নদী ও সমুদ্রবন্দরের টাইডাল চার্ট আগেই সংগ্রহ করা হয়েছিল, যা অপারেশন জ্যাকপটের পরিকল্পনায় বেশ সাহায্য করে। অভিযানের লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত চলাচলের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করে ১ নম্বর সেক্টর।

নৌ-কমান্ডোরা যখন নিউ ক্যাম্প থেকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ লক্ষ্যবস্তুর দিকে রওনা হয়, তখন তাদের বিদায় জানাতে আমি আগরতলা গিয়েছি। ৮ আগস্ট নিউ ক্যাম্প ছেড়ে চট্টগ্রাম অভিযানের পুরো দল সামরিক ট্রাকে হরিণা ক্যাম্পে এসে পৌঁছায়। এখানে কমান্ডো গ্রুপের দলনেতা আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী ১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর রফিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি ও সামরিক সরঞ্জাম বুঝে নেন। ছোট দলে চলাচলের সুবিধা ও গোপনীয়তার কথা বিবেচনা করে ৬০ জনের কমান্ডো দলকে ২০ জন করে ৩টি উপদলে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি দলে একজন করে কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। নিশ্চিত সাফল্যের কথা ভেবে নৌ-কমান্ডোদের মধ্যে সবচেয়ে চৌকস কমান্ডোদের পাঠানো হয় চট্টগ্রাম অভিযানে।

১৯৭১ সালের ১৩ আগস্ট আকাশবাণী কলকাতা 'খ' কেন্দ্র থেকে সকালে কাঙ্ক্ষিত প্রথম গানটি প্রচারিত হলো—'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান/ তার বদলে আমি চাইনি কোনো দান।' গান শোনার পর দলনেতা আক্রমণের সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এরই মধ্যে নৌ-কমান্ডোদের পুরো দল বিভিন্ন পথ ধরে গোপনে চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি তাদের গোপন আস্তানায় এসে অবস্থান নিয়েছে। ১৪ আগস্ট দ্বিতীয় গানটি বাজানোর কথা থাকলেও তা বাজানো হয়নি। জানা যায়, পাকিস্তানিরা জাতীয় দিবস উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে। তাই অপারেশন জ্যাকপটের চূড়ান্ত আক্রমণের সময় ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। ১৫ আগস্ট সকালে আকাশবাণীর 'খ' কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠানে 'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি/ ওরে, তোরা সব উলুধ্বনি কর' গানটি বাজানো হয়। নৌ-কমান্ডোরা ১৫ আগস্ট দিবাগত রাতে

বন্দরে অভিযান পরিচালনা করে কর্ণফুলী নদীর ওপারে চলে যায়। আগে থেকেই কয়েকজন বিশ্বস্ত ও নির্বাচিত গ্রামবাসীকে জানানো হয়েছিল যে ১৫ আগস্ট রাতে তাদের গ্রামে কিছু লোক আসবে, তারা যেন তাদের (কমান্ডোদের) থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে। গ্রামবাসী সেটা যথাযথভাবে পালন করে। সৌভাগ্যবশত ওই অভিযানে আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। ১৫ আগস্টে নৌ-কমান্ডোদের সফল অভিযানের পরপরই ১ নম্বর সেক্টর থেকে গোপনে অভিযানের ফলাফল ও পাকিস্তানিদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা হয় এবং ২৩ আগস্ট তারবার্তার মাধ্যমে ভারতীয় বাহিনীর ডেলটা সেক্টর ও আগরতলায় কর্নেল রবের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারবার্তাটি পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য পরিশিষ্ট ৫ হিসেবে সংযুক্ত করেছি।

নৌ-কমান্ডোদের অভিযানে চট্টগ্রাম বন্দরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে বন্দরে নোঙর করা বিদেশি জাহাজগুলো চলে যেতে আরম্ভ করে। এই ঘটনার পর অন্যান্য দেশের জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করতে ভয় পেত। ফলে বন্দরে বিদেশি জাহাজ আসা কমে যায়। যারা বন্দরে আসার জন্য রাজি হতো, তারা এত বেশি ভাড়া দাবি করত যে পাকিস্তানের পক্ষে তা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ত। এতে পাকিস্তানি সৈন্যদের যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ বিঘ্নিত হয়, ফলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে যুদ্ধের ওপর।

একই দিন একই সময়ে, অর্থাৎ ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে চট্টগ্রামসহ মংলা সমুদ্রবন্দর, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর এবং ১৬ আগস্ট দাউদকান্দি নদীবন্দরে সমন্বিত অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানগুলোতে মোট ২৬টি জাহাজ, টাগ, গানবোট, ফেরি নিমজ্জিত হয়, যা পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা।

অপারেশন জ্যাকপটের মংলা বন্দর অভিযানের দলনেতা ছিলেন আহসানউল্লাহ বীর প্রতীক, চাঁদপুর বন্দর অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বদিউল আলম বীর উত্তম, নারায়ণগঞ্জ বন্দর অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন আবেদুর রহমান বীর বিক্রম। বিজয় অর্জন পর্যন্ত মোট ১৫০টি অভিযান চালিয়ে নৌ-কমান্ডোরা ১২৬টি জাহাজ/টার্গেট ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে নৌ-কমান্ডো দলের সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নদীপথে তাদের আক্রমণের পরিধি বিস্তৃত করে এবং কার্যকর অভিযান পরিচালনা করে।

বিমানবাহিনী

মুক্তিযুদ্ধে বিমানবাহিনী গঠনের ইতিহাস বর্ণনার আগে এই বাহিনী গড়ে তুলতে যাঁরা আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালি তরুণ কর্মকর্তা এবং বিমানসেনারা সক্রিয়ভাবে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিতে পারেননি বা তা সম্ভবও ছিল না, কিন্তু পরোক্ষভাবে ও গোপনে তাঁরা অনেক কাজ করেছিলেন। সে মুহূর্তে তাঁদের একটি অংশ আমার কাছে তাঁদের করণীয় সম্পর্কে উপদেশ প্রত্যাশা করেছিল। তরুণ কর্মকর্তাদের দুঃসাহসিক অন্তর্ঘাতমূলক কাজে জড়িত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল, এটা আঁচ করতে পেরে আমি এসব কর্মকর্তার কর্মকাণ্ডে সংযম ও সহনশীলতা আনার চেষ্টা করি। আন্দোলনের বাস্তবতা উপলব্ধি করেই ধীর ও দৃঢ়পদে পরিকল্পিত পন্থায় এগিয়ে যাবার পরামর্শ দিই এবং তাঁদের পেশাগত কাজ বা অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে বলি। এ উপদেশ পাওয়ার পরও কিছুসংখ্যক তরুণ কর্মকর্তা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে পাকিস্তানি সরকারের নৃশংস পদক্ষেপের বিরুদ্ধে চরম ও যথার্থ প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সব গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বাঙালি কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেয়, ফলে বাঙালি বিমানসেনাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় বাঙালি বিমানসেনাদের সামনে মাত্র একটি পথই খোলা থাকে আর তা হলো, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে নেওয়া।

বিমানবাহিনীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় পালানো খুব একটা সহজ বিষয় ছিল না। পাকিস্তানিদের সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করা ঝুঁকিপূর্ণ ও

দুঃসাধ্য ছিল। পাশাপাশি পালানোর পর পাকিস্তানিদের অবর্ণনীয় অত্যাচার থেকে আত্মীয়স্বজনদের রক্ষা করার প্রশ্নটিও উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। বিবাহিত বিমানসেনাদের জন্য বিষয়টি ছিল আরও জটিল। তাঁদের বেশির ভাগই থাকতেন ক্যান্টনমেন্টের সবচেয়ে দূরবর্তী কুর্মিটোলা এলাকায়। সেই সময়ে কুর্মিটোলা এলাকার সঙ্গে মূল ঢাকা শহরের যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত ছিল না। তাই সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছিল আরও দুরূহ। তার পরও বিমানবাহিনীর বহু কর্মকর্তা ও বিমানসেনা তাঁদের সর্বস্ব ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এসব ত্যাগী দেশপ্রেমিককে পাকিস্তানিরা 'স্বপক্ষত্যাগী' (ডিফেক্টেড) বলে অভিহিত করে। ঢাকা বিমানঘাঁটি থেকে প্রথম কিছু তরুণ কর্মকর্তা পাকিস্তানপক্ষ ত্যাগের সাহস দেখান।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পরপরই তারা সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে জয়দেবপুরে মিলিত হয়ে সীমান্তবর্তী মতিনগর এলাকায় সরে যায়। একই সময়ে আরও কিছু অফিসার অন্য পথ ধরে গোপনে সরাসরি ভারতে প্রবেশ করে। বৈমানিকদের মধ্যে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সদরুদ্দিন ও ফ্লাইং অফিসার নুরুল কাদের কুমিল্লার ভেতর দিয়ে ভারতের আগরতলায় পৌঁছান। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ এক বন্ধুর গাড়িতে দাউদকান্দি ফেরি পর্যন্ত যান। সেখানে গাড়ি থেকে নামার সময় স্থানীয় কিছু পাকিস্তানি সমর্থক বা তাদের গোয়েন্দা বাহিনীর চর সুলতান মাহমুদের বেশভূষা দেখে সন্দেহ করে এবং তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে। সুলতান মাহমুদের বন্ধু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে গাড়ি নিয়ে সরে পড়েন। কোনো উপায় না দেখে সুলতান মাহমুদ ভরা মেঘনায় ঝাঁপ দেন এবং কপালগুণে জোয়ারের টানে হোমনার দিকে গিয়ে কূলে উঠতে সমর্থ হন। সেখান থেকে নবীনগর হয়ে তিনি মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন। এভাবে বাঙালি বৈমানিকেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য একাকী বা দল বেঁধে ভারতে পাড়ি জমাতে থাকেন।

১৯৭১-এর মে মাসের মধ্যে আমিসহ পাকিস্তান বিমানবাহিনী থেকে উইং কমান্ডার আবুল বাশার, স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম (বীর উত্তম, পরে গ্রুপ ক্যাপ্টেন), ফ্লাইং অফিসার বদরুল আলম (বীর উত্তম, পরে স্কোয়াড্রন লিডার) এবং পিআইএ ও অন্যান্য বেসামরিক সংস্থার বৈমানিক ক্যাপ্টেন শাহাবউদ্দীন আহমদ (বীর উত্তম), ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ (বীর উত্তম), ক্যাপ্টেন এ এস এম আবদুল খালেক (বীর প্রতীক, স্বাধীনতার পর বিমান দুর্ঘটনায় নিহত),

ক্যাপ্টেন কাজী আবদুস সাত্তার (বীর প্রতীক, আলমগীর সাত্তার নামে পরিচিত), ক্যাপ্টেন শরফুদ্দিন আহমেদ (বীর উত্তম, স্বাধীনতার পর বিমান দুর্ঘটনায় নিহত) প্রমুখ ভারতে পাড়ি জমাই। এসব বৈমানিক মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করতে আগ্রহী ছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা স্থলযুদ্ধে মুক্তিসেনাদের বীরোচিত আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছিল। কিন্তু আকাশ থেকে কোনো প্রতিরোধের ভয় তাদের ছিল না। বাঙালি বৈমানিকেরা মুক্তিযুদ্ধকে আকাশেও টেনে নিতে উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন যে বাংলাদেশের সব গ্রামগঞ্জ, নদীনালা, বনজঙ্গল যেমন পাকিস্তানিদের জন্য অনিরাপদ, আকাশও তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠুক। এখানেও মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে তুলুক।

আমরা তিনজন জ্যেষ্ঠ বাঙালি বৈমানিক, অর্থাৎ উইং কমান্ডার এম কে বাশার, উইং কমান্ডার (অব.) এস আর মীর্জা ও আমি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিই। তুলনামূলকভাবে তরুণ অথচ অভিজ্ঞ বৈমানিকদের মধ্যে ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রহিম, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম সদর উদ্দিন, ফ্লাইং অফিসার লিয়াকত আলী খান (বীর উত্তম, পরে স্কোয়াড্রন লিডার। তিনি পাকিস্তানে ছিলেন। সেখান থেকে কৌশলে বাংলাদেশে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন), ফ্লাইং অফিসার সাখাওয়াত হোসেন, ফ্লাইং অফিসার বদরুল আলম, ফ্লাইং অফিসার শামসুল আলম এবং ফ্লাইং অফিসার নুরুল কাদের। তাঁদের সার্বিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রামে সক্রিয় সহায়তা প্রদান এবং একটি আকাশযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্র তৈরি করা। মে-জুন মাসের মধ্যে যেসব সামরিক ও বেসামরিক বৈমানিক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের যথোপযুক্ত কোনো দায়িত্ব দেওয়া যাচ্ছিল না। দায়িত্ব না পেয়ে কেউ কেউ সাধারণ সৈনিকের মতো সেক্টরে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর আমাকে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এবং উইং কমান্ডার বাশারকে ৬ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ ও ফ্লাইং অফিসার সাখাওয়াত হোসেন ১ নম্বর সেক্টরে, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের ৪ নম্বর সেক্টরে, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম সদর উদ্দিন ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রহিম ৬ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন। ফ্লাইং অফিসার লিয়াকত জেড ফোর্সে এবং ফ্লাইং অফিসার বদরুল আলম বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরে স্টাফ অফিসার নিযুক্ত হন। স্থলযুদ্ধে অনভিজ্ঞ এসব বৈমানিক

নিজেদের অসামান্য সাহসী যোদ্ধা হিসেবেই শুধু প্রতিপন্ন করেননি বরং অনেক ক্ষেত্রে সেক্টরে নিজেদের অপরিহার্য করে তুলেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে বিমানবাহিনী গঠিত হলে এঁদের কেউ কেউ সেক্টর থেকে এসে যোগ দেন বিমানবাহিনীতে।

মে মাসের মাঝামাঝি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পর থেকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠনে আমি সর্বোচ্চ ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। তখন থেকেই আমার ধ্যান-জ্ঞান সবকিছুই হয়ে ওঠে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠন। যদিও তখন সেটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। তবু উপযুক্ত স্থান-কাল-পাত্র পেলেই আমি আমার স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেছি। অবশেষে একদিন সত্যি সত্যি আমার যৌক্তিক স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

মে মাসে যখন কলকাতা হয়ে দিল্লি যাই, তখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে বিমানবাহিনী গঠন নিয়ে আলোচনা করি। তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করেন যে এ বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। মে মাসে প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি দিল্লি সফর করেন। সেখানে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কার্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে। আলোচনা-পরবর্তী সময়ে প্রধান সেনাপতি বিভিন্ন বিষয়কে একত্র করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। সেই প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে বৈমানিকেরা তাঁদের পেশা থেকে বেশি দিন দূরে থাকলে সমস্যা হবে। প্রধান সেনাপতির মন্তব্য নিচে দেওয়া হলো :

> ১৯৭১-এর মে মাসে লিখিতভাবে প্রদত্ত চাহিদার পরবর্তী সময়ে শত্রুদের বিমানঘাঁটি থেকে পালিয়ে এসে গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও উইং কমান্ডার পদবির দুজন চাকুরিরত জ্যেষ্ঠ অফিসার এবং বেশ কয়েকজন আধুনিক জেট বিমানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জঙ্গি বৈমানিক এবং প্রায় দুই শত গ্রাউন্ড ক্রু বাংলাদেশ বাহিনীতে (মুক্তিবাহিনী) যোগ দিয়েছেন। দিল্লিতে যাচাই শেষে অফিসারদের বর্তমানে বাংলাদেশ বাহিনীতে মাঠপর্যায়ের স্টাফ অফিসার হিসেবে অপব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়াও প্রাক্তন পিআইএর কিছু ক্যাপ্টেন/বৈমানিক আছেন, যাঁদের ফ্লাইংয়ে নিযুক্ত না রাখলে তাঁরা তাঁদের উপযুক্ততা হারাবেন। শত্রুকে আঘাত হানার জন্য এঁদের আকাশে উড্ডয়নের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

বেশ কয়েক মাস পর, সম্ভবত আগস্ট মাসের প্রথম দিকে হঠাৎ একদিন তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর কার্যালয়ে ভারত সরকারের সচিব কে বি লাল, ভারতীয় বিমানবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডার এয়ার মার্শাল

হরি চান্দ দেওয়ান ও ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তা অশোক রায়কে দেখতে পাই। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'এরা আপনার সাথে বিমানবাহিনী গঠন বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী।' কে বি লাল বললেন, 'এ মুহূর্তে আমাদের তো বিমান দেওয়ার সামর্থ্য নেই। আপনাদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমাদের স্কোয়াড্রনের সাথে আপনারা ফ্লাই করতে পারেন।' উত্তরে আমি বললাম, 'আপনাদের সাথে ফ্লাই করতে গেলে আমাদের বৈমানিকেরা কোন দেশের নিয়ন্ত্রণে থাকবে? কোন দেশের আইন মেনে চলবে? বাংলাদেশের আইন না ভারতের আইন?' প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'স্বভাবতই ভারতীয় আইন মেনে চলতে হবে।'

আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে বললাম, সবচেয়ে উত্তম সমাধান হবে যদি উনারা আমাদের জন্য কয়েকটি বিমান, কিছু আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য একটি এয়ার ফিল্ডের ব্যবস্থা করেন। আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞ বৈমানিক আছে। আমরা নিজেরাই প্রশিক্ষণ এবং অভিযান পরিচালনা করতে পারব। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেদিন এর চেয়ে বেশি আলোচনা হয়নি।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল পি সি লাল কলকাতায় আসেন। তিনি আমাকে তাঁর হোটেলে এক চা-চক্রে নিমন্ত্রণ করেন। চা-চক্রে তাঁর স্ত্রী ইলা লালও উপস্থিত ছিলেন। ইলা লাল ছিলেন বাঙালি। মি. পি সি লাল অত্যন্ত ভদ্রলোক ও বিনয়ী ছিলেন। আলোচনায় মুক্তিবাহিনীর বিমান উইং গঠন বিষয়ে কথাবার্তা হয়। প্রাথমিকভাবে মি. পি সি লাল বাংলাদেশকে বিমান দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতার কথা তুলে ধরেন। একপর্যায়ে আমি বলি, 'স্যার, এখন তো পুরোদমে গেরিলাযুদ্ধ চলছে, ভবিষ্যতে আমাদের বিমানও চালাতে হতে পারে। তখন বিমানের প্রথম আক্রমণটি আমরাই করতে চাই।' শুনে তিনি মৃদু হাসলেন।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনায় বিমানযুদ্ধে আমাদের প্রশিক্ষিত বৈমানিকদের ব্যবহারের বিষয়টি আলোচিত হতে থাকে। পাশাপাশি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ থেকে যুদ্ধবিমান না পাওয়া গেলে নিজস্ব উদ্যোগে যুদ্ধবিমান ক্রয়ের বিভিন্ন প্রস্তাবও অস্থায়ী সরকারের কাছে আসতে থাকে। এসব প্রস্তাব আসে মূলত প্রবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত পাকিস্তানি দূতাবাসে বাঙালি কূটনীতিক কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন পর থেকে তাঁরা অনেকে পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য ত্যাগ করে

ভারতের ডিমাপুরে কিলো ফ্লাইটের সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে থাকেন। বাঙালি কূটনীতিকেরা যুদ্ধবিমানসহ বিভিন্ন আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের বাজার পর্যালোচনা করে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতেন। কিন্তু তখনকার বাস্তবতা এই পদ্ধতিতে যুদ্ধবিমান সংগ্রহ করার জন্য অনুকূল ছিল না, ফলে নিজস্ব উদ্যোগে যুদ্ধবিমান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

এর কিছু দিন পর এয়ার মার্শাল পি সি লাল আমাদের প্রশিক্ষিত ও যোগ্য জঙ্গি বিমানের বৈমানিকদের বিষয়ে দুটি প্রস্তাব পাঠান। প্রথম প্রস্তাবটি ছিল বৈমানিকদের ভারতীয় বিমানবাহিনীতে আত্তীকরণের মাধ্যমে ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল দুটি পুরোনো 'ভ্যামপায়ার' যুদ্ধবিমান দিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গড়ে তোলা। প্রস্তাব দুটির কোনোটিই খুব একটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। প্রথম প্রস্তাবটির বিপক্ষে আমি আগেও মত প্রকাশ করেছি। প্রস্তাব দুটির ওপর আমি আমার মতামত দিই, যা সম্ভবত ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছেছিল। প্রস্তাব ও আমার মতামত আমি পরিশিষ্ট ৬-এ তুলে ধরলাম।

সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে আমাকে জানানো হয় যে আমাদের বিমানবাহিনী গঠনে ভারতীয়রা সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে। এর পরপরই ভারতীয়রা

বাংলাদেশ সরকারকে একটি অটার বিমান, একটি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার এবং একটি ডিসি-৩ ডাকোটা (সি ৪৭) বিমান হস্তান্তর করে। বিমানগুলো আমাদের ঠিক কবে হস্তান্তর করা হয়েছিল, তা আমার এখন মনে নেই, তবে ২৮ সেপ্টেম্বরের আগেই আমরা অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ শুরু করি এই বিমানগুলো দিয়ে। আর ২৮ সেপ্টেম্বর ডিমাপুর এয়ার ফিল্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করি।

ভারতের দেওয়া বিমান তিনটি যুদ্ধবিমান ছিল না। এগুলো ছিল মূলত বেসামরিক বিমান। আমরা এই তিনটি বেসামরিক বিমানে পরিবর্তন এনে বিমানগুলোকে যুদ্ধের উপযোগী করে তুলি। যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য এগুলোতে কিছু সংযোজন আর বিয়োজন করতে হয়েছিল, যা স্বাভাবিক সময়ে অকল্পনীয়। সাধারণ অবস্থায় এই সব বিমানকে যুদ্ধে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। কিন্তু আমাদের তো সাধারণ অবস্থা ছিল না। আমাদের অসাধারণ অবস্থায় এই সব রূপান্তরিত অসাধারণ বিমানকে উড়তে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

বিমানগুলো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী উদ্যোগ বা তৎপরতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। যেমন কোথায় ও কবে থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হবে, প্রশিক্ষণের জন্য বৈমানিকদের কোথা থেকে কীভাবে পাওয়া যাবে ইত্যাদি। বাংলাদেশের বিমানসেনাদের ঠিকানা এবং তারা কোন ক্যাম্প বা সেক্টরে যুদ্ধ করছে, সেসব তথ্য আমাদের কাছে ছিল। তাই যুদ্ধরত বৈমানিক ও বাঙালি বিমানসেনাদের দ্রুত খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। ভারতীয় বাহিনী ওই সব বিমানসেনার সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত একত্র করতে এবং ডিমাপুরে উপস্থিত হতে আমাদের সাহায্য করে। এ সময় আমারা জানতে পারি যে বেশ কয়েকজন বেসামরিক বৈমানিক আগরতলায় অবস্থান করছেন, যাঁদের সহজে এবং দ্রুত প্রশিক্ষণে আনা সম্ভব। ফলে বিমানগুলো পাওয়ার পর বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠায় কোনো সময় ক্ষেপণ হয়নি।

অটার বিমানটি ছিল কানাডার ডিহ্যাভিল্যান্ড কোম্পানির তৈরি। ক্ষুদ্রকায় এই অটার বিমানে রকেট নিক্ষেপক সংযুক্ত করে 'ফাইটার' বিমানে রূপান্তর করা হয়। বিমানটির উভয় ডানায় ফ্রান্সের তৈরি সাতটি করে মোট চৌদ্দটি অত্যাধুনিক রকেট লঞ্চার সংযুক্ত করা হয়। সঙ্গে ফাইটার বিমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজনীয় মেশিনগানও সংযুক্ত করা হয়। এতে আরও সংযুক্ত করা হয় ২৫ পাউন্ড ওজনের ১০টি বোমা বহন-উপযোগী একটি মঞ্চ। তৃতীয় একজন ক্রু মঞ্চ থেকে বোমাগুলো নিক্ষেপ করবে।

অ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টারটি ছিল ফ্রান্সের তৈরি। যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য এই হেলিকপ্টারে সংযুক্ত করা হয়েছিল একটি ৩০৩ ব্রাউনিং মেশিনগান এবং দুটি রকেট নিক্ষেপক। দুই আধার থেকে সাতটি করে মোট ১৪টি রকেট নিক্ষেপ করা যেত। শত্রুর গুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর পেট বরাবর পাটাতনে প্রায় এক ইঞ্চি পুরু (২৫ মিলি) লোহার পাত লাগানো হয়েছিল।

ডিসি-৩ বিমানটি আমেরিকার ম্যাগডোনাল্ড ডগলাস কোম্পানির তৈরি। বিমানটি যোধপুরের মহারাজা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। বিমানটিকে পাঁচ হাজার পাউন্ড বোমা বহনকারী বোম্বার বা বোমাবর্ষণকারী বিমানে রূপান্তর করা হয়। যেহেতু বিমানটিতে বোমা রাখার কোনো জায়গা ছিল না, তাই আমরা বিমানটির পেট বরাবর নিচের দিকের অংশ কেটে বোমাগুলো রাখার ব্যবস্থা করি এবং সেখান থেকেই বোমাগুলোকে বিশেষ কায়দায় নিক্ষেপের উপযুক্ত সরঞ্জাম যুক্ত করি।

এভাবে আমরা বিমানগুলো প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত করে তুলি। প্রতিটি বিমানকে বিভিন্ন সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের বিমানে পরিণত করা হয়। তাই সামরিক ও বেসামরিক বৈমানিকদের নতুনভাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। সিলেট জেলার নিকটবর্তী ভারতের নাগাল্যান্ড প্রদেশের ডিমাপুরে এই নতুন ধরনের বিমানের সাহায্যে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ডিমাপুরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্মিত একটি বিমানঘাঁটি ছিল। ঘাঁটিটি ছিল প্রায় পরিত্যক্ত এবং এর আশপাশ একেবারে জনবসতিহীন ও জঙ্গলে ঘেরা ছিল। ডিমাপুর বিমানঘাঁটির বাইরে ছোট ছোট জনবসতি ছিল। ডিমাপুরের চারদিকে ছিল ছোট-বড় বেশ কিছু পাহাড়। এখানে ৫ হাজার ফুটের একটি রানওয়ে এবং একটি কন্ট্রোল টাওয়ার ছিল। সেখানে সিভিল অ্যাভিয়েশনের কয়েকজনমাত্র স্টাফ থাকত। প্রায় এক দশক ধরে এখানে বিশেষ কোনো বিমান ওঠানামা করত না। ভারতীয় সিভিল অ্যাভিয়েশনের মাত্র একটি এফ ২৭ বিমান সপ্তাহে একবার এখানে আসত। এই ঘাঁটিটি ভারতীয় বিমানবাহিনীর জোরহাট বেসের (ভারতের সবচেয়ে পুবের বিমানঘাঁটি, চীন-ভারত সীমান্তের কাছাকাছি) নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তারাই ডিমাপুর বিমানঘাঁটির সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত।

মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের বৈমানিকদের প্রশিক্ষণস্থল হিসেবে এটিকে নির্বাচন করা হয়। কম ব্যবহার হওয়ায় এখানে তেমন কোনো অবকাঠামো না থাকলেও কাজ চালানোর মতো অবস্থায় আনতে খুব একটা সময় লাগেনি বা

সমস্যাও হয়নি। সেখানে পরিত্যক্ত কিছু ভবন থাকলেও তার সব বাসোপযোগী ছিল না, সেগুলোতে সবার থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। বাঙালি বৈমানিক, প্রকৌশলী ও গ্রাউন্ড ক্রুরা বসবাসের জন্য নিজেরাই বাঁশ দিয়ে কিছু ঘর বানিয়ে নেয়। সেই সব বাঁশের ঘরের কাছেই রাখা হতো প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিমানগুলোও। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের খাওয়ার বন্দোবস্ত ডিমাপুর ঘাঁটির ভেতরেই ছিল।

বিমানগুলো ছিল ছোট ও ধীরগতিসম্পন্ন, তাই এইগুলোকে দিনে পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। শত্রুর বিমানবিধ্বংসী কামান অনেক সময় নিয়ে সহজেই আমাদের ধ্বংস বা ভূপাতিত করতে পারত। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, দিনের আলোতে আক্রমণের পরিবর্তে আমরা রাতে ফ্লাই করে টার্গেটে পৌঁছাব। এ কারণে আমাদের প্রশিক্ষণও রাতে হতো, যাতে অভিযান পরিচালনাকালে আমরা শত্রুর পর্যবেক্ষণকে ফাঁকি দিতে পারি। আক্রমণের জন্য বিমানে কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। অর্থাৎ বিমানটি কত উঁচু দিয়ে, কত গতিতে ও কোন দিকে যাচ্ছে, সেগুলো পরিমাপের কোনো যন্ত্র ছিল না। ফলে আমাদের অনুমান করে বিমান চলার উচ্চতা, গতি ও দিক নির্ধারণ করতে হতো। রাতের আঁধারে আলো ও যন্ত্রের অভাবে এসব আনুমানিক হিসাব-নিকাশ করতে হতো মনে মনে। অন্ধকারে এসব কাজ কত কঠিন বা বিপজ্জনক তা সাধারণভাবে প্রকাশ করা যায় না। এর জন্য সত্যিকার সাহসের প্রয়োজন হয়। হিসাব-নিকাশে সামান্য ভুল হলে যেকোনো বিপদ ঘটে যেতে পারে। সব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আমাদের বৈমানিক ও বিমানসেনারা অত্যন্ত সফলভাবে এর ব্যবহার করে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হয়।

২৪ অথবা ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিমাপুর ঘাঁটিতে মুক্তিবাহিনীর বৈমানিকেরা একত্র হন। আমিও কলকাতা থেকে ডিমাপুরে যাই। এদিন আমি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলমকে সঙ্গে করে বেসামরিক বিমানে আসামের গুহাটি পৌঁছাই। সেখান থেকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিমানে চড়ে এসে পৌঁছাই ডিমাপুরে। সেখানে কয়েকজন বাঙালি বৈমানিক আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে বলি, 'আমাদের অপেক্ষার দিন শেষ হয়েছে। আমরা প্রবাসে আমাদের বিমানবাহিনী গড়ে তুলতে যাচ্ছি এবং তোমরাই হবে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রথম অফিসার। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে তোমাদের স্বাগতম।' কিলো ফ্লাইটের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিমানসেনা সংগ্রহের জন্য ২৭ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ

বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে কিছু প্রতিনিধি বিভিন্ন সেক্টরে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা যশোর ও আগরতলার নিকটস্থ সেক্টরগুলো থেকে বিমানসেনাদের সংগ্রহ করেন। চূড়ান্তভাবে ৫৮ জন বৈমানিক ও বিমানসেনাকে ডিমাপুরে আনা হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ডিমাপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। বৈমানিকেরা ছাড়াও পাকিস্তান বিমানবাহিনী ছেড়ে আসা ৪৯ জন বাঙালি টেকনিশিয়ান আমাদের সঙ্গে ডিমাপুর বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। সেদিনকার অনুষ্ঠানে এয়ার চিফ মার্শাল পি সি লাল উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১টায় একটা ডাকোটা প্লেনে এয়ার চিফ মার্শাল পি সি লাল এয়ার মার্শাল দেওয়ানসহ আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ ভারতীয় বিমানবাহিনীর অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ডিমাপুর বিমানবন্দরে পৌঁছান। আমিসহ সব বৈমানিক বিমানবন্দরের টারম্যাক এরিয়ায় পি সি লালকে অভ্যর্থনা জানাই। কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠনের ঘোষণা দিই। প্রধান অতিথি হিসেবে এয়ার চিফ মার্শাল পি সি লাল সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। আমরা একত্রে সবাই মধ্যাহ্নভোজে অংশ নিই। এরপর পি সি লাল তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চলে যান। আমি পরদিন কলকাতায় ফিরে আসি। এই যাত্রা শুরুর অনুষ্ঠানে স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ যোগ
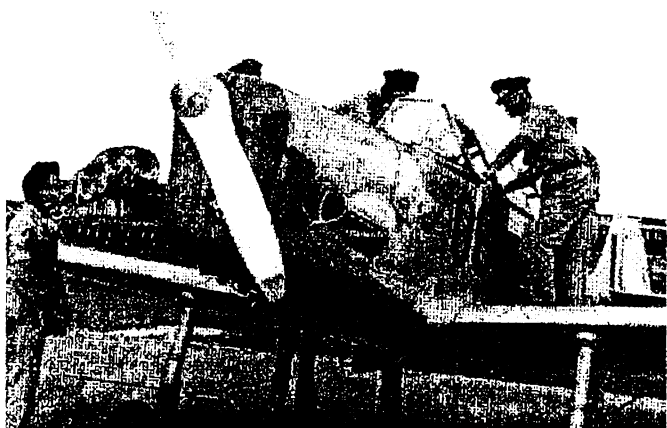
ভারতীয় বিমানঘাঁটিতে প্রশিক্ষণের জন্য একটি যুদ্ধবিমান দেখছি

দিতে পারেননি; কারণ, তিনি তখন চট্টগ্রামের মদুনাঘাট বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন অভিযানে পায়ে গুলির আঘাত পেয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১ নম্বর সেক্টরে অবস্থান করছিলেন। আমি সার্বক্ষণিকভাবে ডিমাপুরে না থাকার কারণে জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা হিসেবে সুলতান মাহমুদই সেখানকার প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন।

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তরে কর্মরত ফ্লাইং অফিসার বদরুল আলম মুক্তিবাহিনীর এই বিমানবাহিনীকে 'কিলো ফ্লাইট' নামে অভিহিত করার প্রস্তাব করেন। মুক্তিবাহিনীতে ইতিমধ্যে ব্যক্তির নামে (জিয়াউর রহমান, সফিউল্লাহ ও খালেদ মোশাররফ নামের আদ্যক্ষর নিয়ে যথাক্রমে 'জেড' 'এস' ও 'কে' ফোর্স) ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে, তাই বিমানবাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ আমার নামের আদ্যক্ষর দিয়ে (খন্দকারের 'কে') বিমানবাহিনীর নাম কিলো ফ্লাইট রাখার অভিমত দেওয়া হয়। এতে একদিকে আমাকে যেমন সম্মানিত করা হবে, তেমনি মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের কার্যক্রমকেও ছদ্মনামের আড়ালে রেখে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। প্রস্তাবটা যথার্থ হওয়ায় সেটা গৃহীত হয়।

৪ অক্টোবর বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর নামকরণ হয় 'কিলো ফ্লাইট'। বিমানবাহিনী গঠনের যে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শুরুতেই, সেটা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়, বলতে গেলে, মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষলগ্নে, অবশ্য একেবারে মোক্ষম সময়ে। ২৮ সেপ্টেম্বর আমরা বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণের সব কার্যক্রম শুরু করার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখটিকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হিসেবে পালন করা হতো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে আলাদাভাবে বিমানবাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন না করে সব বাহিনীর জন্য যৌথভাবে ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে কিলো ফ্লাইটের যাত্রা শুরুর লগ্নে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন: স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ফ্লাইং অফিসার বদরুল আলম, বেসামরিক বৈমানিক ক্যাপ্টেন আবদুল খালেক, বেসামরিক বৈমানিক ক্যাপ্টেন শরফুদ্দিন, বেসামরিক বৈমানিক ক্যাপ্টেন আবদুল মুকিত, বেসামরিক বৈমানিক ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ, বেসামরিক বৈমানিক ক্যাপ্টেন শাহাবউদ্দীন আহমেদ এবং বেসামরিক বৈমানিক ক্যাপ্টেন কাজী আবদুস

সাত্তার। কিলো ফ্লাইটের জন্মলগ্নে ডিমাপুরে যে নয়জন বৈমানিক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ মাত্র তিনজন ছিলেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ছয়জনই ছিলেন বেসামরিক বৈমানিক। এই ছয়জন বেসামরিক বৈমানিকের চারজন ছিলেন পিআইএর এবং অবশিষ্ট দুজনের একজন ছিলেন উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগের, আর অপরজন উদ্ভিদ সংরক্ষণসংশ্লিষ্ট হলেও তিনি ছিলেন কীটনাশক ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি সিবা-গেইগীর। তিন ধরনের তিনটি উড়োজাহাজ পাওয়ার প্রেক্ষিতে ওই নয়জন বৈমানিককে তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রত্যেক ভাগেই ছিল তিনজন করে বৈমানিক। প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি ছিল প্রায় দুই মাস।

কয়েক দিনের প্রশিক্ষণের পর বিমানগুলো জঙ্গি বিমানে রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও ঘাঁটিতে পাঠানো হয়। ১১ অক্টোবর অটার বিমানটি জঙ্গি বিমানে রূপান্তরিত হয়ে ডিমাপুর ফেরত আসে। এরপর বাকি দুটি বিমানও রূপান্তরিত হয়ে ডিমাপুরে ফেরত আসে এবং নতুন করে বৈমানিকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণে ভারতীয় প্রশিক্ষকেরা অংশ নেন। এঁদের মধ্যে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ঘোষাল (অটারের জন্য), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সিনহা (সি-৪৭-এর জন্য) এবং স্কোয়াড্রন লিডার সঞ্জয় কুমার চৌধুরী (অ্যালুয়েটের জন্য) অন্যতম।

সেই বছর প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত বেশির ভাগ সময়। বিশেষ করে ডিমাপুর অঞ্চল প্রায় সব সময়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকত। কিছুই দেখা যেত না। ঘন বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ পাহাড়ি এই অঞ্চল ছিল অত্যন্ত দুর্গম, ফলে মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের প্রশিক্ষণ লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে এটা ছিল যেমন সহায়ক, তেমনি ছিল পাকিস্তান বিমানবাহিনীরও নাগালের বাইরে। এখানকার বন এতই ঘন ছিল যে বিমান থেকে কোনো বৈমানিক প্যারাসুটের সাহায্যে লাফিয়ে পড়লে তাঁর পক্ষে মাটিতে পড়া ছিল অসম্ভব, তাঁকে গাছের ডালেই ঝুলে থাকতে হতো। বিমান নিয়ে একটু দূরে গেলেই আর এয়ার ফিল্ড দেখা যেত না। এই রকম একটি এয়ার ফিল্ডে রাতে প্রশিক্ষণ নেওয়া ছিল খুবই কঠিন। যাঁরা বিন্দুমাত্র ফ্লাইং করেছেন, তাঁরা ধারণা করতে পারবেন যে এখানে রাত্রিকালে এই বিমানগুলো চালানো কতটা বিপজ্জনক ছিল। তবু আমরা অন্ধকারে প্রশিক্ষণ করতাম। সাধারণত ফ্লাইং শুরু হতো রাত ১২টার পর। প্রশিক্ষণকালে ডিমাপুরের পাহাড়গুলোতে রকেট ও বন্দুকের গোলার শব্দ প্রতিধ্বনি হতো। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা

ফ্লাই করে পাহাড়ের উচ্চতা থেকে আরও ওপরে উঠে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতাম। কম উচ্চতায়ও আমাদের উড্ডয়ন করতে হতো। রাতের অন্ধকারে খুব নিচু দিয়ে ফ্লাই করে শত্রুর ওপর আঘাত হানার জন্য প্রয়োজন ছিল অতি উঁচুমানের ফ্লাইং ও ফায়ারিংয়ের প্রশিক্ষণ। তাই প্রশিক্ষণে বিশেষ জোর দেওয়া হতো গাছের শীর্ষ বরাবর ফ্লাইংয়ের ওপর।

পাহাড়ের ওপরে বা গাছের সঙ্গে সাদা প্যারাসুট রেখে আমরা লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তার প্রতি বোমা, গ্রেনেড, গান দিয়ে লক্ষ্যভেদের (টার্গেট শ্যুটিং) অনুশীলন করতাম। প্রশিক্ষণের সময় বৈমানিকদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হতো। এভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ কিংবা বিমান চালানো কত যে বিপজ্জনক তা একমাত্র যাঁরা বিমান চালান, তাঁরাই বুঝতে পারবেন। কিন্তু আমাদের এটা করতে হতো, কারণ এর কোনো বিকল্প ছিল না। প্রথম প্রথম ২৫ মাইল দূরে জঙ্গলের মাঝে ছোট্ট একটা পাহাড়ের টিলায় প্যারাসুটটি খুঁজে পাওয়াটাই ছিল দুরূহ। আর হালকা হওয়াতেই অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার আর অটার বিমান যেন নেচে উঠত। যতই দিন গেল, হাত হলো পাকা, চোখ হলো শার্দুলের, বিশ্বাস হলো দৃঢ়তর।

প্রশিক্ষণ বেশ কিছু অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে প্রতি সর্টির পর হেলিকপ্টারের টেইল রোটারে কিছু আঁচড় লাগছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বোঝা গেল, ৫৭ মিলিমিটার রকেটগুলোর টেইল ফিউজের তারগুলো খুব নাজুক হওয়ায় ফায়ারিংয়ের পর সেগুলো ছুটে গিয়ে টেইলে আঘাত করছে। পরে সেগুলো পরিবর্ধন করা হয়। বেসামরিক বৈমানিকেরা এর আগে কখনো যুদ্ধজাহাজে ফ্লাই করেননি, তবু অতি অল্প সময়ে ফ্লাইং ও ফায়ারিং, দুই-ই তাঁরা রপ্ত করে ফেলেন। এটা নিশ্চয়ই তাঁদের দৃঢ় মনোবল ও অদম্য সাহসের বহিঃপ্রকাশ। আমিও মাঝেমধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে ককপিটে বসে লক্ষ করতাম কীভাবে তাঁরা ডাইভ দিচ্ছেন, কত দূর থেকে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানছেন ইত্যাদি। এসব দেখে আমি তাঁদের মাঝেমধ্যে পরামর্শ দিতাম কীভাবে আরও নিপুণতার সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা যায়। বিমানসেনারা দিনের বেলায় বিমান তিনটিকে সার্ভিসিং করত যাতে রাতে সেগুলো সচল থাকে। এভাবে আমাদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও মহড়া চলতে থাকে। কলকাতা থেকে ডিমাপুরে প্রশিক্ষণ তদারকি এবং পরিদর্শনের জন্য গিয়ে বৈমানিকদের নিয়ে আমার বিচিত্র ধরনের সব অভিজ্ঞতা হয়। এঁদের কারও মনে কোনো ভয় ও সংশয় ছিল না। যদিও তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন বেসামরিক বৈমানিক এবং

বিমানগুলোও ছিল পুরোনো বেসামরিক বিমানকে রূপান্তর করা সামরিক বিমান। বৈমানিকেরা সব সময় খুব উৎফুল্ল থাকতেন এবং কখন সরাসরি আক্রমণে যাবেন সে বিষয়ে উৎসুক থাকতেন। তাঁরা দিনরাত কাজ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

বৈমানিকেরা স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণেই রাতের আঁধারে আধুনিক দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ছাড়া বিমান চালানোর কৌশল রপ্ত করে ফেলেন। এ ছাড়া কেমন করে প্রতিপক্ষ দলের বিমানের মোকাবিলা করতে হয়, কত দূর থেকে রকেট ছুড়তে হয়, কখন ও কীভাবে নিশানা লক্ষ্য করে বোমা ফেলতে হয়, কত কোণে ঝাঁপ (ডাইভ) দিতে হয়, কখন ও কীভাবে নিশানা স্থির করে মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়তে হয়, ইত্যাদি বিষয়েও তাঁরা প্রশিক্ষিত হন। প্রশিক্ষণ স্বল্পমেয়াদি হলেও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার অভিপ্রায়ে সবাই ছিলেন উদ্‌গ্রীব আর তাই প্রশিক্ষণে সব বিষয়ে পারদর্শী হতে তাঁদের সময়ের স্বল্পতা কোনো বাধাই হতে পারেনি, বরং এই স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণে সবাই হয়ে ওঠেন একেকজন দুর্ধর্ষ বিমানসেনা।

প্রশিক্ষণে অস্ত্র চালানো ছাড়া শত্রুর রাডার ফাঁকি দিয়ে কীভাবে সফল অভিযান করে নিরাপদে ফিরে আসা যায়, তার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোনো বিমানকে রাডার দিয়ে চিহ্নিত করার জন্য নির্দিষ্ট উচ্চতার প্রয়োজন হয়। বিমানটি যত উচ্চতায় থাকবে, রাডার তত দ্রুত বিমানটির অবস্থান শনাক্ত করতে পারবে। সে জন্য প্রশিক্ষণের সময় আমরা ঠিক গাছের ওপর দিয়ে (অর্থাৎ খুব নিচু হয়ে) উড়ে যেতাম, যাতে অভিযানের সময় আমাদের বিমানটি রাডারের আওতায় না পড়ে। অন্ধকারে ম্যানুয়ালি হিসাব-নিকাশ করে ঠিক গাছের ওপর দিয়ে ফ্লাই করতে হতো। এটা ছিল খুবই রোমাঞ্চকর।

কিছু দিন পর ভারতীয় বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন চন্দন সিং আমাকে জোরহাটে তাঁদের অপারেশন রুমে নিয়ে যান। সেখানে তিনি আমাকে আমাদের বিমানবাহিনী কোন কোন লক্ষ্যবস্তুতে কীভাবে আক্রমণ করবে তা দেখান। আমাদের লক্ষ্যবস্তুগুলো ডিমাপুর থেকে অনেক দূরে দূরে ছিল। তাই তিনি বলেন যে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানোর আগে বেশ কয়েকটি জায়গায় আমাদের রিফুয়েল করতে হবে। তারপর ফাইনাল ফ্লাইটে লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ করতে হবে। আক্রমণের পর যে স্থান থেকে শেষ ফুয়েল নিয়েছে, সেখানে ফিরে আসবে এবং আগের পথ ধরে বেজ ক্যাম্পে ফিরে যাবে। তাঁর পরামর্শমতো আমরা নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে ইএসএসও বার্মার তেলের ডিপো ও চট্টগ্রামে ইস্টার্ন রিফাইনারির তেলের ডিপোতে প্রথম আক্রমণের

পরিকল্পনা করি। কে কোন অভিযান পরিচালনা করবেন, সেটাও স্থির করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অটার বিমানের সাহায্যে চট্টগ্রামের তেলের ডিপো আক্রমণ করব। আর হেলিকপ্টারের সাহায্যে আক্রমণ করব নারায়ণগঞ্জের তেলের ডিপো। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে ডাকোটার সাহায্যে ক্যাপ্টেন মুকিত, ক্যাপ্টেন আবদুল খালেক ও ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার আলমগীর ঢাকার তেজগাঁওস্থ বিমানবন্দর আক্রমণ করবেন।

সবকিছুই যখন প্রায় মোটামুটি ঠিক, তখন হঠাৎ করে ডাকোটার অভিযানটি বাতিল করা হয়। তাতে ক্যাপ্টেন মুকিত, ক্যাপ্টেন খালেক ও ক্যাপ্টেন সাত্তার অত্যন্ত হতাশ হন। ডাকোটার মিশন বাতিল করার কারণ, এতে ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের কারণে ইঞ্জিনের পেছন দিক দিয়ে যে ধোঁয়া বের হয়, তাতে বেশ কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় যা রাতের আঁধারে অনেক দূর থেকেও সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এ অবস্থায় ডাকোটার সাহায্যে কোনো অভিযান পরিচালনা করা নিরাপদ ছিল না। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শত্রুবাহিনী খুব সহজে চিহ্নিত করে ডাকোটাকেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারে। তাই এই বিমানের সাহায্যে সব ধরনের সামরিক অভিযান বাতিল করা হয়। চূড়ান্তভাবে যুদ্ধে বা হাওয়াই হামলার জন্য অনুপযুক্ত বিবেচনা করায় ডাকোটা বিমানটিকে পরিবহন বিমান হিসেবে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীকে তাঁর ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন দুর্গম এবং অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে চলাচল এবং সরঞ্জামাদি পরিবহনেও এটি ব্যবহার করা হয়।

ডিমাপুরে প্রশিক্ষণ শেষে হেলিকপ্টার এবং অটারের বৈমানিকেরা তাঁদের অভিযান পরিচালনার জন্য চলে আসেন ভারতের কৈলাশহর বিমানবন্দরে। এটি বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি। এ কারণে এখান থেকে বিমান অভিযান পরিচালনা করা সুবিধাজনক হবে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বিমানবন্দরের যে পর্যবেক্ষণ চৌকি ছিল, সেটার মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, বিশেষত সিলেট অঞ্চলে, যেকোনো সেনা চলাচলের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পৌঁছে যেত। ফলে মুক্তিবাহিনীর বৈমানিকেরাও তাঁদের বিরুদ্ধে ত্বরিত আক্রমণে যেতে পারতেন। পরবর্তী সময়ে হেলিকপ্টারটি আরও অগ্রবর্তী ঘাঁটি, অর্থাৎ আগরতলায় আনা হয় এবং সেখান থেকে কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় এই হেলিকপ্টারের সাহায্যে অভিযান পরিচালনা করা হতো।

৩ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের সাহায্যে প্রথম আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে প্রলম্বিত বর্ষায় দীর্ঘস্থায়ী হয়

বন্যা। বর্ষায় সেনা ও ট্যাংক চলাচলে অসুবিধা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপর্যাপ্ত সমর প্রস্তুতির কারণে ৩ নভেম্বরের বিমান আক্রমণ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। বিমান হামলার নতুন তারিখ স্থির করা হয় ২৮ নভেম্বর। মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের যেকোনো আক্রমণে পাকিস্তান বিমানবাহিনী প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পাকিস্তানও বিমানের সাহায্যে ভারতের অভ্যন্তরে আক্রমণ করতে পারে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই দিন দমদম বিমানঘাঁটি থেকে ভারতীয় সব বিমানকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। অবশ্য ভারত সরকারের সবুজ সংকেত না পাওয়ার কারণে সেদিনের আক্রমণটিও স্থগিত করা হয় শেষ মুহূর্তে। পাঁচ দিন পিছিয়ে পুনরায় অভিযানের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ৩ ডিসেম্বর। ঘটনাক্রমে তারিখটি আবার ভারত-পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরুর দিন হয়ে যায়। ১ ডিসেম্বর সকালে আক্রমণকারী বৈমানিকদের জোরহাটে নেওয়া হয় ব্রিফিংয়ের জন্য। চন্দন সিং সেখানে ম্যাপ ও চার্টের ওপর বৈমানিকদের লক্ষ্যবস্তু ও অভিযান পরিচালনার বিষয়গুলো ব্রিফ করেন।

৩ ডিসেম্বরের মধ্যরাতে মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের বৈমানিকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানিদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় প্রথম আক্রমণ করে। তাই ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি দিন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙালি বৈমানিকদের একদল অটারের সাহায্যে চট্টগ্রামের তেল ডিপো এবং অপর দল হেলিকপ্টারের সাহায্যে নারায়ণগঞ্জের তেলের ডিপোতে অভিযান পরিচালনা করে। দুটি অভিযানই শতভাগ সফল হয়। লক্ষ্যবস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ভিন্নমত ছিল, তাঁরা লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন চট্টগ্রামের 'ইস্টার্ন রিফাইনারি' যা পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র তেল শোধনাগার ছিল। মুক্তিযোদ্ধা বৈমানিকেরা এতে দ্বিমত পোষণ করেন, তাঁরা যুক্তি দেখান যে তেল শোধনাগার ধ্বংস করে দিলে স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ তার প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেল পরিশোধন করতে পারবে না। কাজেই এই স্থাপনাটি কিছুতেই ধ্বংস করা যাবে না, বরং সাময়িকভাবে জ্বালানি তেলের অভাবে পাকিস্তানি বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলতে ওখানকার তেলের আধারগুলো নষ্ট করাই হবে উত্তম।

উল্লিখিত তেলের ডিপো দুটি বেছে নেওয়ার আরও কিছু কারণ ছিল। বিমান উড্ডয়নের জন্য বিশেষ একধরনের জ্বালানি (জেট-এ-১) তেলের

প্রয়োজন হয়, এই জ্বালানি তেল রাখা হতো ওই দুটি বিশেষ তৈলাধারে। তৈলাধারগুলো যদি ধ্বংস করে দেওয়া যায়, তবে যুদ্ধাবস্থায় ওই বিশেষ তেল খুব সহজে বহির্বিশ্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পরিবহন করে পূর্ব পাকিস্তানে আনা সম্ভব হবে না। ফলে পাকিস্তানিদের সামরিক এবং বেসামরিক বিমান পরিবহনব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হবে এবং নিশ্চিতভাবে অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান বিমানবাহিনীকে অকার্যকর করে রাখা সম্ভব হবে।

অটার বিমানের সাহায্যে চট্টগ্রামের আক্রমণটি পরিচালনা করেছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম ও ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ। অভিযানে যাওয়ার অভিপ্রায়ে তাঁরা সমস্ত সরঞ্জামসহ কমলপুর বিমানঘাঁটিতে চলে আসেন। কমলপুর শমসেরনগরের কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত ভারতের একটি ছোট শহর। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়, লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণটা যেন ঠিক মাঝরাতের পরপরই করা হয়, তাই কমলপুর থেকে ৩ ডিসেম্বর আনুমানিক রাত নয়টায় অটার নিয়ে তাঁরা চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁদের আরও নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাঁরা যেন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের আগরতলা থেকে ২৫ মাইল পূর্বে তেলিয়ামুড়া বিমানবন্দরের কাছ দিয়ে যান। বিমানবন্দরের কাছে উপস্থিত হলে তাঁরা যেন তাঁদের বিমানের বাতিগুলো পরপর কয়েকবার জ্বালিয়ে আবার নিভিয়ে দেন। এতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারবে যে অটার বিমানটি সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে। প্রত্যুত্তরে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সবুজ রঙের মশাল জ্বালিয়ে বিমানটিকে তাঁদের অবস্থান জানিয়ে দেবে, যাতে বৈমানিকেরা নিজেরাই সঠিকভাবে তাঁদের চলার পথ ও দিক নির্ধারণ করতে পারেন। আর যদি প্রয়োজন হয় বা কোনো বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তবে বিমানবন্দরে প্রজ্বলিত মশালের আলো লক্ষ্য করে অটার পথ ও দিক সংশোধন করে নেবে।

যথাস্থানে এবং যথাসময়ে অটার সংকেত আদান-প্রদান করে নিশ্চিত হয় যে সঠিকভাবেই তারা তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলছে। ঘণ্টা তিনেক উড্ডয়নের পর তারা চট্টগ্রামের উপকূল বরাবর এসে পৌঁছায়, এরপর উপকূলরেখা বরাবর উড়ে তেলের ডিপোগুলোকে আক্রমণ করে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অটার লক্ষ্যবস্তুতে শুধু একবার আক্রমণ করে ঘাঁটিতে ফিরে আসার কথা। কিন্তু পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া বা প্রতি-আক্রমণ না আসায় অত্যন্ত আস্থাবান এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে দুই বৈমানিক লক্ষ্যবস্তুর পাশাপাশি থাকা তেলের অন্য ডিপোগুলোর

ওপর আরও তিনবার আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের সব রকেট নিঃশেষ করেন। ডিপোগুলো ইতিমধ্যে প্রচণ্ড শব্দে প্রজ্বলিত ও বিস্ফোরিত হতে শুরু করে। পাকিস্তানিরাও ততক্ষণে গুলিবৃষ্টি শুরু করে। ইত্যবসরে বৈমানিকদ্বয় ফেরার পথ অনুসরণ করে নির্বিঘ্নেই কুম্ভিগ্রাম ঘাঁটিতে ফিরে আসতে সক্ষম হন। বিমানে জ্বালানি তেলের স্বল্পতার কারণে তাঁদের কুম্ভিগ্রামে যাত্রাবিরতি করতে হয়। পরদিন তাঁরা আবার তাঁদের মূল ঘাঁটি কৈলাশহরে ফিরে যান।

চট্টগ্রামের পথে অটার যখন তেলিয়ামুড়ার আকাশ অতিক্রম করছিল, অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারটি তখন সেখানকার হেলিপ্যাডেই অপেক্ষা করছিল আর ক্রুরা নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে আঘাত হানার জন্য তাঁদের মিশন প্ল্যানটা শেষবারের মতো ভালো করে দেখে নিচ্ছিলেন। চাঁদের আলো আর ঘন কুয়াশা পরিবেশকে স্বপ্নপুরীতে পরিণত করে রেখেছিল। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন ভীতিকর রাতে আকাশে হেলিকপ্টার উড্ডয়ন একরকম অসম্ভবই ছিল, কোনো জটিল এবং বিপজ্জনক অভিযান পরিচালনা তো দূরের কথা। উপরন্তু মধ্যরাতে তেলিয়ামুড়ার জঙ্গলঘেরা ছোট্ট পাহাড়ের চূড়া থেকে ভরা জ্বালানি তেল আর অ্যামুনিশন নিয়ে টেক অফ করাটাও ছিল অতি বিপজ্জনক। তবু হেলিকপ্টারের বৈমানিক ও বিমানসেনারা নিজ দেশের ভূমিকে ঠিকই চিনবে বলে মিশন সম্পন্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অ্যালুয়েটের অভিযান পরিচালনা করেন স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম। শত্রুর রাডারকে ফাঁকি দেওয়া এবং সহজে পথ চিহ্নিত করার জন্য তাঁরা খুব নিচু দিয়েই উড়ে যেতে মনস্থির করেন।

কিছুদূর এগোনোর পর আখাউড়া এলাকা পেরোনোর সময় মনে হলো যেন চারদিকে খই ফোটা শুরু হয়েছে। এ ছিল ফায়ারিংয়ের শব্দ। দিন দশেক আগে ভারতীয় বাহিনী সীমান্তে হামলা করায় আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকাসহ পুরো এলাকায় পাকিস্তানিরা 'রেড অ্যালার্ট' অবস্থায় ছিল। গোপনীয়তা রক্ষার্থে এ মিশন সম্পর্কে নিজ বাহিনীকেও কিছু জানানো নিষেধ ছিল। কোন দিক থেকে ফায়ারিং হচ্ছিল, তা বোঝা যাচ্ছিল না। ট্রেসার উড়ছিল চারদিক থেকে। অতি নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া হেলিকপ্টারকে বসে থাকা পাখি (সিটিং ডাক) মনে করে বোধ হয় দুই দলই ঝাল মেটাচ্ছিল।

শান্ত প্রকৃতির কো-পাইলট বদরুল আলম সুলতান মাহমুদের উদ্দেশে প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠলেন, 'স্যার, কোথায় নিয়ে এলেন? আপনি না

বলেছিলেন টার্গেটে পৌঁছানো পর্যন্ত বসে থাকো এবং আরাম করো। চোখ খোলা রেখে যাত্রাপথের দিকে লক্ষ রাখো।' কিছুই বলার ছিল না, তাই একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান আবারও মনোযোগ দিলেন সামনে—তাঁর দৃষ্টি আর চিন্তায় শুধুই লক্ষ্যবস্তু। অন্য সবকিছু তাঁর ভাবনাচিন্তার বাইরে। কয়েক সেকেন্ড পর হেলিকপ্টার ফায়ারিং রেঞ্জের বাইরে চলে গেলে নিচ থেকে ফায়ারিংয়ের আওয়াজও আস্তে আস্তে পেছনে সরে গেল। নিচে ঘন কুয়াশা থাকায় ফ্লাইং করতে হচ্ছিল কিছুটা ইনস্ট্রুমেন্টের ভরসায় আর বাকিটা চোখে যতটুকু দেখা যায় তার ওপর ভরসা করে। সময়মতোই তাঁরা ঢাকা-কুমিল্লা মহাসড়কে ইলিয়টগঞ্জের কাছে যুদ্ধের শুরুতে ভেঙে যাওয়া একটি ব্রিজের ওপর পৌঁছান। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে টার্ন নিয়ে আঁকাবাঁকা সড়ককে অনুসরণ করে তাঁরা এগোতে লাগলেন নারায়ণগঞ্জের দিকে। ঘন কুয়াশার কারণে পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে তাঁদের প্রায় গাছের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যেতে হচ্ছিল। মনে মনে সবাই প্রার্থনা করছিলেন যেন টেলিফোন আর বৈদ্যুতিক তারের খাম্বাগুলোর ধাক্কা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। আল্লাহর কৃপায় তাঁরা দাউদকান্দির কাছে মাইক্রোওয়েভ পোল এবং তারপর দুটো নদী ক্রস করা উঁচু বৈদ্যুতিক তারের খাম্বার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। কুয়াশা আর রাডার ডিটেকশনের ভয়ে তাঁরা ওপরে উঠতে পারছিলেন না। এইভাবেই তাঁরা ডেমরার ক্রসিংয়ের কাছাকাছি পৌঁছালেন। শীতলক্ষ্যায় পৌঁছেই দক্ষিণমুখী টার্ন নিয়ে নদীর ওপর দিয়ে চলার কথা। হেলিকপ্টার টার্ন করামাত্র সার্জেন্ট শহীদুল্লাহ (বীর প্রতীক) প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। খোলা দরজা দিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন যে তাঁরা পানির সামান্য ওপর দিয়ে আর অন্ধকারে না দেখা বৈদ্যুতিক তারের নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে তাঁরা আবারও বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন।

আক্রমণের জন্য নির্ধারিত স্থানে পৌঁছেই তাঁরা তেলের ডিপোগুলো লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করতে শুরু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হতে থাকে। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার কারণে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরে উঠে সারা আকাশ আচ্ছাদিত করে ফেলে। এই কালো ধোঁয়া ও বহ্নিশিখা অনেক দূর থেকেও দৃষ্টিগোচর হয়। অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষকে এ দৃশ্য একদিকে যেমন অনুপ্রাণিত করে, তেমনি বহির্বিশ্বেও বিষয়টি ব্যাপক প্রচার পায়।

ফেরার পথে আখাউড়া এলাকা পার হওয়ার সময় আবারও তাঁরা গোলাগুলির হালকা রিসেপশন পেলেন। সাফল্যের আনন্দে এবার নিচের গোলাগুলির আওয়াজ তাঁদের আর বিচলিত করতে পারল না। ফেরার পথে খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের নেভিগেশন করতে হয়েছিল। দীর্ঘ তিন ঘণ্টার মিশনের পর হেলিকপ্টারে আর মাত্র ১২ থেকে ১৫ মিনিটের তেল অবশিষ্ট ছিল। অরণ্যঘেরা পাহাড়ি চূড়ায় কোনো নেভিগেশন যন্ত্র ছাড়া ঘাঁটি খুঁজে বের করা ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার ছিল। একটু ভুল হলে বা ঠিক সময়ে হেলিপ্যাড খুঁজে না পেলে ঘন অরণ্যের মধ্যেই তেল ফুরিয়ে যেত এবং হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পতিত হতো। এভাবেই ১৯৭১-এর ৪ নভেম্বরের প্রথম রাতে পাকিস্তানি যুদ্ধদানবদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর আত্মত্যাগী, তেজোদীপ্ত ও নির্ভীক পাইলটদের প্রথম সফল অভিযান সমাপ্ত হয়।

পাকিস্তান যখন ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় ভারতের কয়েকটি এয়ার ফিল্ডে আক্রমণ চালায়, তখন ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় ছিলেন। তিনি দিল্লিতে গিয়ে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন ডাকেন এবং সে রাতেই ৯-১০টার দিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের এই ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের বিমানবাহিনীর সদস্যরা প্রথম আক্রমণ করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বিমানবাহিনীর অবদান নিয়ে লেখা বই *ইগলস ওভার বাংলাদেশ*-এ-ও এই সত্যতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। চন্দন সিংয়ের বরাত দিয়ে ওই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে মুক্তিবাহিনীর বৈমানিকেরাই বাংলাদেশে প্রথম শত্রুর ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর বিমানবাহিনীর সদস্যদের অদম্য দেশপ্রেম, সুউচ্চ পেশাগত জ্ঞান ও একনিষ্ঠতার ফলে এমন ঝুঁকিবহুল অপারেশনগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। এ দুটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সফল আক্রমণের পর দিন ভোরে বেজে ওঠে মিত্রবাহিনীর রণদামামা। মধ্যরাতে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সার্থকভাবে পরিচালিত বাংলাদেশি বৈমানিকদের এ দুটো বিমান হামলা পরবর্তী মাত্র ১২ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনকে ত্বরান্বিত করে। এই ১২ দিনের মধ্যে অ্যালুয়েট এবং অটার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বহু অভিযান পরিচালিত করে। সে অভিযানগুলো কুমিল্লা এবং সিলেট এলাকায় পলায়নমুখী পাকিস্তানি সৈন্যদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের ঢাকা অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যালুয়েটের ক্রুরা তাঁদের ঘাঁটি কৈলাশহর থেকে আগরতলায় সরিয়ে নিয়ে আসেন। আগরতলা থেকে তাঁরা কুমিল্লা, নরসিংদী, দাউদকান্দি এবং অন্যত্র পশ্চাদপসরণের কালে

পাকিস্তানিদের ওপর বহু আক্রমণ পরিচালিত করেন। অভিযানগুলো পরিচালনার সময় হেলিকপ্টার বহুবার শত্রুর বুলেটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর অনেকগুলোই ছিল মূল রোটর ব্লেডে। সেসব বিপজ্জনক আঘাত থেকে হেলিকপ্টার ও অটার ক্রুরা রক্ষা পান বলতে গেলে অলৌকিকভাবেই।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ত্যাগ করার সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভৈরব সেতুটি ধ্বংস করে দিলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রাভিযান নদীর ওপারে থমকে যায়, তারা ছত্রীসেনা অবতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ ধরনের একটি অভিযানে পাকিস্তানি আক্রমণে ভারতীয় এক বৈমানিক তাঁর আক্রান্ত বিমান থেকে নরসিংদীতে 'বেল আউট' করতে বাধ্য হন। ভারতীয় এই বৈমানিককে উদ্ধারের জন্য বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সাহায্য কামনা করা হয়। তৎক্ষণাৎ বাংলাদেশ বিমানবাহিনী এগিয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত ওই ভারতীয় বৈমানিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। রাজাকাররা ওই বৈমানিককে আটক এবং পরে হত্যা করে।

মাত্র ১২ দিনের ব্যাপ্তিকালে আমাদের বিমানসেনারা চল্লিশটির মতো হাওয়াই অভিযান পরিচালনা করেন। মাত্র দুটি উড়োজাহাজের সাহায্যে এতগুলো আক্রমণ পরিচালনা করতে পারা ছিল সত্যিই এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। এই বিরামহীন আক্রমণের সময় তাদের ভারতীয় বিমানবাহিনীকেও কখনো কখনো সাহায্য করতে হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অপরিচিত জায়গায় (পথপ্রদর্শকের ভূমিকা এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য) ভারতীয় বিমানবাহিনী আক্রমণ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে বিমানবাহিনীর সহায়তা নিত। ১২ দিনের যুদ্ধে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী সিলেট, শায়েস্তাগঞ্জ, শমসেরনগর, মৌলভীবাজার, কুলাউড়া, নরসিংদী, রায়পুরা, কুমিল্লা, ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দাউদকান্দি, ইলিয়টগঞ্জ, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি স্থানে সফলতার সঙ্গে অভিযান পরিচালনা করে।

এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুদ্ধের শুরুতেই তেজগাঁও বিমানবন্দরটি ব্যবহারের অনুপযোগী করে দেওয়া হয়েছিল। এ সময় বিমানবন্দরে হেলিকপ্টার ছাড়া আর কোনো বিমান অবতরণ করা সম্ভব ছিল না। ভারতীয় ফিক্সড উইং বিমান তেজগাঁও বিমানবন্দরের রানওয়ে মেরামত করার পর এখানে অবতরণ শুরু করেছিল। কিন্তু ফ্লাইং অফিসার শামসুল আলম তাঁর ফিক্সড উইং অটার বিমানটির সাহায্যে খুব ঝুঁকি নিয়ে ১৭ ডিসেম্বরই তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সদস্যরা নিজেদের হাতে রানওয়ে আর ঘাঁটি

এলাকাকে বোমা ও মাইনমুক্ত করেন, ধ্বংসস্তূপ থেকে পরিষ্কার করেন এবং পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক নেতাদের প্রবাস থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করেন।

নানা সীমাবদ্ধতা, যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের অপ্রতুলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দীনতা থাকলেও বিমানসেনাদের প্রবল মনোবল ও অসীম সাহস তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ছিল। তাঁদের এ দৃঢ়তার পেছনে ছিল মরণপণ দেশপ্রেম। বিরল ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অটল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এসব বিমানসেনা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। এঁদের অতুলনীয় সাহস, অগাধ আত্মবিশ্বাস এবং ইমানের দৃঢ়তার কাছে অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের অভাব আদৌ কোনো বাধা হতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র বিমানবাহিনী ছিল। এই বাহিনীর মাত্র দুটি যুদ্ধবিমান ছিল আর তৃতীয় বিমানটি ছিল একটি পরিবহন বিমান। এই দুটি বিমান দিয়েই ৩ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ দিনে বহু অভিযান পরিচালনা করা হয়। অটারের সাহায্যে শেষ বিমান আক্রমণটি করা হয়েছিল ১২ ডিসেম্বর। কার্যত এরপর বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর আর কোনো অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন হয়নি। সুনির্দিষ্টভাবে অভিযানের সংখ্যা আমার মনে নেই, তবে দিনে আমরা চার-পাঁচটি করে অভিযান পরিচালনা করেছি। আমাদের একেকটি সফল আক্রমণে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী দিশাহারা হয়ে পড়ত আর মুক্তিযোদ্ধারা হতো অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত।

যৌথ নেতৃত্ব গঠন

মুক্তিযুদ্ধ ছিল আমাদের নিজস্ব যুদ্ধ। আমাদের যদি এককভাবে যুদ্ধ করার সামর্থ্য থাকত, তাহলে যুদ্ধ করতে ভারত বা অন্য কোনো দেশের সাহায্যের প্রয়োজনই হতো না। একার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না বলেই ভারতীয়দের সহযোগিতা আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধের প্রারম্ভে আমরা ভারত থেকে স্বল্প মাত্রায় হলেও অস্ত্র ও গোলাবারুদ পেয়েছি। প্রথমে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী আর পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলাম। পরবর্তী পর্যায়ে ভারত থেকে অধিক মাত্রায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ পেয়েছি এবং মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতাও পেয়েছি। এক কথায় শুরু থেকেই ভারত মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে আমাদের সঙ্গেই ছিল। তাই সামগ্রিক যুদ্ধ-পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ভারতীয় বাহিনীগুলোর সঙ্গে প্রথম থেকেই সমন্বয় জরুরি ছিল। বিবিধ কারণে যুদ্ধের প্রথম দিকে এই সমন্বয়ের কাজটি হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশের অভাবে মাঠপর্যায়ে সমন্বয়ে বেশ দুর্বলতা ছিল। আমাদের দিক থেকেও আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখাননি। ফলে সেক্টর পর্যায়ে এই সমন্বয়ের কাজটি হয়ে ওঠেনি। দুই পক্ষের মধ্যে এই ধরনের সমন্বয়হীনতা, বিভেদ ও দূরত্ব অক্টোবর মাস পর্যন্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধটা আমাদের হলেও অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয়রা এককভাবে বা আমাদের এড়িয়ে অনেক অভিযান পরিচালনা করত, যা পরবর্তী সময়ে আমাদের জন্য অনেক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করত। এ বিষয়ে আমি কিছু

বর্ণনা 'মুক্তিযুদ্ধ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। প্রয়োজনটা যেহেতু আমাদের, তাই যৌথ পরিকল্পনা করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল আমাদের পক্ষ থেকে। ভারতীয় বাহিনীকে আমাদের বলা উচিত ছিল যে যৌথভাবে যুদ্ধ করতে হলে আমাদের একসঙ্গে বসে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে হবে এবং উভয়ে মিলেই সেই পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে। কিন্তু আমাদের দিক থেকে সেই প্রচেষ্টার অভাব ছিল। যুদ্ধের শেষ প্রান্তে এসে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের উদ্যোগে উভয়ের মধ্যে যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে এ সমস্যার সমাধান হয়।

যৌথ নেতৃত্ব না থাকায় শুধু যে মাঠপর্যায়েই সমস্যা হচ্ছিল তা নয়, বরং এর অভাবে জাতীয় পর্যায়েও সমস্যার আশঙ্কা ছিল। যদি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের উদ্যোগে যৌথ নেতৃত্ব সৃষ্টি না হতো, তাহলে ভারতীয় বাহিনী এককভাবেই যুদ্ধ বিজয়ের সব কৃতিত্ব নিতে পারত। আত্মসমর্পণের দলিলে কেবল ভারতীয়দের কথাই উল্লেখ থাকত। এটা শুধু ভারতীয়দের বিজয় হিসেবেই ইতিহাসে চিহ্নিত হতো।

কূটনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য কারণে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সীমান্ত অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার ওপর বাধানিষেধ ছিল। সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে আসেন এবং অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর তৎপরতা ও সীমান্ত অতিক্রম বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা অনেকটা শিথিল করেন। এ সময় ইন্দিরা গান্ধী সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন যে যদি ঘটনার চাপে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়, তাহলে তা তারা করতে পারবে।

অক্টোবর মাস থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযানে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তা বাড়তে থাকে। এর আগে তারা বড় আক্রমণে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তা দিলেও তা ছিল নামমাত্র। মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযানের আগে বা অভিযান চলাকালে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী কামানের গোলা ছুড়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলত বা লক্ষ্যবস্তুকে বিপর্যস্ত করে দিত। কামানের গোলায় যখন শত্রু বা লক্ষ্যবস্তু অনেক দুর্বল হয়ে পড়ত তখন মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুকে চূড়ান্ত আক্রমণ করে তাদের উদ্দেশ্য সফল করে তুলত। কখনো কখনো আমাদের সেক্টর বা ব্রিগেড তাদের লক্ষ্যবস্তু নিজস্ব শক্তি দিয়ে যথাযথভাবে ধ্বংস করতে পারত না বা তাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকত না। আবার কখনো আক্রমণ করতে গিয়ে সেক্টর বা

ব্রিগেড নিজেরাই আক্রান্ত হয়ে পড়ত। এরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর অভিযানে সাহায্যের নির্দেশ দেওয়া হতো। ইন্দিরা গান্ধীর ওই নির্দেশের পর অক্টোবর মাসের ১২ তারিখ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে একত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধে অংশ নিতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে মাঠপর্যায়ে পাশাপাশি দুটি সামরিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব এবং অন্যটি আমাদের ব্রিগেড ও সেক্টরের নেতৃত্ব। অথচ যুদ্ধ ছিল একটাই। একই রণাঙ্গনে দুটি আলাদা নেতৃত্ব থাকলে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মাঠপর্যায়ের সেনাদলের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে অনেক সময় আত্মঘাতী ঘটনা ঘটে যাওয়ার যেমন আশঙ্কা থাকে তেমনি আশঙ্কা থাকে ভুল-বোঝাবুঝি হওয়ারও। ক্রমাগত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মুখে যৌথ কমান্ড বা যৌথভাবে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যৌথ নেতৃত্বের পক্ষে ছিলেন না কর্নেল ওসমানী। তিনি সব সময় বাংলাদেশ বাহিনীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে নিশ্চিতভাবে ভারতীয় বাহিনীর প্রাধান্য থাকবে এবং বাংলাদেশ বাহিনী থাকবে ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডের অধীনে। কর্নেল ওসমানী এ বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারছিলেন না, যদিও বাস্তব অবস্থা কর্নেল ওসমানীর চিন্তাভাবনার অনুকূল ছিল না। যাহোক, ভারতের পক্ষ থেকেই প্রথম সমন্বয় বা যৌথ নেতৃত্বের প্রস্তাব আসে।

যুদ্ধপরিস্থিতি চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলে রাজনৈতিক পর্যায়ে এই যৌথ সামরিক নেতৃত্ব গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'যৌথ নেতৃত্ব ছাড়া আমাদের যুদ্ধ তো আটকে গেছে। বাংলাদেশের সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীকে যদি দুর্বল করে ফেলা না যায়, তাহলে ভারত তার সেনাবাহিনীকে ভেতরে পাঠানোর ঝুঁকি নেবে না। এটা যুদ্ধ-পরিকল্পনার অন্তর্গত। কাজেই রণক্ষেত্রে সামরিক নেতৃত্বের পূর্ণ সমন্বয় থাকা অপরিহার্য।' কর্নেল ওসমানী প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বাংলাদেশ বাহিনীকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নেতৃত্বের আওতায় রাখতে চান। একপর্যায়ে তিনি জানান যে যদি যৌথ নেতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন। তাজউদ্দীন আহমদও কিছুটা শক্ত অবস্থান নিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি চান যৌথ সামরিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক।

আলোচনারত কর্নেল ওসমানী, জেনারেল মানেকশ ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ

কর্নেল ওসমানী সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করতে রাজি ছিলেন না। তিনি আলাদা আলাদা কমান্ডে যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশ বাহিনীর গুরুত্ব কমে যাবে এবং যুদ্ধটা ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে বা এটি মুক্তিযুদ্ধের পরিবর্তে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে রূপান্তরিত হবে।

আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যেও ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে একধরনের অনীহা ছিল। নিজেদের তারা ভারতীয় বাহিনীর তুলনায় অধিক পারদর্শী ও যোগ্য মনে করত। আমাদের সেনাসদস্যদের ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগের সীমা ছিল না। যেমন, 'ভারতীয়রা পরিমাণমতো সমরসম্ভার ও রেশন দিচ্ছে না', 'ভারতীয়রা এটা করছে না', 'ভারতীয়রা ওটা পারছে না' ইত্যাদি। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আমাদের সামরিক কর্মকর্তাদের অনেকগুলো অভিযোগের মধ্যে সত্যতা ছিল। এ ছাড়া ভারতীয় বাহিনী অনেক সংকটময় মুহূর্তে ইউনিট বা সেক্টর অভিযানে যথাযথ সহযোগিতা না দেওয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। এই ভারতবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিও যৌথ নেতৃত্ব গঠনকে বিলম্বিত করে।

যৌথ নেতৃত্ব যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে তাগাদা দিচ্ছে, তখনো কর্নেল ওসমানী অনড়

থাকেন। যুদ্ধের এই চূড়ান্ত ও সংকটজনক পর্যায়ে কর্নেল ওসমানী মৌখিকভাবে পদত্যাগের কথা বলার পর তাজউদ্দীন সাহেব কর্নেল ওসমানীকে লিখিত পদত্যাগপত্র দাখিল করতে বলেন। তাজউদ্দীন সাহেব বেশ শক্ত করেই তাঁকে বলেন যে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন। শেষ পর্যন্ত কর্নেল ওসমানী লিখিত পদত্যাগপত্র জমা দেননি। এই ঘটনার পর বলা যায় যে কর্নেল ওসমানী দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। তিনি কোনো বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাতেন না, যদিও যুদ্ধের গতি অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছিল।

তাজউদ্দীন আহমদ ভারত-প্রস্তাবিত যৌথ সামরিক নেতৃত্ব বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, 'কর্নেল ওসমানী এটা চাইছেন না, আপনি কী বলেন?' আমি তাঁকে বলেছি, এটি বাস্তবসম্মত এবং এই উদ্যোগে আমাদের সাড়া দেওয়া উচিত। তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'আমিও মনস্থির করে ফেলেছি, আমি এটা করব।' যৌথ নেতৃত্ব হলেই যে একজনকে আরেকজনের নিচে কাজ করতে হবে, এমন কথা বাস্তবভিত্তিক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও যৌথ সামরিক নেতৃত্বের উদাহরণ দেখা যায়। এই যুদ্ধে কয়েকটি দেশ মিলে মিত্রবাহিনী গড়ে তুলেছিল। মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে জার্মানির নেতৃত্বে আর একটি যৌথ বাহিনী ছিল, যাকে অক্ষ বাহিনী বলা হতো। এই যুদ্ধের কোনো এক রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনী মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিল, আবার অন্য রণাঙ্গনে মার্কিন বাহিনী মিত্রবাহিনীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিল। সুতরাং এটা কোনো লজ্জার বিষয় নয়। প্রয়োজনের তাগিদে, আমাদের স্বাধীনতার স্বার্থে এটা করতে হয়েছিল। যৌথ বাহিনী সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে ধন্যবাদ জানাই। বস্তুত তাঁর দৃঢ় অবস্থানের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। যৌথ সামরিক নেতৃত্ব হওয়ার ফলেই অনেক সংশয় ও সমস্যার অবসান ঘটে।

যুদ্ধের শুরু থেকেই তাজউদ্দীন সাহেব ও কর্নেল ওসমানীর মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিত। তাঁদের দুজনের মধ্যে দূরত্বের জন্য তাজউদ্দীন সাহেব আমাকেই ডেকে পাঠাতেন। আমার সঙ্গে আলাপ করতেন; ফোর্ট উইলিয়ামে আলোচনার জন্যও আমাকে পাঠাতেন। ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে এলে তাঁদের সঙ্গে আমাকে আলোচনা করতে হতো। বাংলাদেশ বাহিনী ও যুদ্ধ পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে আমার সঙ্গে তাজউদ্দীন সাহেবের মতের মিল হতো। তাজউদ্দীন

সাহেবের সঙ্গে মতের মিল থাকার কারণে আমি কোনো সময় কর্নেল ওসমানীর বিরোধিতা বা অসম্মান করতাম না। কর্নেল ওসমানী শুনলে মনঃক্ষুণ্ন হবেন, সেরকম কোনো কথা আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে বলতাম না। তবে তাজউদ্দীন সাহেব কোনো বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাইলে আমি আমার যুক্তিসম্মত এবং বাস্তবভিত্তিক চিন্তা অকপটে তাঁকে বলতাম।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনার জন্য একসময় ডি পি ধর আমাদের দিল্লিতে আমন্ত্রণ করেন। এ ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীর কোনো উদ্যোগ না দেখে আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞেস করি। প্রধানমন্ত্রী আমাকে দিল্লি যাওয়ার অনুমতি দেন এবং করণীয় বিষয় সম্পন্ন করার কথা বলেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমি দ্বিতীয়বারের মতো দিল্লিতে যাই। সেখানে ডি পি ধরের সঙ্গে আমার দেখা ও কথা হয়। দিল্লিতে ভারতীয় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারি যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন।

২৮ সেপ্টেম্বর যৌথ নেতৃত্ব বিষয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়। সেখানে আমাদের প্রতিরক্ষাসচিব ও আমি উপস্থিত ছিলাম। কর্নেল ওসমানী ওই দিন যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে একই বিষয়ে ৫ অক্টোবর ভারতের পূর্বাঞ্চল কমান্ডারের সঙ্গে আমাদের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা হয়। ওই সভাতেও কর্নেল ওসমানী উপস্থিত থাকতে পারেননি, তবে আমি উপস্থিত ছিলাম। সভায় যৌথ নেতৃত্ব বিষয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৬ অক্টোবর সিদ্ধান্তগুলো ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড থেকে চিঠি দিয়ে আমাদের অবহিত করা হয়। কর্নেল ওসমানী তাঁর সফর থেকে ফিরে এসে সেই সিদ্ধান্তগুলো খুঁটিয়ে দেখেন এবং সামান্য কিছু পরিবর্তন করে ১১ অক্টোবর তা বাংলাদেশ বাহিনীর সব সেক্টর ও ব্রিগেডকে পাঠিয়ে দেন। যৌথ নেতৃত্ব বিষয়ে এই পত্রটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিশিষ্ট ৭ হিসেবে যুক্ত করলাম। এই চিঠির সূত্র ধরে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে যৌথ পরিকল্পনা ও অভিযান পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টর ও ফোর্সকে বিভিন্ন ভারতীয় ফর্মেশনের অধীনে ন্যস্ত করে ২২ নভেম্বর একটি চিঠি দেওয়া হয়। সেই চিঠিতে 'এস ফোর্সে'র জন্য প্রযোজ্য অংশটি নিচে দেওয়া হলো :

> ১৫. অনতিবিলম্বে অভিযান ও দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের প্রয়োজনে আপনাকে ৫৭ মাউনটেন ডিভিশনের অধীন ন্যস্ত করা হলো। এই আয়োজনের

পরিসমাপ্তি বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে আপনাকে এবং সহায়তাকারী বাহিনীর সদর দপ্তরের ফর্মেশনকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

১৬. বাংলাদেশ সেক্টর

২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর সেক্টর, যাদের বাংলাদেশ ফর্মেশনের (কে, এস এবং জেড ফোর্স) অধীন ন্যস্ত করা হয়েছিল, তারা এখন থেকে আর ওইসব ফর্মেশনের অধীন থাকবে না। সব বাংলাদেশ সেক্টর এই নির্দেশাবলির প্রাধিকারে নির্দেশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সহায়তাকারী বাহিনীর অধীনে থেকে অভিযান পরিচালনা করবে।

সদর দপ্তর বাংলাদেশ বাহিনী, পত্র নং ০০১৮ জি, তারিখ ২২ নভেম্বর ১৯৭১

যৌথ সামরিক নেতৃত্বের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদে আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলে তাঁর নিজের ক্ষমতাবলে যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন; কিন্তু সেভাবে তিনি তা করেননি। এটা করা হয়েছিল মন্ত্রিপরিষদের সবার মতামতের ভিত্তিতে। কর্নেল ওসমানী বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মেনে নেন। যৌথ সামরিক নেতৃত্ব বলতে যৌথ সামরিক পরিকল্পনা, যৌথ সামরিক তৎপরতা বোঝায়, যেটা যুদ্ধের শুরুতেই হওয়া উচিত ছিল। যুদ্ধের শুরুতেই এটা করতে পারলে যুদ্ধের ফল আরও ইতিবাচক হতো। এটা আরও বেশি ফলপ্রসূ ও কার্যকর হতো।

যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে যুদ্ধক্ষেত্রের সব সামরিক বাহিনী এই নেতৃত্বের অধীনে যুদ্ধ করে। এটা অতীতের বিভিন্ন বহুজাতিক ও বহু রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ইতিহাসে লক্ষ করা গেছে। কেবল আমাদের বেলায় যে এটা নতুন একটা কিছু, তা নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে পৃথিবীর সব বহুজাতিক যুদ্ধেই একই আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে যৌথ সামরিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা যৌথ নেতৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব পান। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সামরিক নেতৃত্ব গঠন করার পর দেখা গেল ভারতীয় ফরমেশন অধিনায়কেরা আমাদের ব্রিগেড ও সেক্টর অধিনায়কদের চেয়ে অনেক জ্যেষ্ঠ। তাঁরা কেউ ব্রিগেডিয়ার বা জেনারেলের নিচে নন। তাই স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বের দায়িত্ব ভারতীয় সামরিক অধিনায়কেরা পেলেন। এতে যৌথ নেতৃত্বের কোনো সমস্যা হতো না। যৌথ নেতৃত্ব চালু হওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনা অধিনায়কেরা বাংলাদেশি সেনা অধিনায়ক ও জোয়ানদের ওপর আলাদা কোনো কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করেননি বরং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। যৌথ নেতৃত্ব বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিল। ফলে পাকিস্তানিরা এককভাবে ভারতীয়

সেনাবাহিনীর কাছে নয়, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সামরিক নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

৩ নভেম্বর যৌথ অভিযান শুরু হয়, যা ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ৪ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে ভারতের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যদিও তখন যুদ্ধ ঘোষণার গুরুত্ব তেমন ছিল না, কারণ যুদ্ধ তো অঘোষিতভাবে বেশ আগেই শুরু হয়ে গেছে। যৌথ নেতৃত্ব হওয়ার পরে ভারতীয় ও বাংলাদেশি সেনাবাহিনী একসঙ্গে অভিযান পরিচালনা শুরু করে। ডিসেম্বর মাসের শুরুতে কামালপুরের যুদ্ধে যৌথ বাহিনী শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। চৌগাছার যুদ্ধেও যৌথ বাহিনী একই ফল লাভ করে। জকিগঞ্জ সীমান্তে যৌথ বাহিনী বেশ কটি জায়গায় যুদ্ধ করে। সালদানদী অঞ্চলের যুদ্ধ সম্পর্কে মেজর জেনারেল বি এন সরকার বেশ গর্বের সঙ্গে আমাদের ক্যাপ্টেন আবদুল গাফফার হালদারের (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী) প্রশংসা করেন। আমাদের সেক্টর ও ব্রিগেডের গেরিলারা যৌথ বাহিনীর আওতায় থেকে সমান তালেই যুদ্ধ করে দক্ষতা আর সাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছে।

বীরত্বসূচক খেতাব

২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা হয় শত্রুকে আক্রমণ করত, আর না-হয় শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করত। দুটি ক্ষেত্রেই মুক্তিযোদ্ধাকে সাহসের পরিচয় দিতে হতো। সাহসের কারণেই অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তারা বিজয় ছিনিয়ে আনত অথবা ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে নিজেদের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করত। সাহসকে পুঁজি করে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সময় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি জয় করত। এ কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসের স্বীকৃতি দেওয়া বা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেওয়ায় উদ্বুদ্ধ করতে কর্নেল ওসমানী বীরত্বসূচক খেতাব প্রবর্তন করতে আগ্রহী হন।

কর্নেল ওসমানী খেতাবের বিষয়ে একটি প্রস্তাব মে মাসের প্রথম দিকে অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করেন। মন্ত্রিসভাও এটিকে যৌক্তিক বিবেচনা করে ১৬ মে অনুমোদন দেয়। বাংলাদেশ বাহিনী সদর দপ্তর থেকে বীরত্বসূচক খেতাবের বিষয়টি সব সেক্টর ও সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীর সেক্টরকে অবহিত করা হয়। সদর দপ্তর থেকে সবাইকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস বা বীরত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা দিয়ে সুপারিশ পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়। এ সময় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ প্রতিরোধযুদ্ধ কেবল শেষ হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা পরবর্তী পর্যায়ের জন্য গুছিয়ে উঠতে শুরু করেছে। সেক্টরগুলো গঠিত হলেও এর প্রশাসনিক বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে শুরু হয়নি। এ সময়ে সেক্টর সদর দপ্তরগুলোতে দাপ্তরিক কাজকর্ম পরিচালনা করার মতো জনবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বেশ অভাব ছিল। ফলে জুলাই মাস পর্যন্ত সেক্টরগুলো থেকে বীরত্বসূচক খেতাবের বিশেষ কোনো সুপারিশ সদর দপ্তরে

পৌঁছায়নি। তবে এই সময়কালে ভারতীয় বাহিনী থেকে কয়েকজনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের সুপারিশ করা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের প্রথম কয়েক মাস আমাদের অনেক সৈনিক ভারতীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন অভিযানে অংশ নিত।

সুপারিশের সংখ্যা খুব বেশি না হওয়ায় কর্নেল ওসমানী সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলনের পর ৩০ জুলাই একটি বিস্তারিত নির্দেশাবলি প্রকাশ করেন। সেই নির্দেশাবলিতে খেতাবের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে আবারও সব সেক্টর ও পদাতিক ব্যাটালিয়নকে খেতাবের জন্য সুপারিশ পাঠাতে বলেন। এই চিঠির সঙ্গে সুপারিশ পাঠানোর জন্য একটি সুপারিশনামা সংযুক্ত করেন। চিঠিতে খেতাবের ধরন, যোগ্যতা, আর্থিক সুবিধাসহ অন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি উল্লেখ ছিল। তবে এ সময় খেতাবগুলোকে চার স্তরে ভাগ করলেও এর নামকরণ করা হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। বীরত্বপূর্ণ খেতাবের নির্দেশাবলিটি পরিশিষ্ট ৮ হিসেবে যুক্ত করলাম। এই নির্দেশাবলিতে উল্লেখ ছিল, মাঠপর্যায় থেকে যেসব সুপারিশ সদর দপ্তরে আসবে, তা একটি নিরীক্ষা পর্ষদ যাচাই-বাছাই করে প্রধান সেনাপতির কাছে তাঁর মতামতের জন্য উপস্থাপন করবে। নিরীক্ষা পর্ষদের প্রধান করা হয় চিফ অব স্টাফকে। পর্ষদের প্রধান বিষয়ে আরও উল্লেখ ছিল, চিফ অব স্টাফ অনুপস্থিত থাকলে অথবা জরুরি ভিত্তিতে কোনো খেতাবের সুপারিশ নিরীক্ষা করার প্রয়োজন হলে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিরীক্ষা পর্ষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকৃত অর্থে মুক্তিযুদ্ধকালে নিরীক্ষা পর্ষদের প্রধানের দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হয়। অক্টোবর মাসে সদর দপ্তর থেকে নিরীক্ষা পর্ষদের প্রধান হিসেবে আমার নামে আদেশও জারি করা হয়। এই পর্ষদে আমার সঙ্গে ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর এম এ মঞ্জুর এবং মেজর এম এ ওসমান চৌধুরীকে সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালে খুব বেশিসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার সুপারিশনামা সদর দপ্তরে আসেনি। আমার যত দূর মনে পড়ে, মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন সেক্টর থেকে খুব বেশি হলে ৭০-৮০টি সুপারিশনামা আমাদের কাছে জমা পড়েছিল। এগুলোর বেশির ভাগই এসেছিল জেড এবং কে ফোর্স এবং ৩, ৪, ৭ ও ১১ নম্বর সেক্টর থেকে। আমাদের নিরীক্ষা পর্ষদ অক্টোবরের শেষের দিকে প্রথমবারের মতো একত্র হয়। কিন্তু সুপারিশনামার স্বল্পতার কারণে ওই সভায় কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে আমরা ১৭ নভেম্বর পুনরায় একত্র হই। সেদিন আমরা প্রায় ৪৩ জন

মুক্তিযোদ্ধাকে বিভিন্ন ধরনের খেতাব দেওয়ার সুপারিশ করে প্রধান সেনাপতির কাছে উপস্থাপন করি। প্রধান সেনাপতি আমাদের সুপারিশের ওপর সম্মতি দিয়ে ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে এগুলো প্রতিরক্ষামন্ত্রী (একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী) তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে পাঠান। এ সময় যুদ্ধ চরম মুহূর্তে এসে পৌঁছায়। যুদ্ধের তীব্রতা এত বেড়ে যায় যে মাঠপর্যায় থেকে আর কোনো সুপারিশনামা সদর দপ্তরে পৌঁছায়নি। ১৭ নভেম্বর আমরা যে ৪৩ জনকে খেতাবের জন্য সুপারিশ করেছি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তাঁর সদর দপ্তর কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের আগেই তা অনুমোদন করেন। তবে এঁদের গেজেট প্রকাশিত হতে বেশ বিলম্ব হয়। তাঁদের গেজেট প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে। মুক্তিযুদ্ধকালে আরও কিছু খেতাবের সুপারিশ এলেও শুধু এই ৪৩ জনের বিষয়ে সব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছিল। বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্য বাকি কয়েকজনের খেতাবের প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব হয়নি।

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর খেতাবের বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় আসে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সেক্টর অধিনায়কদের সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়। এ সময় সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য বীরত্ব, নেতৃত্ব, সহযোগিতা ইত্যাদির বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের খেতাবের পৃথক সুপারিশ আসতে থাকে। আমার যত দূর মনে পড়ে, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে খেতাবের বিষয়ে কর্নেল ওসমানীও খুব সুন্দর একটি প্রস্তাব সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন, যা বাস্তবায়ন করলে পরবর্তী সময়ে সংগঠিত খেতাবের অনেক ত্রুটি এড়ানো সম্ভব হতো। কিন্তু ওসমানীর প্রস্তাবটি গৃহীত না হওয়ায় খেতাবের বিষয়টি কিছুটা জটিল রূপ নেয়। সরকার আগের, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের মে মাসের সিদ্ধান্তকেই বলবৎ রাখে।

মুক্তিযুদ্ধকালে মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা, সার্বক্ষণিকভাবে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা, প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অবস্থান বদলে যাওয়া এবং সর্বোপরি সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা খুব দুর্বল থাকায় সেক্টর থেকে খেতাবের বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে সেক্টর অধিনায়কদের সভায় খেতাব দেওয়ার বিষয়টি চালু করার জন্য নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হয়। তখনো যেহেতু সেক্টরগুলো ভেঙে দেওয়া হয়নি, তাই সেক্টর ও সাব-সেক্টর অধিনায়কদের কাছে নতুন করে খেতাবের সুপারিশ চাওয়া হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেক্টরগুলোর বিলুপ্তি ঘটে এবং নিয়মিত

বাহিনীর আদলে বিভিন্ন বাহিনী গড়ে ওঠে। এতে করে খেতাবের সুপারিশগুলো পাঠাতে পুনরায় বিলম্ব হতে থাকে। ১৯৭৩ সালের প্রথম দিকে প্রাপ্ত সুপারিশনামা নিরীক্ষার জন্য আমাকে প্রধান করে আবারও আরেকটি নিরীক্ষা পর্ষদ গঠন করা হয়। আমার সঙ্গে সেনাবাহিনীর কর্নেল মীর শওকত আলী (বীর উত্তম ও পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) ও কর্নেল এম এ মঞ্জুরকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

খেতাবের জন্য সব ধরনের সুপারিশ প্রথমে সেনাবাহিনীর কাছে একত্র করা হয়েছিল। সেক্টর ও সাব-সেক্টরগুলোর অধিকাংশ অধিনায়ক সেনা অফিসার হওয়ায় সুপারিশনামা তাঁরা প্রক্রিয়া করে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের শুরুতে আমার কাছে উপস্থাপন করেন। আমি ও পর্ষদের অন্য সদস্যরা মার্চ মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে এসব সুপারিশ যাচাই-বাছাই করে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধান সেনাপতির কাছে পাঠিয়ে দিই। ঠিক কতজনকে আমরা নিরীক্ষা করেছিলাম বা কতজনকে নির্বাচিত করেছিলাম, তা এই মুহূর্তে মনে না পড়লেও নির্বাচিতদের সংখ্যা ৭০০-র বেশি ছিল না। এর পরের ধাপে প্রধান সেনাপতির সুপারিশ বা সম্মতির পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী চূড়ান্তভাবে
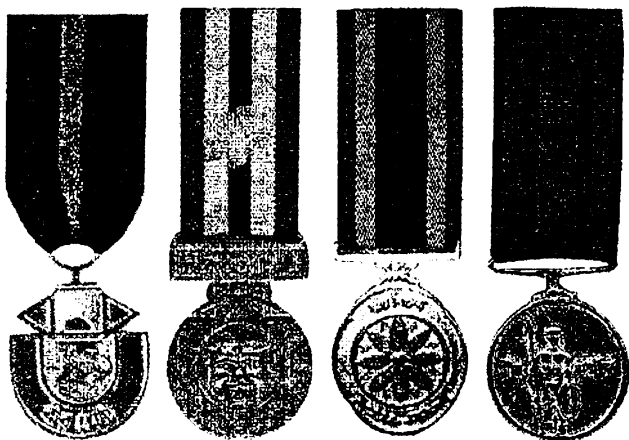
বীরত্বসূচক খেতাবের পদক যথাক্রমে বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক

অনুমোদন দেন। অনুমোদিত খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ১৯৭৩ সালের ২৬ মার্চ পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত তালিকায় ৫৪৬ জনের নাম ছিল। এই তালিকায় আগের গেজেটে উল্লেখিত ৪৩ জনের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পত্রিকায় নাম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকের মধ্যেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। মুক্তিযোদ্ধারা তালিকাটি ত্রুটিপূর্ণ মনে করেন এবং বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ উত্থাপন করেন। প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে ছিলেন সেসব মুক্তিযোদ্ধা, যাঁরা মনে করেছিলেন তাঁদের খেতাব পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পাননি। দ্বিতীয় ভাগে ছিলেন সেসব মুক্তিযোদ্ধা, যাঁরা মনে করেছিলেন তাঁদের যে স্তরের খেতাব পাওয়ার কথা, তা তাঁরা পাননি। আর তৃতীয় প্রতিক্রিয়ায় উল্লেখ ছিল যে, একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার উল্লেখ হয়েছে, এক বাহিনীর সদস্যকে অন্য বাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ নাম ও পরিচয় না থাকায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রাপককে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না ইত্যাদি। এই প্রতিক্রিয়াগুলো সরকারকে বেশ বিব্রত করে। ফলে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আগে প্রকাশিত খেতাবের তালিকা প্রত্যাহার করা হয় এবং বিস্তারিত পরীক্ষা শেষে পুনরায় নতুন তালিকা প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়।

এর মধ্যে খেতাবের বিষয়ে সব নথিপত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়ে আসা হয় এবং মন্ত্রণালয়ে এগুলো নতুনভাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা শেষে মন্ত্রণালয় খেতাবের তালিকায় তিনটি গরমিল খুঁজে পায়। এই গরমিলগুলো ছিল প্রথমত একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার উল্লেখিত হওয়া; দ্বিতীয়ত, তালিকায় কোনো কোনো প্রাপকের খেতাবের ধাপ পরিবর্তন হয়ে যাওয়া এবং তৃতীয়ত, কিছু নাম অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও প্রকাশিত তালিকায় সংযুক্ত থাকা। এই গরমিলগুলো সংশোধনের জন্য পুনরায় মন্ত্রণালয় থেকে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার কাছে পাঠানো হয়। আমি কর্নেল মঞ্জুরকে সঙ্গে নিয়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে ১১ ডিসেম্বর খেতাব তালিকার সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদের সুপারিশসহ আবারও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করি। এ দফায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উত্থাপিত গরমিলগুলো যতটা সম্ভব ঠিক করার চেষ্টা করি। প্রধানমন্ত্রী (প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে) খেতাবের চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন করেন। এটি ১৫ ডিসেম্বর গেজেট হিসেবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গেজেটটিতে বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা

থেকে যায়, যা পরে ২০০৪ সালে নতুন করে প্রকাশিত বাংলা গেজেটে কিছুটা কমিয়ে আনা হয়। এই গেজেট অনুযায়ী খেতাবের সারাংশ নিম্নরূপ :

বাহিনী/সেক্টর	বীরশ্রেষ্ঠ	বীর উত্তম	বীর বিক্রম	বীর প্রতীক	মোট
নিয়মিত বাহিনী					
সেনাবাহিনী	৩	৪২	৮৪	১৫৯	২৮৮
নৌবাহিনী	১	৮	৮	৭	২৪
বিমানবাহিনী	১	৬	১	১৩	২১
বিডিআর	২	৭	৩৬	১০৪	১৪৯
পুলিশ বাহিনী	-	-	৩	২	৫
মোজাহিদ/ আনসার বাহিনী	-	-	৬	৮	১৪
গণবাহিনী					
১ নম্বর সেক্টর	-	-	-	৭	৭
২ নম্বর সেক্টর	-	-	-	৩৯	৩৯
৩ নম্বর সেক্টর	-	-	-	৭	৭
৪ নম্বর সেক্টর	-	-	৩	৭	১০
৫ নম্বর সেক্টর	-	-	৪	৬	১০
৬ নম্বর সেক্টর	-	-	১	৪	৫
৭ নম্বর সেক্টর	-	-	৩	৫	৮
৮ নম্বর সেক্টর	-	-	৩	১৭	২০
৯ নম্বর সেক্টর	-	-	২	৪	৬
১০ নম্বর সেক্টর/ ১১ নম্বর সেক্টর	-	-	৯	৩৭	৪৬
অন্যান্য*	-	৫	১২	-	১৭
মোট	৭	৬৮	১৭৫	৪২৬	৬৭৬

* অন্য ১৭ জন কোনো বাহিনী বা সেক্টরের সদস্য ছিলেন না বা কারও অধীনে যুদ্ধ করেননি।

যেকোনো যুদ্ধে সৈনিককে বীরত্বসূচক খেতাব দেওয়া হয় তাঁর বীরত্ব প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। তাই বীরত্ব প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই খেতাব দেওয়া সম্ভব হয়নি। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি বিষয় ছিল দেশ পুনর্গঠন করা। তাই খেতাব দেওয়ার বিষয়টি খুব বেশি প্রাধান্য পায়নি। ফলে খেতাবের প্রক্রিয়া শেষ করতে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এ ছাড়া দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধকালের সামরিক

কাঠামো ভেঙে নতুন সামরিক কাঠামো ও নেতৃত্ব গঠনের ফলে খেতাব দেওয়ার প্রক্রিয়াটি বিঘ্নিত হয়। মাঠপর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কোনো পর্যায়েই খেতাব দেওয়ার বিষয়টি ঠিক যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল, তা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, গণবাহিনীর সদস্যরা কেন এত কম খেতাব পেয়েছেন। আমি স্বীকার করি, গণবাহিনীর আরও অনেক সদস্যেরই খেতাব পাওয়া উচিত ছিল। তাঁদের অনেকেই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ অথবা সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ তাঁরা তাঁদের বীরত্বের কোনো স্বীকৃতি পাননি। এ ধরনের ঘটনা ঘটার কিছু কারণ ছিল, যার কিছু ব্যাখ্যা আমি আগে দিয়েছি। যেমন প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সামরিক কাঠামোর পরিবর্তন, অগ্রগণ্যতায় খেতাবের বিষয়টি পিছিয়ে থাকা ইত্যাদি। তবে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল খুব স্বল্পমেয়াদি। এ সময়ে গণবাহিনীর সদস্যরা কেবল প্রশিক্ষিত হতে শুরু করেছিল এবং ধীরে ধীরে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করছিল। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে তারা ধীরে ধীরে নেতৃত্ব, পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে আরও বেশি করে সম্পৃক্ত হতে পারত। তাদের অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকলে ধীরে ধীরে তারাই বাংলাদেশের বাহিনীপ্রধান ও মূল শক্তিতে রূপান্তরিত হতো। কিন্তু বিষয়টি ওই পর্যায়ে আসার আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন বাহিনী থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া সৈনিকেরাই পূর্বপ্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার কারণে যুদ্ধকালে বেশি তৎপর ছিল এবং মাঠপর্যায়ে সফল নেতৃত্ব দেয়। স্বভাবত তারাই খেতাবপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পায়।

আর একটি বড় বিষয় হলো, মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে গণবাহিনীর কোনো সাংগঠনিক কাঠামো ছিল না। গণবাহিনীর সদস্যরা ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে মিলিশিয়া বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ওই বাহিনী বিলুপ্ত করা হলে তাদের আর কোনো সাংগঠনিক পরিচয় থাকে না। তারা সবাই তাদের আগের পেশা বা অবস্থানে চলে যায়। এ কারণে গণবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো তালিকাও করা সম্ভব হয়নি বা তাদের কোনো নাম-ঠিকানাও রাখা যায়নি। খেতাবের বিষয়েও তাদের জন্য পৃথক কোনো উদ্যোগ নেওয়া যায়নি। সেক্টর ও সাব-সেক্টর অধিনায়কেরা সুপারিশনামা তৈরি করেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার বেশ পরে। সে সময় গণবাহিনীর অনেক সদস্যের নাম-ঠিকানা তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। ফলে সেক্টর কমান্ডাররা

যাদের বীরত্বের কথা স্মরণে রাখতে পেরেছিলেন, শুধু তাদের খেতাবের জন্য সুপারিশ করেন।

আমি আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক খেতাব প্রদানের সিদ্ধান্তে সব সেক্টর অধিনায়ক একমত ছিলেন না। কয়েকজন সেক্টর অধিনায়ক মনে করতেন, খেতাবের বিষয়টি পেশাদার সৈনিকদের জন্য প্রযোজ্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খেতাব অবমাননাকর বা অপ্রয়োজনীয়। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমকে খাটো করে দেখা হয়। খেতাবের বিষয়ে এই মতপার্থক্যের কারণেও সব সেক্টর থেকে যথোপযুক্ত-সংখ্যক সুপারিশ করা হয়নি। খেতাবের বিষয়ে আমার শেষ কথা হচ্ছে, খেতাব প্রদানের বিষয়ে আমরা আরও উদারতা দেখাতে পারতাম; সরকারও খেতাবের বিষয়ে আরও বাস্তবসম্মত নীতিমালা গ্রহণ করতে পারত। একই সঙ্গে সে সময়ের ফোর্স, সেক্টর ও সাব-সেক্টর অধিনায়কেরা আরও বিচক্ষণতার সঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বাচিত করতে পারতেন।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

৩ ডিসেম্বর শেষ রাতে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী একত্র হয়ে যৌথভাবে আক্রমণ শুরু করার পর পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনীর যে কয়টি যুদ্ধবিমান ছিল, সেগুলো তারা যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেনি। ভারতীয় বিমানবাহিনী সেগুলোর ওপর বোমাবর্ষণ করে বেশির ভাগই অকেজো করে দেয়, অথবা এগুলো ব্যবহার করার জন্য যে রানওয়েগুলো ছিল, তা ধ্বংস করে ফেলে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শত্রুর কোনো কার্যকর বিমানবাহিনী ছিল না। যৌথ নেতৃত্বের অধীনে যুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানিরা তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো পরিত্যাগ করে পেছনে সরে যেতে থাকে। পরাজয়ের গতি ত্বরান্বিত হয়। লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে 'পুল ব্যাক' করে ঢাকার কাছাকাছি আসতে নির্দেশ দেন। ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করলে পাকিস্তানিরা খাবারের টেবিলে খাবার ফেলে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। এদের একাংশ দক্ষিণেও সরে পড়ে। সম্ভবত নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তারা দক্ষিণে গিয়েছিল। ওদের একটি ধারণা ছিল যে হয়তো দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে তাদের উদ্ধারের জন্য আমেরিকার জাহাজ আসতে পারে। আর আমেরিকান জাহাজে করে তারা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে নিরাপদে পাকিস্তানে চলে যেতে পারবে।

তাদের যুদ্ধ করার মনোবল বেশ আগেই ভেঙে গিয়েছিল। তারা জানত যে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত জনগণ তাদের বিরুদ্ধে। ৯ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করার কথা কয়েকবার উঠেছিল, তবে চূড়ান্তভাবে ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে তারা

আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী নিয়োগ, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব, আত্মসমর্পণের জন্য আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ে সময় ক্ষেপণ চলছিল। পাকিস্তানি সেনারা রণক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারছিল না। তারা মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে দিশাহারা হয়ে পড়ে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে তারা ভয় পাচ্ছিল। পাকিস্তানিরা পরাজয়ের একদম দ্বারপ্রান্তে চলে আসে। ভারতীয় বাহিনী তাদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। কিন্তু ইয়াহিয়া তখন পর্যন্ত আমেরিকার হস্তক্ষেপ আশা করছিল। এই আশায় ইয়াহিয়া আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।' শেষ মুহূর্তে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য মাত্র ১৩ দিনের চূড়ান্ত যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

৬ ডিসেম্বর সকালে ভুটান ও বিকেলে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতির এই খবর শুনে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে খুব আনন্দ-উল্লাস হয়। তাদের স্বীকৃতির এই আনন্দ শুধু সদর দপ্তরে নয়, সারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে যায়। তাদের স্বীকৃতি প্রদানের অর্থ হলো, দেশ প্রায় স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। দেশের স্বাধীনতা অর্জন অনেকাংশে নিশ্চিত হয়ে যায়। তাদের এই স্বীকৃতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও প্রভাবিত করবে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বাস্তবেও তা-ই হলো। এই ঘোষণার পূর্বে সব দেশই হয়তো ভাবত, পাকিস্তান একটি স্বাধীন দেশ এবং পূর্ব পাকিস্তান তার একটি প্রদেশ। তাই অন্যান্য দেশ এই যুদ্ধে কোনো মন্তব্য করতে কিংবা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকে।

৭ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. আবদুল মোত্তালিব মালিক যুদ্ধবিরতির জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে একটা আবেদন করেন। ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশও নিয়াজিকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। ৯ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী যুদ্ধ বন্ধ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাদের সরিয়ে নেওয়ার একটা বন্দোবস্ত করার জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে একটি বার্তা পাঠায়। এদিন ভারতীয় বিমানবাহিনীর মিগ-২১ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর বেশ কয়েকবার আক্রমণ করে। ৯ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজি, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর আত্মসমর্পণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ১৩ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। এদিন জেনারেল নিয়াজি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে

সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'ঢাকা রক্ষার জন্য আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যাব।' তিনি সম্ভবত মার্কিন সপ্তম নৌবহরের কথা বিবেচনা করে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। পাকিস্তানিরা যুদ্ধের শুরু থেকেই মনে করত, এই যুদ্ধে আমেরিকা কিংবা চীন কিংবা উভয়েই তাদের সাহায্য করবে অথবা কোনো প্রকার মধ্যস্থতা করে যুদ্ধ বন্ধ করতে সহায়তা করবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা তাদের সেই আশা জাগিয়ে রেখেছিল।

১৪ ডিসেম্বর বিকেল চারটায় ভারতীয় বিমানবাহিনী গভর্নর হাউসে (বর্তমানে বঙ্গভবন) অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় আক্রমণ করে। গভর্নর ডা. মালিক ভীত হয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে রূপসী বাংলা হোটেল) গিয়ে রেডক্রসের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় পাকিস্তানিদের মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। নিয়াজি আত্মসমর্পণ করতে নারাজ থাকলেও এ ঘটনার পর আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠালেও ভারত আশ্বস্ত ছিল এই ভেবে যে ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৬টি যুদ্ধজাহাজ (যার মধ্যে পাঁচ-ছয়টি সাবমেরিন)সহ তাদের ষষ্ঠ নৌবহর অবস্থান করছিল। ফলে আমেরিকার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা খুব সহজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত মার্কিন নৌবহরের পাকিস্তানিদের সহায়তা না করার পেছনে সম্ভবত অন্যান্য কারণের মধ্যে এটি ছিল প্রধান।

ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বারবার আত্মসমর্পণের কথা প্রচার করা হচ্ছিল। যুদ্ধে পাকিস্তানিরা যখন পরাজয়ের খুব কাছে চলে আসে, তখন ভারতীয় সর্বোচ্চ নেতৃত্ব লিফলেট ও বেতারের মাধ্যমে আত্মসমর্পণের বার্তা প্রচার করতে থকে। পাকিস্তানিদের তারা আহ্বান করে, 'আত্মসমর্পণ করো। যুদ্ধে তোমরা আর টিকে থাকতে পারবে না। ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য সময় থাকতেই তোমরা আত্মসমর্পণ করো। তোমাদের আমরা নিরাপত্তা দেব। তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযান আর হবে না।' ১৫ ডিসেম্বর খুব জোরালোভাবে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের কথা শোনা যায়। জেনারেল মানেকশ ১৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টা পর্যন্ত আত্মসমর্পণের জন্য সময় বেঁধে দেয়। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ঢাকা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেয়। একই সময়ে ভারতীয় বাহিনী তাদের বহর নিয়ে শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে যায়। ১৬ ডিসেম্বর সকাল আটটার দিকে জেনারেল নিয়াজি ভারতীয় সেনাবাহিনী-প্রধানের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সময়ের মেয়াদ আরও ছয় ঘণ্টা বাড়ানোর অনুরোধ করেন

এবং তাঁদের নিরাপদে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার নিশ্চয়তা চান। এরপর বেতারে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর প্রচারিত হয়।

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসার কর্নেল পি দাস অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ফারুক আজিজ খানের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে অনুষ্ঠেয় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর জানান। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানীর খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারেন যে কর্নেল ওসমানী, ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত (ভারতীয় বাহিনী) এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুর রব মুক্ত এলাকা পরিদর্শনে সিলেট গেছেন। কর্নেল ওসমানী ১৩ ডিসেম্বর সিলেটের মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনের পরিকল্পনা করেন। যাত্রার আগে তাঁকে আমি বলেছিলাম, 'স্যার, আপনার এখন কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। দ্রুতগতিতে যুদ্ধ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেকোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।' কর্নেল ওসমানী তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন না করে সিলেটের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

কর্নেল ওসমানীর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিকেল চারটায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমি বাংলাদেশ বাহিনীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করব। এ সময় আমি সম্ভবত কমল সিদ্দিকীসহ কয়েকজন আহত মুক্তিযোদ্ধাকে দেখার জন্য গিয়েছিলাম। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমার যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর ড. ফারুক আজিজ খান এবং প্রধানমন্ত্রীর মিলিটারি লিয়াজোঁ অফিসার মেজর নূরুল ইসলাম আমাকে চারদিকে খুঁজতে শুরু করেন। এঁদের সঙ্গে আমার নিউ মার্কেটের কাছে দেখা হয়। তাঁরা আমাকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়টি জানান। তাঁরা আরও জানান যে তাজউদ্দীন আহমদ আমাকে সরাসরি দমদম বিমানবন্দরে যেতে বলেছেন। সে সময় আমার পরনে বেসামরিক পোশাক, অর্থাৎ একটা শার্ট আর সোয়েটার ছিল, আমি এগুলো বদলে সামরিক পোশাক পরারও সময় পেলাম না। এ অবস্থাতেই আমি দমদম বিমানবন্দরের দিকে রওনা হই। মেজর নূরুল ইসলাম, ড. ফারুক আজিজ খান ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজা আমাকে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছে দেন। সেখানে গিয়ে দেখি যে একটি সামরিক যাত্রীবাহী বিমান দাঁড়ানো আছে।

আমি আমার সফরসঙ্গীদের বিদায় জানিয়ে টারমাকে দাঁড়িয়ে থাকা সামরিক বিমানে আরোহণের জন্য বিমানের দু-তিন সিঁড়ি ওঠার পর লক্ষ করলাম, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি জিপ বিমানের দিকে আসছে। জিপের

পতাকা ও তারকা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে আরোহী কোনো উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা হবেন। জিপটি সিঁড়ির কাছে এসে থামলে লক্ষ করলাম, মিত্রবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং মিসেস বান্তি অরোরা গাড়ি থেকে নামছেন। জেনারেল অরোরার পরনে ছিল ধূসর রঙের ফুলপ্যান্ট ও জামা, মাথায় শিখদের ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি; মিসেস অরোরার পরনে ছিল বেগুনি রঙের শাড়ি। আমি সিঁড়ির মধ্যে কিছুটা সরে গিয়ে তাঁদের জন্য জায়গা করে দিলাম, যাতে তাঁরা বিমানে উঠতে পারেন। জেনারেল অরোরা আমার পিঠে হাত দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার। আপনি আগে যাবেন।'

বিমানের মধ্যে ঢুকে দেখলাম ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আগেই আসন গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা দমদম বিমানবন্দর থেকে প্লেনে রওনা হয়ে ঢাকার ওপর দিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরে এসে নামি। তেজগাঁও বিমানবন্দরের রানওয়ে যুদ্ধে খুব খারাপভাবে বিধ্বস্ত হওয়ায় সেখানে কোনো ফিক্সড উইং বিমান ওঠানামা করা সম্ভব ছিল না। সেখানে একমাত্র হেলিকপ্টারই ওঠানামা করছিল। এ কারণে আমদের সরাসরি ঢাকার বদলে আগরতলা যেতে হয়েছিল। আগরতলা পৌঁছে দেখি, বেশ কয়েকটি হেলিকপ্টার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ইতিমধ্যে ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল জ্যাকব আত্মসমর্পণের দলিল নিয়ে আলোচনার জন্য দুপুর একটার দিকে হেলিকপ্টারযোগে তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকের সিদ্দিকী এবং জাতিসংঘের ঢাকা প্রতিনিধি জন কেলি তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। ব্রিগেডিয়ার বাকের জেনারেল জ্যাকব ও কর্নেল খারাকে (ভারতীয়) নিয়ে পূর্বাঞ্চল (পাকিস্তান) বাহিনীর সদর দপ্তরে পৌঁছান। এয়ার কমোডর পুরুষোত্তম বিমানবন্দরে থেকে যান জেনারেল অরোরাসহ আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে।

জেনারেল নিয়াজির অফিসে এসে জেনারেল জ্যাকব লক্ষ করেন যে নিয়াজি আর জেনারেল নাগরা পাঞ্জাবি ভাষায় পরস্পরকে একটার পর একটা স্থূল আদিরসাত্মক কৌতুক উপহার দিচ্ছেন। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেনারেল রাও ফরমান আলী, জেনারেল মোহাম্মদ জামসেদ খান, রিয়ার এডমিরাল শরিফ ও এয়ার ভাইস মার্শাল ইনাম উল হক। নিয়াজির সঙ্গে

আলোচনার আগে জ্যাকব জেনারেল জি সি নাগরাকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক ভারতীয় সৈনিক ঢাকায় আনার নির্দেশ দেন এবং ঢাকার নিরাপত্তা, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি যেমন, গার্ড অব অনার, টেবিল-চেয়ার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পাঠিয়ে দেন।

এরপর দুই পক্ষের মধ্যে আত্মসমর্পণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। পিনপতন নীরবতার মধ্যে কর্নেল খারা আত্মসমর্পণের শর্তগুলো পড়ে শোনান এবং খসড়া কপিটি জেনারেল নিয়াজিকে দেন। পাকিস্তানিরা ধারণা করেছিল যে আত্মসমর্পণ নয়, যুদ্ধবিরতি হবে। আত্মসমর্পণের সংবাদ পেয়ে তারা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। জেনারেল ফরমান আলী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের বিরোধিতা করেন, তিনি ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের পক্ষে মত দেন। জেনারেল নিয়াজি দলিলটি অন্যদের দেখার জন্য দেন। কেউ কেউ কিছু পরিবর্তনের কথা বলেন। দলিলে পাকিস্তানিদের পক্ষে বেশ কিছু শর্ত ছিল, যেমন পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আচরণ করা হবে এবং সার্বিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হবে। এমনকি পাকিস্তানপন্থী সব বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তার বিষয়ও দলিলে উল্লেখ ছিল, যা আগে কখনো কোনো আত্মসমর্পণের দলিলে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পাকিস্তানিরা আরও কিছু সময় নেওয়ার পর আত্মসমর্পণের দলিলে সম্মতি দেয়।

এরপর আত্মসমর্পণের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ শুরু হয়। জেনারেল জ্যাকব জানান, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান হবে রেসকোর্স ময়দানে। সেখানে প্রথমে ভারত ও পাকিস্তানি বাহিনীর সম্মিলিত দল জেনারেল অরোরাকে গার্ড অব অনার প্রদান করবে। এরপর আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর হবে এবং শেষে জেনারেল নিয়াজি তাঁর অস্ত্র ও পদবির ব্যাজ খুলে জেনারেল অরোরাকে হস্তান্তর করবেন। আত্মসমর্পণ পদ্ধতির কিছু কিছু ব্যবস্থায় জেনারেল নিয়াজি গররাজি ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান তাঁর অফিসেই হোক। শর্তগুলোর বিষয়ে জেনারেল জ্যাকবের অনড় অবস্থানের কারণে শেষে জেনারেল নিয়াজি সবই মেনে নেন, তবে আত্মসমর্পণের পরও নিরাপত্তার জন্য তাঁর অফিসার ও সৈনিকদের ব্যক্তিগত অস্ত্র নিজেদের কাছে রাখার অনুমতি চান। জ্যাকব তা মেনে নেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাধারণত বিজিত সেনাপতি বিজয়ী সেনাপতির সদর দপ্তরে গিয়ে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দেন ও অস্ত্র সমর্পণ করেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এটির ব্যতিক্রম ঘটানো হয়। এখানে বিজয়ী সেনাপতি বিজিত সেনাপতির

এলাকায় গিয়ে জনসমক্ষে আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেন।

হেলিকপ্টারে করে পড়ন্ত বিকেলে আমরা তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে অবতরণ করি। অবতরণ করার সময় দেখি হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তেজগাঁও বিমানবন্দরে জেনারেল নিয়াজি, জেনারেল জ্যাকব এবং আরও কিছু পাকিস্তানি ও মিত্রবাহিনীর কর্মকর্তা আমাদের অভ্যর্থনা জানান। এরপর জিপে করে আমরা রমনা রেসকোর্স ময়দানে রওনা হই। রেসকোর্সে আমি জেনারেল অরোরার সঙ্গে তাঁর জিপে ভ্রমণ করি। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, মানুষজন উৎফুল্ল, সবার মুখে হাসি এবং প্রশান্তির ছায়া। রমনার চারপাশে মানুষের ব্যাপক ভিড়। এমন পরিস্থিতিতে ভিড় ঠেলে আমরা উপস্থিত হলাম রমনা ময়দানের সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে। অনুষ্ঠানটি ছিল অনাড়ম্বর এবং এটি অল্প সময়ে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে মাত্র দুটি চেয়ার আর একটি টেবিল ছিল। একটি চেয়ারে জেনারেল নিয়াজি ও অন্যটিতে জেনারেল অরোরা বসলেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটি খুব সুশৃঙ্খলভাবে হয়নি। মানুষের

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, রেসকোর্সে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। বাঁদিকে জেনারেল অরোরার পেছনে আমি

ভিড়ে অতিথিদের দাঁড়িয়ে থাকাটা কঠিন ছিল। আমি, ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান রিয়াল এডমিরাল এস এম নন্দা ও পূর্বাঞ্চল বিমানবাহিনীর কমান্ডার এয়ার মার্শাল হরি চান্দ দেওয়ান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর পাশেই ছিলেন পূর্বাঞ্চল সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল এফ আর জ্যাকব। আমি জেনারেল অরোরার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অশোক রায় আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন, যদিও ভিড়ের চাপে আমরা আমাদের অবস্থান ধরে রাখতে পারছিলাম না।

আত্মসমর্পণের দলিল নিয়ে আসা হলো। প্রথমে পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান জেনারেল নিয়াজি এবং পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা দলিলে স্বাক্ষর করলেন। স্বাক্ষরের জন্য নিয়াজিকে কলম এগিয়ে দেন অরোরা। প্রথম দফায় কলমটি দিয়ে লেখা যাচ্ছিল না। অরোরা কলমটি নিয়ে কিছু ঝাড়াঝাড়ি করে পুনরায় নিয়াজিকে দেন। এ দফায় কলমটি আর অসুবিধা করেনি। পরে জেনেছি, ওই দিন শুধু আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করার জন্যই অরোরা কলকাতা থেকে কলমটি কিনে এনেছিলেন। স্বাক্ষর শেষ হলে উভয়েই উঠে দাঁড়ান। তারপর আত্মসমপর্ণের রীতি অনুযায়ী জেনারেল নিয়াজি নিজের রিভলবারটি কাঁপা কাঁপা হাতে অত্যন্ত বিষণ্নতার সঙ্গে জেনারেল অরোরার কাছে হস্তান্তর করেন। এরপর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানি সৈন্য ও কর্মকর্তাদের কর্ডন করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।

আত্মসমর্পণের পর ঢাকায় নয় মাস ধরে অবরুদ্ধ থাকা জনতা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে; কয়েকজন আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। আমরা কোনো কথাই বলতে পারছিলাম না। আবেগে সবাই বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর অনেকে বলল, 'আহ! আজ থেকে আমরা শান্তিতে, নির্ভয়ে ঘুমাতে পারব।'

আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমরা জিপে করে বিমানবন্দরে চলে আসি। সেখান থেকে হেলিকপ্টারযোগে আমরা আগরতলা হয়ে কলকাতায় যাই। কলকাতা যখন পৌঁছাই, তখন রাত হয়ে গেছে। তখন নিজেকে খুব নির্ভার মনে হচ্ছিল। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ওই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেলাম, দেশের মানুষ এখন শান্তিতে থাকবে, মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তি পাবে।

উপসংহার

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমি কলকাতা থেকে ১৭ ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরে আসতে চাই, কিন্তু কর্নেল ওসমানী আমাকে আসতে দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি ইতিমধ্যে সিলেট থেকে কলকাতায় চলে এসেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা সবাই একসঙ্গে বাংলাদেশে যাব।' আমি দ্রুত আসতে চাচ্ছিলাম, কারণ যুদ্ধে ঢাকা বিমানবন্দর এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে অতিদ্রুত এর পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা খুব জরুরি ছিল। স্বাধীন দেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগের এটিই চিল একমাত্র মাধ্যম। যাহোক, ১৯ বা ২০ ডিসেম্বরে আমি একটি অটার বিমানে ঢাকায় চলে আসি। তখন সম্ভবত আমার পরিবারের সঙ্গে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজার পরিবারও ছিল।

রাজনৈতিক নেতারা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বাংলাদেশে আসেননি। কলকাতায় থাকাকালে শুনেছি যে ভারতীয় বাহিনী রাজনৈতিক নেতাদের ঢাকায় আসা তখনো নিরাপদ মনে করছিলেন না। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে একটি সরকারকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করার জন্য ব্যাপক নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়। ভারতীয় বাহিনী নতুন সরকার ও রাজনীতিবিদদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পর তাঁদের ঢাকায় আসার পরামর্শ দেয়। কর্নেল ওসমানীও ভারতীয় বাহিনীর প্রস্তাব মেনে নেন। ফলে বেশ কয়েক দিন পর তাঁরা সবাই একসঙ্গে ঢাকায় ফিরে আসেন।

ঢাকা থেকে তিন-চার দিন পর মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি পাবনায় যাই। বাড়ি ফিরে দেখি, আমাদের বাড়িঘরে যা ছিল, যুদ্ধের সময় তা বিহারিরা লুট করে নিয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির পাশেই বিহারিরা থাকত। মা, বাবা, চাচা, ফুফুরা অন্য গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। যুদ্ধের সময় যারা

দেশ থেকে কলকাতায় আসত, আমি তাদের মাধ্যমে আত্মীয়স্বজনের খবর পেতাম। যুদ্ধের মধ্যে আমার এক ফুফু, যিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন, ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর এ মৃত্যু যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। যুদ্ধের সময় এ খবর শুনে আহত হয়েছি। এ ছাড়া যুদ্ধের সময় আমার স্ত্রীর খালাতো বোনের স্বামীকে পাকিস্তানিরা হত্যা করে।

আমি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর আমার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমার বড় ভাই ও মেজো ভাইকে পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। তবে তারা আমার ভাইদের সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার বা তাদের শারীরিক নির্যাতন করেনি। পাকিস্তান বিমানবাহিনী জানতে চেয়েছিল যে আমি কোথায় আছি। আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। আমি কাউকে এমনকি পরিবারের কোনো সদস্যকেও মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কথা বলে যাইনি। ভাইদের বলেছিলাম, আমরা ঠাকুরগাঁও যাচ্ছি। পাকিস্তানিরা আমার ভাইদের বলে যে আমি যেন দ্রুত বিমানবাহিনীতে ফেরত আসি।

মে মাসের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের পর আমার পরিষ্কার একটা ধারণা হয়েছিল যে ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ দেশ পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হবে। এ ধারণার পেছনে আমার তিনটি কারণ ছিল। প্রথমত, ভারত যত বড় দেশই হোক, তার পক্ষে খুব বেশি দিন ধরে লাখ লাখ শরণার্থীকে স্থান, খাবার ও চিকিৎসা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করা খুব দুরূহ হবে। এসব তারা বছরের পর বছর চালিয়ে যেতে পারবে না। এমনকি যদি সেটা হতো, তাহলে ভারতের সাধারণ মানুষজনও আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠত। অর্থাৎ যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে তারা শুধু আর্থিকভাবে নয়, সামাজিক দিক থেকেও অস্থিতিশীল হতে পারত। তাই ভারত যত দ্রুত সম্ভব এই যুদ্ধ শেষ করবে।

দ্বিতীয়ত, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করতে চাইলেও বৈরী আবহাওয়ার কারণে তা সে করতে পারবে না। তখন চীন-ভারত সীমান্তে বরফ পড়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে চীন সীমান্ত এলাকায় সৈন্য সমাবেশ করতে পারবে না। তাই এই সময় ছিল ভারতের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নামার উপযুক্ত সময়। তৃতীয়ত, পাকিস্তানের দুই অংশকে আলাদা করে পাকিস্তানকে দুর্বল করা ভারতের অনেক দিনের ইচ্ছা। তাই ভারত নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়কে যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য নির্ধারণ করবে। এই সব দিক বিবেচনা করে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ভারতের জন্য যুদ্ধের উৎকৃষ্ট সময় হলো শীতকাল। আমি আরও ভেবেছিলাম, শীতকালে পাকিস্তান যদি ভারতের ওপর আক্রমণ না-ও করে,

ভারত সরকার কোনো-না-কোনোভাবে পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ করবে এবং পাকিস্তানকে পরাজিত করবে। আমি যুদ্ধের সময় অনেককে বলেছি যে বছরের শেষে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে যেতে পারব। যাহোক, পাকিস্তানই ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে। পাকিস্তান ভেবেছিল যে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হবে, তারপর আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে তার মেয়াদ দীর্ঘায়িত করবে।

যুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী থেকে গণবাহিনী বা গেরিলাযোদ্ধার সংখ্যা বেশি ছিল। আমার মতে, মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধটা ছিল প্রকৃত অর্থে গেরিলাযুদ্ধ। সম্মুখযুদ্ধ বা প্রচলিত যুদ্ধ করার মতো ভারী সমরাস্ত্র আমাদের ছিল না। তাই বেশির ভাগ সময়ই আমাদের গেরিলাযুদ্ধের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। যদিও শেষের দিকে আমরা কিছু কনভেনশনাল বা প্রথাগত যুদ্ধ করেছি। আমার বিবেচনায় গেরিলাযোদ্ধারাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ।

যুদ্ধ চলাকালে আমি বিভিন্ন সেক্টর পরিদর্শনে যাই এবং মাঠপর্যায়ের অনেক ক্যাম্প পরিদর্শন করি। সেখানে আমার এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সৃষ্টি হতো। সেখানে খাবার নেই, বৃষ্টিতে সব ভিজে গেছে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের কারও মুখে কোনো হতাশা নেই। কোনো অভিযোগ নেই। তারা শুধু চেয়েছে অস্ত্র। তারা বলেছে, 'স্যার, আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। আমরা যুদ্ধ করতে চাই, দেশকে স্বাধীন করতে চাই, আমাদের অস্ত্র দিন।' মুক্তিযোদ্ধাদের এ ধরনের প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল।

আগস্ট মাসের কোনো একদিন আমি কুড়িগ্রাম জেলার কাছে ভুরুঙ্গামারীতে যাই। তখন রাত প্রায় সাড়ে ১২টা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে আমি সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছি। ক্যাম্পটি ছিল ছেঁড়া ত্রিপল দিয়ে তৈরি। তাতে ছিল শ তিনেক যুবক। এদের মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র, কৃষক, দোকানদার, রিকশাচালকসহ সব পেশারই যোদ্ধা ছিল। ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে দেখি, গেরিলারা একটি টিনের থালায় ঠান্ডা ডাল দিয়ে ঠান্ডা ভাত খাচ্ছে। আমি ধারণা করেছিলাম, তারা ডেপুটি চিফ অব স্টাফকে পেয়ে তাঁর কাছে এ বিষয়গুলো, অর্থাৎ তাদের দুঃখকষ্ট নিয়ে অভিযোগ করবে, যেমন, 'আমাদের থাকার জায়গা দিচ্ছে না', 'খাওয়াদাওয়া দিচ্ছে না' ইত্যাদি। আমি অবাক হয়ে গেলাম, একটি ছেলেও কোনো অভিযোগ করল না। বরঞ্চ তারা বলল, 'স্যার, আমাদের অস্ত্র কবে আসবে। আমাদের অস্ত্র দিন। আমরা যুদ্ধে যেতে চাই।' শত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার জন্য কতটুকু যুদ্ধের স্পৃহা থাকলে যুবকেরা ওই ধরনের উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলতে পারে, তা এখন আমি অনুভব

করতে পারি। বুঝতে পারতাম যে দেশের ক্রান্তিকালে কোনো অভিযোগ মনে আসে না, বরং জিজ্ঞাসা, স্বাধীনতার আর কতটুকু বাকি। এক ক্যাম্পে একজন অসুস্থ যুবক দেখি। সেখানে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, তবু সে ক্যাম্প ছাড়তে নারাজ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে লাখ লাখ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভিড় করে আছে। যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, বেদনা ও ত্যাগ। মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধৈর্য এবং ত্যাগের ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এটা কোনো ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগের বিনিময়ে বা একক কোনো দলের জন্য হয়নি। এটি ছিল আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস। তাই সম্মিলিতভাবে বিজয় অর্জন করার লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে আমরা যদি এই দেশকে এগিয়ে নিতে চাই, তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো আমাদেরও একতাবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয় কে এম সফিউল্লাহকে। সেনাবাহিনীর প্রচলিত আইন অনুযায়ী জিয়াউর রহমানের সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ার কথা ছিল। এর ফলে সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের এই ঘটনাটি না হলে হয়তো স্বাধীনতা-পরবর্তী সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা আরও ভালো থাকত।

মুক্তিযুদ্ধের আগে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পাকিস্তানিরা বাঙালি ও বাংলাদেশের উন্নয়নকে বিবেচনায় আনেনি। আমি স্বপ্ন দেখতাম, দেশ স্বাধীন হবে, সত্যিকারভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে, আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি হবে। দেশের সরকার কাজ করবে শুধু মানুষের উন্নয়নের জন্য, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আজ আমার সেই স্বপ্ন সার্বিকভাবে কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, সেটা বলা কঠিন।

বাঙালি এক বিদ্রোহী জাতির নাম। এ জাতির মধ্যে মিশে লীন হয়ে আছে বহু জাতি-গোষ্ঠী, যারা বাংলায় এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

তুর্কি, আফগান, মোগল, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একই সুতায় গাঁথা। ঐতিহাসিকভাবেই বাঙালি জাতি শত অত্যাচার-নির্যাতনে কখনো কারও কাছে মাথা নত করেনি। তারা অত্যাচারী শাসক আর শোষণের

বিরুদ্ধে লড়াই করেছে যুগ যুগ ধরে। এই লড়াইয়ে কখনো তারা জয়ী হয়েছে, আবার কখনো বা পরাজিত। কিন্তু হার স্বীকার করেনি। সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছে, প্রস্তুতি নিয়েছে, পাল্টা আঘাত হেনেছে। সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ভাঙার জন্য তারা অসমসাহসের সঙ্গে ঢেলে দিয়েছে বুকের রক্ত। তাদের কৃতি রবে চির অম্লান। দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়,

আমি গাই তারি গান—
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি খরশান
হইলো বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে
তাদের ভাঙার ইতিহাস-লেখা। যাহাদের নিঃশ্বাসে
জীর্ণ পুঁথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষার ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল, এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া স্বাধীনতায় তা পূর্ণতা পেল। এত অল্প সময়ে কোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমার ধারণা, আমাদের স্বাধীনতা অর্জন আরও স্বল্প সময়ে হতে পারত, যদি সঠিক সময়ে রাজনৈতিক নেতারা স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিতেন এবং আমাদের নির্দেশনা দিতেন। সর্বস্তরের মানুষের সাহসী পদক্ষেপ ও অংশগ্রহণ তা-ই প্রমাণ করে।

ঢাকায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান শেষে হেলিকপ্টারযোগে যখন আগরতলা যাচ্ছিলাম, তখন সন্ধ্যা নেমে আসায় হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটির ভূখণ্ড দেখতে পারিনি। ওখান থেকে বিমানে করে যখন কলকাতা পৌঁছাই, তখন রজনীর প্রথম প্রহর। বাংলাদেশের আকাশসীমা পেরিয়ে দমদম বিমানবন্দরে যখন পা রাখি, তখন স্বতন্ত্র পরিচয়ে একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে পরিচিত হলাম। যে আত্মপরিচয় ছিল সাড়ে সাত কোটি জনতার আকাঙ্ক্ষা।

কলকাতায় ফিরে আসার সময়টুকুতে দীর্ঘ নয় মাসের স্মৃতিগুলো মনের আয়নায় ভেসে উঠছিল। বিমানটি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন ধূসর মেঘরাশিকে ভেদ করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন কল্পনার সাগরে হাতছানি দিতে লাগল আগামীর স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখি এই মেঘকে অপসারিত করে উদয় হবে আগামী প্রভাতের সোনালি সূর্য। সেই নতুন সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হবে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি, জনপদ ও মানুষ। আজ স্বাধীনতার ৪৩ বছরে পা রেখে নিজের মনের ভেতর প্রশ্ন জাগে, কতটুকু আলোকিত হয়েছে প্রিয় মাতৃভূমি?

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

২৮ জুন ১৯৭১, বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে দেওয়া নির্দেশাবলি

<u>TOP SECRET</u>

Copy No 22 of 24 copies

<u>OP IMMEDIATE (BY COURIER)</u>
No. 0001 G
HQ BANGLADESH FORCES,
FIELD
C/O GOVERNMENT OF THE PEOPLES'
REPUBLIC OF BANGLADESH,
MUJIB NAGAR.

28 June 71

To

Commanders
All Sectors/Battalions E BENGAL

Subject :- <u>COMMAND AND CONTROL OF BANGLA DESH FORCES AND OPERATIONAL LIAISON/ CO-ORDINATION WITH SUPPORTING FORCES</u>

<u>INTRODUCTORY</u>

1. Some doubts seem to persist on the subject of command and control of the Bangla Desh Forces, and operational liaison and co-ordination with supporting forces. These are clarified in the succeeding paragraphs, for the success of Bangla Desh Forces in the speediest destruction of the occupation forces, the mission given to the forces by the Government of Bangla Desh.

<u>COMPOSITION OF BANGLA DESH FORCES (MUKTI BAHINI)</u>

2. The term Bangla Desh Forces covers regular soldiers, sailors, airmen of all ranks, personnel of civil armed forces (like EPR), auxiliary forces like 'Mujahids' and 'Ansars', now embodied and operating with regular forces (in which they are being absorbed on successful completion of further training, where considered necessary, to attain the requisite standard), Civil Police personnel who have been operating with the regular forces, Civilian officers who have been fighting with the forces and other civilians filling specific combatant functions such as drivers, fitters or as NCsE (cooks, sweepers etc), as well as irregular forces such as guerillas and Special Forces operating on the ground, water or air.

3. The following nomenclatures will be used :-

a. <u>Regulars (NIYOMITO BAHINI)</u>

(1) <u>Army</u>

Regulars of the Infantry, grouped into the East Bengal Regiment (abbreviated -- E BENGAL), which will include personnel of the EPR, embodied 'Mujahids' and 'Ansars', and regulars from other Arms/Services eg, AC/Arty/Sigs, etc

<u>TOP SECRET</u> 2/-

(2) Navy
(3) Air Force

Regulars from Navy and Air Force.

b. Irregulars ('GONO BAHINI')

Comprising of -

(1) Guerillas

Personnel trained in guerilla warfare.

(2) Special Forces

Personnel who have received special guerilla or other training.

4. All personnel of the Bangla Desh Forces come under the relevant services acts, viz, Army, Navy or Air Force Acts and connected regulations made applicable, mutatis mutandis, to Bangla Desh by the President under the Continuance of Laws Order of April 1971.

COMMAND AND CONTROL

5. The Bangla Desh Forces owe allegiance to the Government of the Peoples' Republic of Bangla Desh and are under command of the Government exercised through the Commander-in-Chief, appointed by the Government with the status of Cabinet Minister. The Commander-in-Chief is assisted in the exercise of his command by the HQ Bangla Desh Forces which is a unified command and the appointments to which are made expressly with the approval of the Government.

6. All matters of policy, relating to Operations, Organisation, Personnel, Administration/Logistics or any other policy matter; control of weapons, equipment, vehicles and tele communication equipment and appointments and transfers (other than regimental appointments and appointments and transfers within a Sector/Battalion), Commissions and Postings, are matters for the Commander-in-Chief to decide.

7. Subject to the above, the exercise of command is decentralised to Commanders of Sectors who will be responsible to the Commander-in-Chief for the efficient functioning of their commands and for the correct and speedy implementation of all tasks in conformity with the prescribed policies.

OPERATIONAL COORDINATION AND SUPPORT

8. In view of the geographical situation of Bangla Desh and the communication difficulties, Sector Commanders are authorised to work out details of their operational plans in conformity with the operational policy laid down by the Commander-in-Chief. For current operational policy see Appendix 'A' attached. For the execution of this policy, Sector Commanders will work in close liaison with the Sector Commanders of the Supporting Forces, and will be advised and assisted in their tasks by them.

Supporting Forces

9. Regular Indian Army Formations

Designated Indian Army Sector Commanders/Formations are providing all support including fire and full logistic support to the Bangla Desh Sectors in their areas of jurisdiction. Indian Army Sector Commanders are responsible for providing all assistance in planning and coordination of activities of Bangla Desh Forces and the BSF under the overall directions of the Indian Formations on the border. Main HQ of Sectors of Bangla Desh Forces should, therefore, be located nearest to HQ of those supporting sector commands to ensure close cooperation and to avail of the communication facilities, both forward to sub sectors HQ and rearward to HQ Bangla Desh Forces.

10. Sector Commanders will work under these general directions without having to refer to HQ Bangla Desh Forces except on any matter relating to matters mentioned in paragraph 6 above. They should be able to resolve differences, if any, with the supporting forces sector commander. If in exceptional cases these differences cannot be resolved at their level or where any proposed action does NOT conform to the current operational policy, immediate reference will be made to HQ Bangla Desh Forces by Operational Immediate Signal or by a Liaison Officer for the prior approval of the Commander-in-Chief.

11. BSF

Under the overall guidance of the Indian Army Sector Commander the local BSF Commander is required to assist in the launching of operations by Bangla Desh Forces on the border. Very close coordination with the BSF is, therefore, a must for operational success.

ECHELON OF HQ BANGLA DESH FORCES IN EASTERN AREA

12. An echelon of HQ Bangla Desh Forces with the Chief of Staff Bangla Desh Forces is located in the Eastern Area, to ensure the closest political and logistic co-operation and also to deal with all matters, within the frame work of the Commander-in-Chief's policy, without reference to HQ Bangla Desh Forces, to provide speedy assistance to Sector Commanders.

13. Acknowledge.

COMMANDER IN CHIEF

Copy to :-

Chief of Staff,
Bangla Desh Forces.

Supporting Indian Army HQ
through LO (14 copies)

IG Operations BSF

Distribution

9 Sectors of Bangla Desh Forces	-	9 Copies	
Chief of Staff Bangla Desh Forces	-	1 Copy	
Office Copy	-	1 Copy	
War Diary	-	1 Copy	
IA LO	-	11 Copies	- for distribution to Indian Army Formations and Sectors

TOP SECRET

One mice only

Appendix 'A'
(Attached to HQ Bangla Desh Forces
No. 0001 G of ....28 June 1971.)

CURRENT OPERATIONAL POLICY

1. In view of the current situation, the Operational Policy for the present shall be :-

a. To avoid set-piece attacks and conventional operations as these will be costly to own forces. Instead, to destroy the enemy by well-planned and bold raids and ambushes carried out with surprise and concentrated fire power, to inflict the maximum destruction and disruption on the enemy, and then disengage and speedily withdraw to own raid bases and hide-outs which must be frequently changed to avoid detection and enemy air action. While conventional defensive battles will be avoided, effective defensive measures will be taken for the security of patrol bases, hide-outs and bases with particular reference to camouflage, all-round protection and out-posts/look-outs/ambushes covering approaches to such bases.

b. Keeping the above policy in view, recce and aggressive fighting patrols combined with ambushes on the enemy's land and river lines of communication, raids on posts and attacks on posts which are weak, shall be vigorously conducted daily on a planned basis. Plans for these Operations shall be formulated in conjunction with designated Indian Army Sector/Formation Commanders, who are responsible for co-ordinating plans. Particular attention will be given to night operations and all training concentrated on attaining the highest standard in operating by night with the utmost silence, maintaining direction and control.

c. In all cases, where fire support is necessary it will be provided by the supporting Indian Army Formation/Sector.

d. Control and Co-ordination - within the above policy and subject to control and coordination by Sector/Battalion Commanders, the day to day conduct of operations shall be decentralised to Sub Sector/Company Commanders, to ensure speedy action and maximum results. The tasks given to various Sub Sectors/Companies must be coordinated at Sector/Battalion level on the basis of a fortnightly tasks' plan known only to the Sector Commander/Supporting Commander and the Sub Sector/Company Commander concerned. For security reasons, operational orders on a task need only be given in due time and only to those required to know it who should then be segregated at a separate and temporary base till the launching of the operation. In addition, opportunity targets may be attacked/ambushed by the Sub Sector/Company Commander without reference to the Sector/Battalion Commander(if time does NOT permit prior reference) provided the action is within the scope of the Operational Policy given above. The Sector/Battalion Commander must, in such a case, be immediately informed about it.

2. Guerilla operations are NOT covered by the above. Separate instructions on organisation, launching and operation of guerillas are under issue.

TOP SECRET

পরিশিষ্ট ২

মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনে এমএনএদের সম্পৃক্ততা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার প্রস্তাব

N O T E

1. Since the month of August, we are recruiting a large number of youths for training as guerillas. From a study of the qualities and the performance of guerillas, it appears that enough attention has not been paid in the past in selecting the right type of youths for training. It is mainly because the MNAs/MPAs in charge of recruitment are burdened with various other responsibilities and as such are unable to devote enough time for recruitment. Selection and recruitment of such large number of youths is a full time job. In order to assist the MNAs/MPAs in selecting the best youth for guerilla training, it is proposed that we provide an Assistant Recruiting Officer in each youth camp whose whole time job would be devoted in this particular task only. We have a total of 24 youth camps and as such we need 24 Assistant Recruiting Officers. These Recruiting Officers will have two primary functions namely :-

   a. Selection youths from youth camps for guerilla training.

   b. Selecting trainees from reception camps and arrange their transportation upto youth camps.

2. These Assistant Recruiting Officers will live in the youth camps and besides carrying out recruitment will also provide motivation to the youths. They will carry out their function in close co-ordination with the local MNA/MPA, Bangladesh Forces Headquarter and youth camp organisations. Considering the limited time available at our disposal between each recruitment, it is proposed these appointments be made with effect from 10 Oct. The terms and conditions for the services are to be the same as those of other class I Civil Officers.

3. Submitted for your kind approval.

(Signature)

Deputy Chief of Staff
1st Oct '71

Ra.Ha.

পরিশিষ্ট ৩

মুজিব বাহিনীসংক্রান্ত একটি বার্তা

MESSAGE FORM

IMMEDIATE | D T G 07 1230

FORM : ECH HQ BDF | SECRET

TO : EASTCOM GS (X) | G –

INFORM : DELTA SECTOR (BY HAND)

[illegible] Comds Sector 1 CMM 2 and 3 to C-in-C (.) all operations stopped due to fol reasons (.) ALFA (.) certain organisation indicted [illegible] large no of Bangladesh boys inside Bangladesh without consulting Sector Comds (.) BRAVO (.) these boys are all armed by this mysterious org with rifles CMM LMG CMM sten and comn set (.) CHARLIE (.) fol alarming report on bese groups received from inside Bangladesh (.) ONE (.) those groups are telling Bangl desh citizens that they do not owe allegiance to present mil or civ leadership (.) TWO (.) gen public in the interior are intimidated by these group being well armed to f follow the leadership of Bangla liberation front of which they are the soul representative (.) THREE (.) they also telling population inside to rise against present leadership and follow the BLF of which Fazlul Haque Moni CMM Abdul Rab and Quddus Makhan are the leaders (.) idence (.) ow tps had to face near confrotation (.) clashes narrowly avoided in due to restraint by ow offrs (.) similar instances happened in th interior (.) some own bases in the interior grebady disrupted due physical actions by this org (.) case in present Na[illegible]nagar and Araihazar and Chandpur (.) DELTA (.) gen public in the interior completely confused who are the real MUKTI BAHINI and whom they should support (.) ECHO (.) this org had beaten two own regular Bengal tps and kept them in illegal confinement in Agartala knowing them to be such (.) own offr when approached they declined to hand over the tps inspite of repeated request instead used derogatory remarks against sec comd (.) request immediate [illegible]

your between [illegible] Sep

[Signature]

Chief of Staff

[illegible]

01/BDF/GS(Ops) dated ______ Sep 71.

পরিশিষ্ট ৪

মুজিব বাহিনীসংক্রান্ত অপর একটি বার্তা

OPS IMMEDIATE

D T G

FROM : EASTCOM GS (X)

111640

TO : ~~CHARLIE~~ DELTA SECTOR

SECRET

G-0002

- -

from C-in-C Bangladesh Forces for his COS and Comds 1 and 2 and 3 sectors (.) your message of 071230 delivered by Mr. SHAMSUL HAQ 110900 (.) one (.) you have shown commendable restraint and appreciate sober handling of sit by you (.) two (.) taken up matter highest level also spoken to Maj Gen UBAN on undesirability ops by unintegrated forces NOT owing allegiance to Govt of Bangladesh NOR forming part of Bangladesh Forces MUKTI BAHINI (.) three (.) keep ready for conference COS and Comds 1 (1) to 4 (4) Sector Comds being called earliest (.) others recently returned to sectors (.) four (.) reference our signal G-0002 of 11 sep (.) each sector and Ech HQ to immediately send two trained sig corps signallers to collect sets for link with me (.) ack

- -

Case No. 00024 of 11 Sep 71

পরিশিষ্ট ৫

নৌ-কমান্ডোদের সাফল্য বিষয়ে একটি বার্তা

MSG FORM

D T G
23
CONFD

From: HQ No 1 Sector
To: HQ Delta Sector
Info: Echelon HQ BDF

- -

twenty four FF of spl group returned (.) now staying at camp (.) rest of the boys safe (.) reaching soon (.) detail info as under (.)

alfa (.) seven ships and two barges sunk in CTG port (.) one barge sank in the centre of river KARNAFULY opposite jetty No 13 (.) port approach completely blocked (.)

bravo (.) one ship sunk in oil jetty (.)

charlie(.) AL ABAS was unloading ammo (.)

delta (.) Lt Gen TIKKA KHAN came to CTG on 16 Aug to personally asses the damage and cause (.) senior naval offr in charge of port has been arrested (.) all sentries in the port arrested (.) serious clash between PUNJABIS and BALUCHIS took place over the ship incidence (.) PUNJABIS blamed BALUCHIS for helping MF in blowing the ships (.) hy exchange of fire between PUNJABIS and BALUCHIS on 16 and 17 Aug in port area ~~and~~ CTG Cantt ~~and~~ and airport reported (.) in a clash in CTG airport on the ni of16/17 Aug 3 offrs and 20 other ranks killed (.) a large no of sentries from BALUCH REGT who were on port duty have been shot (.) curfew imposed by ~~Army~~ pakarmy in CTG port and even in KARNAFULY river water (.) no one allowed to port area (.)
BOYS ARE IN HIGH SPIRIT =

- -

File No 101/1/GS(O)

Sector Comd
23 Aug 71

পরিশিষ্ট ৬

বিমানবাহিনী গঠন বিষয়ে একটি নোটশিট

[illegible] FOR THE PRIME MINISTER OF INDIA

Utilisation of air and ground crews of Air Force

Two proposals were put forward by Air Chief Marshal Lal, Chief of Air Staff :-

a. The pilots of Bangladesh Forces should operate with Indian Air Force operational units. These officers will, however, subjected to rules, regulations and discipline of Indian Air Force.

b. Indian Air Force may be able to spare two VAMPIRE aircraft in case a separate unit is to be established with Bangladesh pilots and ground crews.

Regarding the first proposal, it is felt that the Bangladesh pilots have been trained on American pattern which is difficult from the standard operating procedure of Indian Air Craft. This itself will take some time for adopting to the new system of operation. We have experience in having pilots from IRAN, TURKEY who are also trained in American pattern but had taken fairly long time to get adjusted to the PAF for operation effectively as Section Pilot. Besides, some of our pilots are very senior and have been commanding operational wing and squadrons. It will be rather uncomfortable for them to operate under the Section leader of the ranks of a Flt Lieut or Flying Officer.

So far as the second proposal is concerned, it is felt that we should at least have some aircraft to operate which will keep us with the time if not ahead of the time. VAMPIRE is an out dated aircraft brought out in 1946 and have very limited capability in term of speed and armament load. It is no match to F-86 aircraft operated by PAF. As conversion to any new aircraft will take almost the same time, it will me more realistic to have an aircraft which is still not outdated. For this, we strongly recommend at least Hunter aircraft or any other aircraft of similar capabilities.

পরিশিষ্ট ৭

যৌথ নেতৃত্ব বিষয়ে কর্নেল ওসমানীর পত্র

Copy No [illegible] of Fourteen Copies   TOPSECRET

No. 0001G
HQ Bangladesh Forces
Field
C/O Government of the Peoples' Republic of Bangladesh
Mujibnagar
11 Oct 71

To:-
Comds All Sectors,) By Name
Comd 'Z' Force)
Bangladesh Forces

Copy to:- Chief of Staff, Bangladesh Forces
GOC-in-C Supporting Forces Comd through LO

Subject:- Command and Control of Bangladesh Forces for Operations

In continuation of HQ Bangladesh Forces No. 00010 of 28 June 71.

1. Reproduced below are contents of Appendix 'A' to HQ Eastern Comd DO No. 101076/1/G(Ops) of 8 Oct 71 bearing the title - 'Command and Control of Bangladesh Forces for Operations, As Agreed to By The Acting President and The Prime Minister Bangladesh with GOC-in-C Eastern Command'.

2. As would be noted from contents of the first para, there was a paper on the subject prepared after discussion between our Prime Minister and the Defence Secretary, India on 28 Sep 71 whilst I was out on tour. Own Defence Secretary and DCOS Bangladesh Forces were present. On return I studied the paper and had some points to raise which were pointed out to the Prime Minister and the Acting President and I left behind alternative drafts for GOC-in-C Eastern Command as I was again going out on tour. The paper reproduced below incorporates the points raised by me which are adequately reflected in sub para (d), that is to say -

a. Whilst the operational responsibility for execution of all tasks will vest in the Indian Army Formation Commander (because of his having the infrastructure and fire support and other supporting resources), this in NO way will affect the command of Bangladesh Sector Commander over his forces.

b. Operations including induction programme will be carried out under the overall supervision of the senior Indian Army Formation Commanders in the sector in conformity with plans and policy formulated by C-in-C Bangladesh Forces and GOC-in-C Eastern Command.

[signature] Colonel
Commander-in-Chief

TOPSECRET

Contd page 2

COMMAND AND CONTROL OF BANGLADESH FORCES FOR OPERATIONS AS AGREED TO BY THE ACTING PRESIDENT AND THE PRIME MINISTER BANGLADESH WITH GOC-IN-C EASTERN COMMAND

As a sequel to the discussion on command and control of BANGLADESH Forces by the Defence Secretary with the Prime Minister BANGLADESH on 28 Sep 71, further discussion were held by GOC-in-C Eastern Command with the Prime Minister and the Acting President on 5 Oct 71. The Vice Chief of the Army Staff attended the meeting.

2. It was agreed that the following procedure for command and control of operations undertaken by the Muki Bahini/ Freedom Fighters and the regular battalions of the EAST BENGAL Regiment would be followed :-

(a) Broad tasks sectorwise and time schedule for completion of tasks will be decided by C in C BANGLADESH Forces and GOC in C Eastern Command after mutual consultation. Redeployment of EAST BENGAL Battalions, when necessary, will also be decided at this level only.

(b) The task and time schedule for completion decided upon by C in C BANGLADESH Forces and GOC in C Eastern Command will then be communicated to the Indian Army Formation Commanders and the BANGLADESH Sector Commanders responsible for various sectors through respective command channels. No change or modification of tasks set will be permitted at lower levels.

(c) Detailed plans to implement the task given will be drawn up at Indian Army Formation and the BANGLADESH Sector Headquarters level after mutual consultation between Indian Army Formation Commander and the BANGLADESH Sector Commander. They may also decide on additional tasks to be carried out in their respective sectors.

(d) Once detailed plans have been drawn up at Formation and BANGLADESH Sector Headquarters level, the operational responsibility for execution of all tasks relating to a sector will vest in the Indian Army Formation Commander. This, however, in no way will affect the power of command of the BANGLADESH Sector Commander over his forces. All operations close to the border as well as deep induction programme will be carried out under the overall supervision of the senior Indian Army Formation Commander in the sector in conformity with plans and policy formulated by C in C BANGLADESH Forces and GOC in C Eastern Command.

3. Instructions outlining the above procedure will be sent to subordinate formations and BANGLADESH Sectors by Headquarters Eastern Command and Headquarters BANGLADESH Forces respectively.

TOPSECRET

পরিশিষ্ট ৮

৩০ জুলাই ১৯৭১, বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে দেওয়া বীরত্বসূচক খেতাব বিষয়ে নির্দেশাবলি

CONFIDENTIAL

BY AIR COURIER SERVICE
No. 1015/A
HQ Bangladesh Forces
Field
C/O Govt of the Peoples' Republic of Bangladesh
Mujibnagar
30 July 71

To:- Comds All Sectors/Bns B BdNOAL

Copy for info to : COS

Subject:- Gallantry Awards - Recommendations For

1. Recommendations for the Gallantry Awards of various orders mentioned below, have NOT yet been received:-

Degree of Gallantry	Enunciation	Award
Highest Order	Gallantry of the highest order in the face of enormous odds entailing the peril of certain death, in which, but for the individual's gallant deed the enemy would have succeeded in inflicting grave loss on own forces. Alternatively, the individual's gallant deed caused the destruction to the enemy of a magnitude, having vital influence on the course of operations. Essential - three witnesses.	Rs.10,000/00
High Order	As above but of a lesser degree. Two witnesses.	Rs. 5,000/00
Commendable Order	As above but of a still lesser degree. One witness.	Rs. 2,000/00
Gallantry Certificate	Of a degree not coming upto any of the above standard but of a positive nature warranting recognition.	Certificate

2. Recommendations on the form reproduced at Appendix 'A' attached, shall be initiated by the officer in immediate command, e.g. Coy Comd, through the Bn Comd and the Sector Comd (if other than the Bn Comd) who will ensure completion in all respects and submit it to HQ Bangladesh Forces (Personnel) for further action. Each of the officers in the channel mentioned shall enter in their own hand specific recommendation on the case - as to which degree of gallantry be recommended for the individual.

CONFIDENTIAL 2/-

Completed form and recommendations contained in it shall be treated as SECRET. Under NO circumstances will it be disclosed to any one NOT required to know about it, in connection with his duties in dealing with the case. Recommendations for period upto 30 June 1971 will be IMMEDIATELY submitted and thereafter, once a month on the 1st day of the month following the one it relates to.

3. Special Provision for Immediate Award. Recommendation for an Immediate Award, justified by extra-ordinary deed of valour, or by need for immediate recognition after a major operation, will be submitted immediately after the action but on the form and through channel prescribed, in this letter.

4. On receipt at HQ Bangladesh Forces, a Board composed as given in para 5 below shall scrutinise each case to ensure uniformity in assessment and shall make final recommendations to the C-in-C. After the C-in-C's approval, the finalised recommendations will be submitted to the Minister for Defence for final sanction of the award on behalf of the Government after which it will be communicated t all concerned.

5. Board to Scrutinize Recommendations for Gallantry Awards.

President - Chief of Staff (in case of immediate award or otherwise, when COS' presence is impossible, the Deputy Chief of Staff will be the Chairman).

Members - One of the Sector Comds (by rotation)

ACOS (Operations)

ACOS (Personnel & Logistics) - also act as Secretary of the Board.

6. Publication of Citation. Details of the Citation for a Gallantry Award shall be carefully examined from the security point of view and necessary deletions/modifications effected before release for publication/radio broadcast.

7. Ack.

Commander-in-Chief